পঞ্চাশটি ভূতের গল্প

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচী পাব্‌লিকেশন্‌স্‌

প্রথম প্রকাশ (প্রাচী)
১৯৬৫ (১১ ই মে, বৌদ্ধ পূর্ণিমা)

প্রকাশক :
এইচ্. রায়চৌধুরী
৬৩বি, ন্যাশনাল প্লেস, বাক্‌সাড়া
হাওড়া- ৭১১৩০৬

প্রচ্ছদ — শ্রীঅজয় ঘোষ।

মুদ্রণ :
পিপল্‌স লেজার গ্রাফিক্স এণ্ড প্রিন্টার্স
১২৬ এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯
শৈব্যা লেজার
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলেজস্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

ওঁ নম আদ্যায়ৈ

আমার মা
শ্রীমতী নন্দরানী দেবীর
চরণকমলে

ভূ মি কা

ভূতের গল্পের আবার ভূমিকা? হ্যাঁ, ভূমিকা একটু লিখতেই হবে। তার কারণ, ভূত আছে কি নেই এ নিয়ে তর্কেরও শেষ নেই। ভয় থেকেই যদি ভূতের জন্ম হয় তা হলে ভূত থেকেই বা ভয়ের জন্ম হবে না কেন? ভূত এবং ভয় দু'জনেই সহোদর ভাই। ভূত নিয়ে এখন রীতিমতো গবেষণা, এমনকী প্রতিযোগিতাও চলছে। কোনও কোনও ভৌতিক গল্পে বিজ্ঞানের পতাকা উড়িয়ে বোঝানোর চেষ্টাও হচ্ছে ভূত-টুত কিছু নয়, মানুষ অযথা ভূতকে কল্পনা করেই ভয় পায়। আমি কিন্তু সে মতে বিশ্বাসী নই। নই বলেই এতগুলো ভূতের গল্প লিখে ফেললাম। বছরের পর বছর ধরে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বিস্মৃতপ্রায় যুগের প্রবীণদের মুখ থেকে যেসব কাহিনী আমি সংগ্রহ করেছি, তারই সযত্ন প্রকাশ আমার এই গল্পগুলিতে।

আমি নিজে ভূত এবং অলৌকিক ব্যাপারস্যাপারগুলোতে বিশ্বাস করি। কেন করি, তার উত্তর আমার গল্পগুলোর মধ্যেই আছে। আমি মনে করি ভয়ের কম্বল মুড়ি দিয়ে ভূতেরা যতই অন্ধকারে মিশে থাকুক, তবুও ভূত বর্তমান। ভূত ভবিষ্যৎ। ভূত আছে এ-কথা যেমন বাজি রেখে বলা যায় না, তেমনই ভূত নেই এমন বাজিও কি ধরা যায়? ইদানীংকালে আমরা কেউ ভূত না দেখলেও বহু মানুষের বিরল অভিজ্ঞতাকে তো এককথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না! ভূত যুগে যুগে। ভূত দেশে দেশে। কেউ কেউ ভূতকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের অলস কল্পনা বলে মনে করেন। কিন্তু বহির্ভারতে যে-সমস্ত সভ্য দেশ কুসংস্কারমুক্ত ও উন্নত, তারাও কিন্তু ভূতের অলৌকিকত্বকে মেনে নিয়েছেন। এই তো সেদিনের কথা, গারস্টিন প্লেসের পুরাতন আকাশবাণী ভবনকে ঘিরে যে সমস্ত গুণী-জ্ঞানীরা তাঁদের অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেলেন তাঁরা কি সবাই মিথ্যে কথা বলে গেলেন? যাই হোক, বিশ্বাস-অবিশ্বাস মনের ব্যাপার। এবং গল্প গল্পই। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, যাই হোক, আমার বইয়ের সব গল্পই ভূতের। একমাত্র শেষের গল্পটিই যা ব্রহ্মদত্যির। তাও সে গল্পও আমার বানানো নয়।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

লক্ষ্মী আচার্যির গল্প

হরিহরডাঙার চর।

একদিকে নাভুগ্রাম, অন্যদিকে ভ্যালাইগাছি। মধ্যে বাবুর মায়ের মরা খাল। এই মরা খালের ওপারে মরা ঘাট। অর্থাৎ হরিহরডাঙার চর। তবে হরিহরডাঙা কেউ বলে না। বলে হরারডাঙা।

সেই হরারডাঙার চরে লক্ষ্মী আচার্যি রোজ রাত্রিবেলা ভূতের কাঁধে চেপে জপ করতে যেতেন। আর ফিরে আসতেন প্রায় মাঝরাতে ভূতের কাঁধে চেপে। তিনি ছিলেন মস্ত গুনিন। তাঁর মতো গুনিন এ তল্লাটে কেন, গোটা বর্ধমান জেলাটার মধ্যে আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। মন্ত্রের শক্তিতে ভূতকে তিনি বেঁধে রেখেছিলেন। পান থেকে চুন খসবার আগেই ভূতেরা তাঁর সব হুকুম তামিল করে দিত। তাঁকে পালকিতে বসিয়ে সেই পালকি কাঁধে করে বইত। অনেকেই নাকি আড়ালে আবডালে লুকিয়ে দেখেছে এ দৃশ্য। ছায়া ছায়া কালো কালো কী বিচ্ছিরি সব চেহারা! কেউ দেখেছে আস্ত কঙ্কাল। কেউ বা কিছুই দেখেনি। শুধু মাঠের ওপর দিয়ে দুলকি তালে দুলে দুলে যেতে দেখেছে পালকিটাকে। সেই পালকির ভেতরে বসে আছেন গুনিনের সেরা গুনিন—লক্ষ্মী আচার্যি।

সবাই বলে, লক্ষ্মী আচার্যি নাকি পিশাচসিদ্ধ লোক।

চেহারাটিও তেমনই—এ-ই লম্বাচওড়া দশাসই চেহারা। খুব কম করেও সাড়ে ছ' ফুটের বেশি হবেন তবু কম নয়।

ঘন কালো গায়ের রং।

পরনে লাল চেলি। রক্তবস্ত্র। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চাঁড়ালের হাড়, শকুনির হাড়, ধনেশ পাখির হাড়ের মালা। নানারকমের লাল নীল পুঁতি, গাছের শিকড় আর কড়ির মালা। কতরকমের দুষ্প্রাপ্য তবলকি। কপালে ডগডগ করত তেল সিঁদুর। লম্বা করে টানা। মাথায় মস্ত টাক। চোখদুটি লাল। রক্তবর্ণ। যেন ভাঁটার মতো জ্বলছে। চোখ উঠলে যেমন লাল দেখায় তার চেয়েও লাল। সব তেজের যেন ওই চোখের মধ্যেই প্রকাশ। সেই লাল চোখদুটি নেশায় ঢুলু ঢুলু করত সর্বক্ষণ। ঠিক যেন মহাকালের অবতার। লোকেরা তাই ভয়ে ভক্তি করত সকলে। বলত, "বাবা রে! সাক্ষাৎ কালভৈরব গো।"

আচার্যিকে দেখলে ভয়ে বুক শুকিয়ে যেত সকলের। শুধু ভয়ের জন্য নয়, গুণের জন্যও ভক্তি করত সবাই।

জিন আর করিমের মতো অপদেবতাও হার মানত আচার্যির কাছে। যাদের হার মানাতে আচ্ছা আচ্ছা গুনিনও হিমশিম খেয়ে যেত। লোকে তাই দুপুর রাতে মাঠে-ঘাটে একলা গেলে নাম নিত আচার্যির। তাদের মনে এ বিশ্বাস স্থিরভাবে জন্মেছিল যে, আচার্যির নাম নিলে ভূত তো ভূত, ভূতের বাবাও আর কাছে ঘেঁষবে না।

সেবারে নাভুগ্রামে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিল। গ্রাম উজাড় করে মরতে লাগল

সব। যে বাড়িতে রোগ ঢোকে সে বাড়িতে বাতি দিতে কেউ অবশিষ্ট থাকে না। কে কার মুখে জল দেয় এমন অবস্থা!

সবাই গিয়ে তখন লক্ষ্মী আচার্যিকে ধরল।

আচার্যি তখন সবে তাঁর গৃহদেবতা মহাকালীর পুজো সেরে উঠেছেন। উঠেই দেখেন সারি সারি সব দাঁড়িয়ে আছে। বললেন, "কী ব্যাপার রে? আমার এখানে কেন?"

লোকো দুলে বলল, "এখন আপনিই আমাদের ভরসা আচার্যি! আপনি দয়া না করলে যে সবাই মারা পড়ি।"

আচার্যি বললেন, "হুঁ।" বলেই একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "দেখি মাকে বলে কী করতে পারি! পাপ করবি তোরা, আর মায়ের কাছে হত্যে দেব আমি?"

পঞ্চা বাগদি বলল, "আপনিই আমাদের মা-বাপ। আমাদের হয়ে মাকে আপনিই একটু বলুন। আমাদের ডাক তো মা শুনবে না। আপনার কথা যদি শোনে।"

আচার্যি বললেন, "অমাবস্যা কবে?"

"আজ্ঞে, তা আমরা কি জানি? মুখ্যুসুখ্যু মানুষ।"

আচার্যি তখন হিসেব করে বললেন, "কুজবারে অমাবস্যা আগামীকাল। তোরা শ্মশানে মায়ের পুজোর ব্যবস্থা কর।"

সকলে মহা ধুমধামে হরারডাঙার চটানে শ্মশান-কালীর কাছে পুজোর আয়োজন করল।

আচার্যি এলেন পুজো করতে। তবে ভূতের কাঁধে চেপে নয়, হেঁটে হেঁটে।

সারারাত ধরে চলল পুজো, হোম ইত্যাদি।

শেষরাতে পুজো শেষ হলে 'মা মা' বলে চিৎকার করতে লাগলেন আচার্যি। একটা হাত শূন্যে তুলে বললেন, "দে দে, তাড়াতাড়ি দে।" কার উদ্দেশে কাকে যে বললেন তা কে জানে!

সবাই অবাক হয়ে দেখল, সেই অন্ধকার শ্মশানে মস্ত একটা অর্জুন গাছের ডাল দুলে উঠল। তারপর কালো ছায়ার মতো আধপোড়া একটা হাত আচার্যির হাতে একটা মড়ার মাথার খুলি বসিয়ে দিল।

আচার্যি সেটা নিয়ে মুখের কাছে এনে অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্রপাঠ করলেন। তারপর সেটা কারণ-মিশ্রিত করে তুলে দিলেন গাঁয়ের লোকেদের হাতে। বললেন, "এই হল মহৌষধ। প্রত্যেকে একবিন্দু করে জিভে দাও। আর যার যার বাড়িতে রোগী আছে তারা সেই রোগীর মুখেও একবিন্দু করে এই ওষুধ দিয়ে দাও।" তারপর বললেন, "তোমরা এখুনি কেউ যাবে না। আমি না যাওয়া পর্যন্ত। এখনও আমার কাজ বাকি আছে।" এই বলে একটা বড় ঝাঁটা হাতে নিয়ে সেই অর্জুন গাছের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওরে কে আছিস?"

গাছের ডাল অমনি দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছরছর করে একটা ডাল পাতা জোরে নাড়িয়ে দেওয়ার শব্দ।

আচার্যি বললেন, "এই ঝাঁটা নে। মায়ের আদেশ। গ্রাম থেকে ঝেঁটিয়ে সব রোগ এখুনি তাড়িয়ে দে। বুঝলি?"

আবার সেই ভয়ঙ্কর আধপোড়া লম্বা হাত চোখের পলকে আচার্যির হাত থেকে ঝাঁটাটা তুলে নিল।

আচার্যি বললেন, "এবার আমি যাব।" বলে একটা শাঁখ হাতে নিয়ে জোরে ফুঁ দিতে

দিতে খালের পাড় ধরে বরাবর চলে গেলেন আচার্যি।

আশ্চর্যের কথা! এরপর কলেরা একদম নির্মূল হয়ে গেল গ্রাম থেকে। আর কেউ মরল না। যারা ভুগছিল তারাও সেরে উঠল। আচার্যির কৃপায় প্রাণে বাঁচল সবাই।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত নাড়ুগ্রামে আর কখনও কারও কলেরা হয়নি।

লক্ষ্মী আচার্যির ভাই গোবর্ধন আচার্যি একবার বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন খেয়ে দূর গ্রাম থেকে আসছে। তখন মধ্যরাত্রি। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। হালদার পুকুরের পাড়ে এসে বাধা পেল গোবর্ধন। দেখল তার ঠিক যাওয়ার পথটির ওপর বসে আছেন প্রভু। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল গোবর্ধনের। অথচ যাওয়ার এই একটিই মাত্র পথ।

গোবর্ধন তখন অনুনয় বিনয় করতে লাগল, "পথ ছাড়ুন গো মশায়। যেতে দিন।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

উত্তর এল, "তোর হাতে কী?"

"বিয়েবাড়ি খেতে গিয়েছিলুম। লুচি মিষ্টি মাছ এসব আছে।"

"ওগুলো রেখে যা।"

"আজ্ঞে, আমার দাদা লক্ষ্মী আচার্যির জন্য নিয়ে যাচ্ছি।"

"সে তো এখন শ্মশানে বসে জপ করছে। সে খাবে না। তুই রেখে যা।"

"কিন্তু দাদার নিষেধ। দাদা যে বলেছে রাতভিতে পথে কেউ কিছু চাইলে দিবি না।"

"বলুক। আমার খিদে পেয়েছে। তুই আমায় দে।"

"দেব। তবে তার আগে তুমি আমাকে শ্মশানে দাদার কাছে পৌঁছে দাও। তাকে জিজ্ঞেস করে তারপর দেব।"

ব্যস, কেউ আর নেই। পথ ফাঁকা।

গোবর্ধন মনের আনন্দে পুকুরপাড় থেকে আলে নামল। তারপর আল পেরিয়ে কুলিতে উঠতে যাবে এমন সময় দেখল মস্ত একটা বাঁশঝাড় সটান শুয়ে আছে রাস্তার ওপর।

মহা বিপত্তি! কোনওরকমেই যাওয়ার উপায় নেই।

গোবর্ধন বলল, "আবার আমার পিছু নিয়েছিস?"

"তুই খাবার দিলি না যে?"

"বললুম তো আমাকে দাদার কাছে নিয়ে চল।"

"তোর দাদার সঙ্গে আমার বিবাদ। তার কাছে যাব না।"

"তবে পথ ছাড়।"

"যা না তুই।"

"কী করে যাব? রাস্তার ওপর এভাবে বাঁশঝাড় শুইয়ে রাখলে কখনও মানুষ যেতে পারে?"

"ও তো ঝড়ে পড়ে গেছে।"

"কোথায় ঝড়? আজ সারাদিন ধরে অসহ্য গুমোট চলছে। পাতা নড়েনি গাছপালার। আর তুই বলছিস ঝড়ে পড়েছে। ওঠা শিগগির।"

"ওর তলা দিয়ে গলে যা না তুই।"

"তা হলে আমাকে টিপে মারবার খুব সুবিধে হয়, না?"

"না রে। কিছু করব না। তোর ভয় করে তুই ডিঙিয়ে যা।"

"তাও যাব না। পথ পরিষ্কার না করলে যাবই না আমি। সকাল হোক। তারপর দাদাকে গিয়ে বলি সব।"

গোবর্ধন আর অনুরোধ না করে বসে পড়ল সেখানে। বসে বসে মা মহাকালী আর লক্ষ্মী আচার্যিকে স্মরণ করতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ গোবর্ধন দেখতে পেল হরারডাঙার দিক থেকে দুটো কঙ্কাল লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিকে আসছে। দেখেই তো বুক শুকিয়ে গেল গোবর্ধনের। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল গোবর্ধন। মনে হল, এখুনি হার্টফেল করবে বুঝি।

কঙ্কাল দুটো এসে বলল, "ভয় নেই। আমাদের আচার্যি পাঠিয়েছে।" বলে সেই গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, "বড্ড সাহস তোর না? আচার্যি আজ বারোটা বাজাবে তোর। শিগগির গাছ তোল। তারপর আমরাও মজা দেখাচ্ছি তোকে।"

সশব্দে সেই লম্বা লম্বা বাঁশঝাড়গুলো খাড়া হয়ে গেল তখন।

গোবর্ধন আর কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা দৌড় দিল ঘরের দিকে। পেছনে তখন বাঁশঝাড়ের ভেতর তিন ভূতের প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। আর তার সঙ্গে আঁউ আঁউ আর খ্যা খ্যা শব্দ কানে এল।

আলাদপুরের একটা লোককে ভূতে ধরল একবার।

ভূতটা ভারী বেয়াড়া। সব ওঝা হার মানল তার কাছে। সেখানকার লোকেরা তখন ঠিক করল লক্ষ্মী আচার্যিকে ডাকতে যাবে। গ্রামের বেশ মাতব্বর গোছের দু'জন লোক এসে হাজির হল লক্ষ্মী আচার্যির কাছে।

আচার্যি তাদের চিনতেন। একজনের নাম ভজহরি বিশ্বাস, আর একজনের নাম কেষ্ট দাশ।

আচার্যি বললেন, "কী ব্যাপার ভজহরি! এমন অসময়ে?"

"মুশকিল হয়েছে আচার্যিমশাই।"

"কেন? কেন?"

"আমাদের গ্রামে একজনকে ভূতে ধরেছে। বড় বেয়াড়া ভূত। কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। সব রোজা হার মেনেছে তার কাছে। এখন একমাত্র ভরসা আপনি। আপনি গিয়ে না ছাড়ালে মারা পড়ে যাবে বেচারি।"

"তা না হয় ছাড়াব। কিন্তু যত ভূতে কি তোদেরকেই ধরে? কই, আমাকে তো ধরে না?"

"কী যে বলেন আচার্যি! আপনি হলেন গুনিনের সেরা গুনিন। ভূতেরা আপনাকে কাঁধে নিয়ে ঘোরে। আপনার আজ্ঞাবহ। আমাদের ভাগ্য যে আপনার মতো লোককে আমরা বিপদে পাই।"

আচার্যি হেসে বললেন, "চল চল। দেখি কীরকম ভূত ধরেছে তোদের লোককে! খুব তালে এসে পড়েছিস। নাহলে আর একটু পরেই আমি বেরিয়ে যেতাম।"

আচার্যি চললেন আলাদপুরে।

আলাদপুরে পৌঁছনোমাত্রই গাঁয়ের উৎসাহী লোকেরা সবাই চলল আচার্যির পিছু পিছু। গুনিনের সেরা গুনিন এসেছে। তাঁর ভূত ছাড়ানো দেখতে হবে বইকী।

খবর পেয়ে আশপাশের গ্রাম থেকেও বহু লোক ছুটল।

আচার্যির ডাক পড়েছে যখন, ব্যাপারটা তখন নিশ্চয়ই সাংঘাতিক।

আচার্যি রোগী দেখলেন। রোগীর চোখমুখের ভাব দেখে বললেন, "হুঁ।" এই হুঁ বলাটা আচার্যির বৈশিষ্ট্য। কোনও জটিলতা দেখলেই হুঁ। তা হলেই লোকেরা বুঝে নেবে অবস্থা গুরুতর। হুঁ বলে আচার্যি বললেন, "দাও দুটি সরষে চোঁয়া আর গুটিকতক প্যাঁকাটি দাও।"

রোগীর বাড়ির লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে সরষে টুঁইয়ে প্যাঁকাটি ভেঙে আচার্যিকে এগিয়ে দিল। আচার্যি ভৈরবের মতো দাঁড়িয়ে মন্ত্র বলে সেই সরষে চোঁয়া ছুড়ে দিলেন রোগীর গায়ে। আর যায় কোথা! রোগী তখন 'বাবা রে মা রে'।

তারপর প্যাঁকাটির মাথায় আগুন ধরিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে পেছনের ফুটোয় ফুঁ দিয়ে মুখে ধোঁয়া দিলেন আচার্যি।

রোগী তো কাটা ছাগলের মতো ধড়ফড় করতে লাগল তখন, "ওরে তোর দুটি পায়ে পড়ি, আমায় অমন করিস না রে! আমি এক্ষুনি ওকে ছেড়ে যাচ্ছি।"

আচার্যি বললেন, "তা তো যাবি রে ব্যাটা। কিন্তু ধরেছিলি কেন?"

আর কথা নেই। ভূতে পাওয়া রোগী একদম চুপ। কেবল গোঁ গোঁ করে।

আচার্যি বলেন, "কই রে! কী হল? বল, ওকে ধরেছিলি কেন?"

"ও কেন আমার গায়ে মাছধোয়ার জল ছুড়ে দিয়েছিল?"

"তুই ছিলিস কোথায়?"

"আমি ওদের ছাঁচতলাতে দাঁড়িয়ে ছিলুম।"

"কেন তুই ওদের ছাঁচতলাতে ছিলিস? ও কি ইচ্ছে করে তোকে দেখে তোর গায়ে ফেলেছে?"

"না। আমাকে সরে যেতে না বলে ফেলেছে কেন?"

"বেশ করেছে ফেলেছে। তা তুই যখন দেখলি ও জল ফেলতে আসছে তখন তুই-ই বা সরে গেলি না কেন?"

"বা রে! আমি কি ওকে দেখেছি?"

"ওদের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে তুই ওকে দেখতে পেলি না, আর ও তোকে না দেখতে পেয়ে তোর গায়ে জল ফেলেছে বলে তুই ওকে ধরলি?"

রোগী তখন প্যাঁচে পড়ে চুপ করে যায়।

আচার্যি বললেন, "তার মানে, ইচ্ছে করে ওকে ধরবি বলেই ওর জল তুই গা পেতে নিয়েছিস?"

"না, তা কেন?"

আচার্যি গম্ভীর গলায় বললেন, "কোথায় থাকিস তুই?"

"মজুমদারার ঈশান কোণে।"

"এই গ্রামের কাছাকাছি আমি থাকি, তুই জানতিস না?"

"জানতুম।"

"তা হলে কেন ধরেছিস বল?"

"তোর গ্রামের লোককে তো ধরিনি আচার্যি।"

"ওরে ব্যাটা। যাক, তুই একে ছাড়বি কিনা বল?"

"ছেড়ে দেব। সত্যি ছেড়ে দেব।"

"ছেড়ে দেব নয়। এক্ষুনি ছাড়।"

"তুই আগে চলে যা, তারপর ছাড়ছি।"

"না, তোকে এক্ষুনি ছাড়তে হবে।"

"এক্ষুনি?"

"হ্যাঁ।"

অবাক কাণ্ড! যে লোক একটু আগেও ধুলোয় শুয়ে ছটফট করছিল, সে আবার সুস্থ হয়ে আচার্যিকে প্রণাম করে উঠে বসল।

সকলে জয়ধ্বনি করল আচার্যির। বলল, "হুঁ হুঁ বাবা। এ কি যা-তা লোক!"

"মনে করো ভূতে আচার্যির পালকি বয়। কত ভূত জব্দ হল—তো এ ব্যাটা কোন ছার।"

"ওঃ। এ যে ভেলকি দেখলুম রে ভাই।" বলে যে যার চলে গেল।

আচার্যিও নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে সন্ধের পর ভূতের কাঁধে চেপে ফিরে এলেন।

পরের দিন সকালে আলাদপুরের লোকেরা আবার এসে হাজির। সেই ভজহরি বিশ্বাস, কেষ্ট দাশ আবার এল। এসে হাতজোড় করে বলল, "পেন্নাম হই আচার্যিমশাই।"

আচার্যি তখন দাওয়ায় বসে গঞ্জিকা সেবন করছিলেন। বললেন, "কী ব্যাপার হে? আবার কী মনে করে?"

"ব্যাপার সাংঘাতিক আচার্যিমশাই। আপনি চলে আসার পরই ভূতটা আবার এসে ধরেছে রোগীকে।"

গঞ্জিকার কলকেটা রেখে দিয়ে লাল রক্তজবার মতো চোখ দুটো পাকিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন আচার্যি, "আবার এসেছে? এতবড় স্পর্ধা!"

রাগে উত্তেজনায় আচার্যি ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন! রাগলে তাঁকে ভয়ঙ্কর দেখায়। আস্ত মানুষটাই যেন পালটে যায় অদ্ভুতভাবে। মুখখানি কঠিন হয়ে ওঠে। গালে ভাঁজ পড়ে। কপাল কুঁচকে যায়। দারুণ দেখায়। আচার্যি বললেন, "ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।"

কিন্তু গেলে কী হবে? তাঁকে আসতে দেখেই ভূতটা ছেড়ে পালাল।

রোগী তখন আবার সুস্থ দেহে প্রণাম করল তাঁকে। বলল, "কী হবে আচার্যিমশাই?"

"কিচ্ছু হবে না। কোনও ভয় নেই। আমি তো আছি।"

আচার্যিমশাই চলে গেলেই ভূতটা ভর করে লোকটিকে। আর তাঁকে আসতে দেখলেই ছেড়ে পালিয়ে যায়।

মহা মুশকিল!

আচার্যি ভূতের ঠ্যাটামো দেখে চটে যান। যাবেন নাই বা কেন? এসব ঝামেলা আর ভাল লাগে না তাঁর। খুব কম করেও আশির ওপর বয়স তো হল। মন্ত্রশক্তিতে ভূতকে তিনি বশ করেছেন। কিন্তু জরা মৃত্যুকে জয় করবেন কী করে? এ বয়সে কি আর ভূতের সঙ্গে ছ্যাঁচড়ামো করতে ভাল লাগে কারও? শেষে একদিন রেগে বললেন, "ঠিক আছে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই এর।" তারপর রোগীর বাড়ির লোকদের বললেন, "দেখ, আজ আর আমি যাব না। তবে কাল তোরা কেউ যেন ডাকতে আসিস না আমাকে। আমি রোজ যে সময়ে যাই কাল তার চেয়ে আগেই আমি যাব। আর আমি গেলে কেউ যেন ব্যস্ত হোস না। কারণ আমি যে গেছি এ-কথাটা রোগী যেন কোনওরকমে জানতে না পারে। কাল একটা শেষ বোঝাপড়া করতে চাই আমি।"

ভজহরি ও কেষ্ট দাশ ফিরে এল।

পরদিন লক্ষ্মী আচার্যি ঠিক দুপুরবেলায় চললেন ভূত ছাড়াতে।

আলাদপুরে পৌঁছেই আচার্যি করলেন কি, সর্বাগ্রে একমুঠো ধুলো পড়ে সেই বাড়িটার

চারপাশে গণ্ডি দিয়ে দিলেন। তারপর সোজা গিয়ে ঢুকলেন রোগীব ঘরে।

রোগী তো আচার্যিকে দেখেই আঁতকে উঠল।

তার পেটের পিলে মাথায় উঠে গেছে তখন। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ধরা পড়ে গিয়ে হাউমাউ করে উঠল সে। কিন্তু সে মাত্র ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

রোগী আবার সুস্থ হয়ে প্রণাম করল আচার্যিকে। অতি কষ্টে চিঁ চিঁ করে বলল, "মরে গেলুম আচার্যিমশাই। আর তো পারি না। এইমাত্র আপনাকে দেখে আমাকে ছেড়েছে। আপনি চলে গেলেই আবার ধরবে আমায়।"

আচার্যি বললেন, "চুপ করে বসে থাকো তুমি। ওর যাওয়ার রাস্তা আমি বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। আবার এক্ষুনি এসে ধরবে ও তোমাকে।"

আচার্যির কথা শেষ হতে না হতেই চেঁচিয়ে উঠল রোগী। চোখ লাল করে বলল, "ধরবে না তো কী করবে শুনি? এত লোকের ওলাউঠো হয়, তোর হয় না? তোর কী এমন পাকা ধানে মই দিয়েছি আমি যে, আমাকে তাড়াবার জন্য এমন উঠেপড়ে লেগেছিস?"

আচার্যি বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, "ওকে তুই ছেড়ে দিয়ে আবার কেন ধরেছিস বল?"

"কেন ধরব না! আমি তো চলেই যাচ্ছিলাম। কেন তুই গণ্ডি দিলি?"

"আজ তোর শ্রাদ্ধ করব বলে গণ্ডি দিয়েছি।"

রোগী নিজের মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। হয়তো বা গালাগালি করল আচার্যিকে।

আচার্যি রোগীকে বললেন, "তুই যে সেদিন বললি আমি ওকে ছেড়ে যাব, তা আবার কেন ধরলি?"

আর কোনও উত্তর নেই রোগীর মুখে।

আচার্যি এবার তাঁর ঝোলার ভেতর থেকে একটা মড়ার মাথার খুলি বের করলেন।

খুলিটা দেখেই লাফিয়ে উঠল রোগী, "ওরে বাবা। ওটা তুই বের করলি কেন আচার্যি? শিবু চাঁড়ালের জামাই বিশুর করোটি ওটা, ও যে আমি চিনি। বিশুকে সাপে কাটল সেবার রথের দিনে। তা সে মড়া কেউ পোড়াতে দিল না। গাঁয়ের লোকেরা বলল কলার মাঞ্জাসে করে ওটা খালের জলে ভাসিয়ে দাও। সেই মড়া বাবুর মায়ের খালে ভেসে ঠেকল গিয়ে হরারডাঙার চটানে। শেয়াল কুকুরে ছেঁড়াছিঁড়ি করল। মাথাটা নিয়ে তুই প্রেতপুজো করে পচালি। তারপর তোর চ্যালারা ওটা পরিষ্কার করে তোকে কারণ খেতে দিল। ওটা তোর ঝুলিতে রেখে দে আচার্যি। তোর পায়ে পড়ি।"

আচার্যি তখন ঝুলির ভেতর থেকে একটা বোতল বের করলেন। বললেন, "দেখছিস তো?"

"ওতে কী রে আচার্যি?"

"স্বাতী নক্ষত্রের জল।"

আচার্যি মড়ার মাথার খুলিতে স্বাতী নক্ষত্রের জল ঢেলে অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র পড়লেন। তারপর সেই জল ছুড়ে মারলেন রোগীর গায়ে।

রোগী তখন 'বাপ রে মা রে' করে উঠল।

"ওরে আমার ঘাট হয়েছে রে। তোর পায়ে পড়ি আচার্যি। আমায় ছেড়ে দে। আর ধরব না একে।"

“তোকে আজ ঝাঁটাপেটা করে তাড়াব আমি।”

রোগী এবার তেতে উঠল, “দ্যাখ আচার্যি, মুখ সামলে কথা বলবি। আমাকে তুই যা-তা মনে করিসনি। এককালে আমি মস্ত পণ্ডিত ছিলুম। আজ কর্মদোষে প্রেতযোনি পেয়েছি তাই। যা বললি তা আর কোনওদিন বলবি না।”

“বেশ করব, বলব। যে সত্যিকারের পণ্ডিত হয় সে কখনও এইরকম ছ্যাঁচড়ামো করে?”

“খবরদার বলছি, আমার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলবি।”

“বেশ, বলব। তুই সত্যিই পণ্ডিত কি আকাট মুখ্যু তার পরিচয় দে আগে। তারপর বলব।”

“ঠিক আছে। আমাকে তুই পরীক্ষা কর।”

আচার্যি একটু সময় কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, “বল দেখি হরধনু কে ভেঙেছিল?”

“তোর মরা বাবা ভেঙেছিল। ওই নাম আমাকে বলতে আছে যে বলব?”

“তুই ব্যাটা জানিস যে বলবি?”

“জানি না তো জানি না। আমায় এবারের মতো ছেড়ে দে। আমার ঘাট হয়েছে।”

“এখন কি ছাড়ব? আগে তুই স্বীকার কর যে, তুই মুখ্যু। তবে তো ছাড়ব।”

“তা কেন করব?”

“তবে কেন ছাড়ব?”

“ওই প্রশ্নটা বাদ দিয়ে অন্য প্রশ্ন কর তুই।”

আচার্যি বললেন, “বেশ, তাই করছি। বল, দশরথের বড়ছেলের নাম কী?”

“বলব না। ও নাম আমাকে বলতে নেই।”

“না বললে আমিও ছাড়ব না। আরও গালাগালি দেব।”

“একান্তই বলাবি তা হলে?”

“হ্যাঁ।”

“তবে শোন, সীতার পতির যে নাম, দশরথের বড়ছেলের সেই নাম।”

“এরকম উত্তর তো আমি চাই না।”

“আর আমাকে জ্বালাস না আচার্যি। ওই নাম বললেই আমি উদ্ধার হয়ে যাব। আমি তিন সত্যি করছি, আর কখনও এর ত্রিসীমানায় আসব না। এবার আমায় ছেড়ে দে।”

“যা। দূর হয়ে যা। তবে তুই যে যাচ্ছিস তার একটা চিহ্ন দিয়ে যা।”

“কী চিহ্ন চাস তুই বল?”

“এই শিলটাকে মুখে করে নিয়ে যা।”

“ওরে বাবা! ও আমি পারব না। আমার শরীর বড় দুর্বল। আমায় অন্য কিছু করতে বল আচার্যি।”

“তবে ওই জুতোজোড়াটা নিয়ে যা।”

“জুতো আমি ছুঁই না।”

“বেশ। ওই পাকুড়গাছের একটা কাঁচা ডাল ভেঙে দিয়ে যা তবে।”

“তা যাচ্ছি। গণ্ডি মুছে দে।”

আচার্যি গণ্ডি কেটে দিলেন।

তারপর সকলকে বললেন, “পাকুড়গাছের ডালটা ভাঙামাত্রই তারা যেন রোগীকে ধরে

ফেলে। কেননা ভূতে ধরা লোকের গা থেকে ভূত যদি ছেড়ে যায় তবে সে-সময় পড়ে গেলে হয় অঙ্গহানি, নাহলে মৃত্যু হতে পারে। রোজার বাবারও তখন আর করবার কিছু থাকে না।"

যা হোক, রোগী তখন মাতালের মতো টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

তারপর সেইভাবেই টলতে টলতে কুলি (রাস্তা) ধরে পাকুড়গাছটার দিকে চলল।

রোগীর সঙ্গে চলল কয়েকজন সদাসতর্ক লোক।

পাকুড়তলায় যাওয়ামাত্রই বিরাট একটা কাঁচা ডাল সকলের জোড়া জোড়া চোখকে বিস্মিত করে মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ল গাছতলায়। আর সেইসঙ্গে হু হু করে হাওয়া বইতে লাগল। সে কী ভীষণ দমকা হাওয়া। যেন ঝড় উঠল। ধুলো কুটো শূন্যে উঠে ঘুরপাক খেতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বাড়ির লোকেরা ধরে ফেলল রোগীকে। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে ধরে নিয়ে এল তাকে।

আচার্যি একটা রক্ষাকবচ করে ঝুলিয়ে দিলেন তার গলায়। আচার্যির কৃপায় সে-যাত্রা বেঁচে গেল লোকটি।

লক্ষ্মী আচার্যির ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারদিকে। হ্যাঁ, গুনিনের মতো গুনিন বটে! সবার সেরা গুনিন।

শুধু এই ঘটনা নয়—

আরও বহু ঘটনায় সাফল্য লাভ করেছেন লক্ষ্মী আচার্যি।

তবে কেউ প্রশংসা করলে তিনি খেপে যেতেন। বলতেন, "বেরো শালারা। যা করেছে তা আমার মা ব্রহ্মময়ী করেছে। আমি কী করেছি রে! আমায় তোষামোদ করতে এসেছিস কেন? মায়ের চেয়ে আমি বড়, না?"

কাজেই আচার্যির কাছে কেউ বড় একটা বিপদে না পড়লে সচরাচর যেত না।

আচার্যি গুনিন মানুষ তো। দিনরাত নেশায় চুর হয়ে থাকতেন। সন্ধে হলেই ভূতের কাঁধে চেপে যেতেন হবারডাঙায়। হরিহরডাঙার চটানে।

সেখানে একদল ভূত এসে জমত।

কালো কালো ছায়া ছায়া ভূতেরা, আলোর রেখার মতো কঙ্কালের দল ঝুপঝাপ করে গাছের ডাল থেকে নেমে আসত।

শ্মশানের শ থেকে উঠে আসত কায়াহীন ছায়ারা।

আচার্যি গাঁজার কলকেটা এগিয়ে দিয়ে বলতেন, "এটা ঠিক করে সেজে দে।"

অমনি একজন সেটা হাত নিয়ে সাজতে বসত। শ থেকে ফুঁ দিয়ে আগুন বের করে ধরাত। তারপর বলত, "এই নে খা। একটু পেসাদ আমাদেরকেও দিস আচার্যি।"

আচার্যি একটা টান দিয়ে ভূতদের হাতে তুলে দিতেন সেই কলকেটা। তারপর সেটা হাতে হাতে ঘুরত।

আড়ালে আবডালে লুকিয়ে এ দৃশ্য যারা দেখত তারা এসে গল্প করত অন্যদের কাছে। সকলে অবাক হয়ে যেত শুনে। চোখদুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠত।

পেঁচোয় পেয়েছে একটা ছেলেকে। কখনও নীল, কখনও লাল হয়ে যাচ্ছে।

সবাই বলল, "ও ছেলে বাঁচবে না। চারদিনের ছেলে। বাঁচে কখনও?"

খবর গেল আচার্যির কাছে।

বললেন, "বাঁচবে না মানে? আমি বাঁচাব ওকে।"

সবাই কেঁদেকেটে পায়ে ধরল আচার্যির, "দয়া করুন আচার্যিমশাই।"

"দয়া তো করছি রে বাবা। বলছি তো বাঁচাব। আজ মাঝরাতে ছেলের মাকে একলা যেতে বলবি শ্মশানে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবে শুধু। তারপর আমি আছি।"

"একলা যাবে? ভয় করবে না বাবা?"

"ভয় করলে তো চলবে না। ছেলেকে বাঁচাতে গেলে সাহস করে যেতে হবে।"

যেতে যখন হবেই তখন যাওয়া হল।

ছেলেকে বুকে নিয়ে ছেলের মা একলা চলল হরারডাঙার চটানে।

বাবুর মায়ের খালের ধারে আসতেই কে যেন বলল, "তুই ওইখানেই বোস মা। ছেলেটা দে।"

ছেলের মা খালের ধারে বসে পড়ল।

"দে। ছেলেটা দে।"

ছেলের মা তো অবাক! কাউকেই তো সে দেখতে পাচ্ছে না। দেবে কাকে?

"ছেলেটাকে তুলে ধর। আমি নিয়ে নিচ্ছি।"

ছেলেকে তুলে ধরল মা।

অমনি কোথা থেকে দুটো হাত এসে নিয়ে নিল ছেলেটিকে।

লক্ষ্মী আচার্যি শ্মশানে ছিলেন।

সেই হাতদুটো ছেলেটাকে নিয়ে আচার্যির পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল।

আচার্যি বললেন, "এখানে রাখলি কেন, শ-এর ওপর শুইয়ে দিয়ে আয়।"

অমনি পেছন থেকে ছেলের মা কেঁদে উঠে বলল, "না না। আঁতুড়ের ছেলে। ওকে শ-এ শোয়াবেন না আচার্যিমশাই। কচি গা। বড্ড লাগবে।"

আচার্যি গম্ভীর গলায় বললেন, "তুই এখানে এলি কেন? তোকে না খালের ধারে বসতে বললাম।"

"ক্ষমা করুন আমাকে! আমি থাকতে পারলুম না।"

আচার্যি বললেন, "ঠিক আছে। এসেছিস যখন, বোস। কথা বলবি না। উঠবি না।" তারপর কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বললেন, "কই রে! যা, শ-এর ওপর রেখে আয় ওকে।"

অমনি সেই হাতদুটো ছেলেটাকে তুলে নিয়ে রেখে এল শ-এর ওপর। ছেলে তো নয়, লাল রক্তমাংসের ড্যালা একটি। কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও হলুদ হয়ে যাচ্ছে ছেলেটার গায়ের রং।

ছেলের মা অধীর আগ্রহে বসে রইল।

রাত যখন শেষ হয়ে আসছে, আচার্যি তখন ছেলের মাকে বললেন, "যা। এবার তোর ছেলে নিয়ে তুই ঘরে চলে যা।"

মা তো আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

"উঁহুঁ। উঠো না। বোসো।" বলে শ-এর দিকে তাকিয়ে ছেলেটাকে ডাকলেন তিনি, "আয়। উঠে আয়।"

মা তো অবাক! চারদিনের ছেলে উঠে আসবে কী।

কিন্তু উঠে এল ছেলেটি।

আচার্যির ভেলকিতে সবকিছুই সম্ভব হয়।

চারদিনের ছেলে পা পা করে এগিয়ে এসে মায়ের কোলে শুয়ে পড়ল।

আচার্যি বললেন, "যাঃ! খুব বেঁচে গেছে এ যাত্রা। আর কোনও ভয় নেই। সাবধানে রাখিস। কাল একটা মাদুলি করে দেব। সেটা ছেলের গলায় পরিয়ে দিবি।"

ছেলের মা ছেলে নিয়ে চলে গেল।

লক্ষ্মী আচার্যির যশের ধারা গড়িয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে।

এইভাবেই দিন যায়।

একদিন আচার্যি যখন হরারডাঙায় যাচ্ছিলেন, পালকি বইতে বইতে ভূতেরা তখন বলল, "আচ্ছা গুনিন—।"

গুনিন তখন নেশায় চুর, "কী রে!"

"আচ্ছা, তুই এত সাহস পেলি কোত্থেকে রে?"

"কেন, আমার মা ব্রহ্মময়ীর কাছ থেকে পেয়েছি।"

"সত্যি গুনিন, তোর মতো সাহসী লোক একজনও দেখিনি আমরা। আচ্ছা, তোর কি কোনও কিছুতেই ভয় করে না? এই যে আমাদের কাঁধে চেপে ঘুরে বেড়াস, হাজার হলেও মানুষ তো তুই?"

"নাঃ। তোরা দেখছি ভূত তো ভূত। ভয় থাকলে কখনও তোদের কাঁধে চেপে ঘুরে বেড়াই?"

"তা বটে। তা বটে।"

"কিন্তু তোদের মতলবটা কি বল তো? আজ হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করছিস যে?"

"না। মতলব আর কি! হাজার হলেও তুই আমাদের মনিব। তাই জিজ্ঞেস করছিলুম যদি তোর কোনও কিছুতে ভয়ডর থাকে তবে সে ভয়টা আমরা ভেঙে দেব। এই আর কি।"

এই কথা রোজই হয়।

আচার্যি বলেন, "তোরা ব্যাটারা জ্বালিয়ে মারলি। আমার আবার ভয় কী?"

ভূতেরা বলে, "বল না গুনিন?"

আচার্যি বলেন, "আমি কাউকে ভয় করি না। কোনও ব্যাটাকে ভয় করি না।"

ভূতেরা চুপ করে যায়।

অন্যদিনের মতো সেদিনও সন্ধের পর ভূতেরা আচার্যির পালকি বয়ে আনছিল।

আচার্যি সেদিন দারুণ নেশা করেছিলেন।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তা সত্ত্বেও সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তিনি শ্মশানে যাচ্ছিলেন জপ করতে।

অন্যদিনের মতো সেদিনও ভূতেরা বলল, "বল না গুনিন, তোর কীসে ভয়?"

আচার্যি বললেন, "ভয় আবার কীসের?"

"বল না বাবা?"

নেশায় আরক্ত চোখদুটিকে একবার চারদিকে ঘুরিয়ে আচার্যি বললেন, "একান্তই শুনবি তা হলে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুনব।"

"ভয় অবশ্য তেমন কিছু নয়। তবে—।"

"তবে? তবে কি? বল না?"

"শ্মশানে নামবার মুখে যে শ্যাওড়া গাছটা আছে, দেখেছিস?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই গাছের ডালে তো শশধর নাপিত গলায় দড়ি দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। ওই শ্যাওড়া গাছের ডাল থেকে একটা হুট্ ট্যাঁটারু পাখি ডেকে ওঠে?"

"ডাকে। রোজ ডাকে।"

"ওই পাখিটা যখন আচমকা ডেকে ওঠে তখন কেন জানি না আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে ওঠে। এই যা। আর কিছু নয়।"

"এঃ হে। এই কথা! তা আমাদের আগে বলিসনি কেন গুনিন। দেখ না আজই ব্যাটাকে শেষ করে দিচ্ছি।"

"দিবি? তাই দে, একেবারে খতম করে দে ব্যাটাকে।"

"সে-কথা আবার বলতে?"

কিছুক্ষণ পরেই হরারডাঙা এসে গেল। আর চরের ঢালে শ্মশানে নামার মুখেই বিপর্যয়টা ঘটে গেল হঠাৎ।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে বনবাদাড়ের ভেতর থেকে পাখিটা বিকট স্বরে ডেকে উঠল সেদিনও—হু-হু-হুট-ট্যাঁ-ট্যাঁ—।"

চমকে উঠলেন গুনিন।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, কেউ যেন তাঁর পালকিটাকে দেশলাইয়ের খোলের মতো ছুড়ে ফেলে দিল।

অমনই কোটি কোটি গলায় কারা যেন ভীষণ রবে ডেকে উঠল সেই পাখিটার স্বর নকল করে—হু-হু-হুট্-ট্যাঁ-ট্যাঁ। হুট্-ট্যাঁ ট্যাঁ। হুট্-ট্যাঁ—।

শুধু তারা নয়, আশপাশ থেকে চারদিক থেকে তখন সে কি হাসি। হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। আর আর্তনাদ—আঁ-আ-আ। আঁ-আ-আ—।

শ্মশানের শ থেকে যেন হাজার হাজার কায়াহীন ছায়ারা সব এলোমেলো উঠে দাঁড়াল।

গুনিন বুঝতে পারলেন আজ আর তাঁর নিস্তার নেই।

নেশার ঘোর কেটে গেছে তখন। বুক ঢিপ ঢিপ করছে ভয়ে। ছিটকে পড়ে গিয়ে সারা গায়ে হাতে কী অসহ্য যন্ত্রণা। কোমরের অস্থিসন্ধিটাও ভেঙে গেল নাকি? বুকটা ভিজে ভিজে ঠেকছে। বোধ হয় নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। আচার্যি দেখতে পেলেন, দুটো আধপোড়া হাত ক্রমশ ধীরে ধীরে তাঁর গলার কাছে এগিয়ে আসছে!



আজাহার মথুরার গল্প

বর্ধমান সদরঘাটে দামোদর নদের বিস্তীর্ণ বালুকাবেলার ওপারে পলেমপুর নামে একটা গ্রাম আছে। পলেমপুরের পূর্বনাম ছিল পালোয়ানপুর। এখন কিন্তু পালোয়ানপুর বললে কেউ চিনতেই পারবে না। বলবে, "পালোয়ানপুর? সি কোন্ গেরাম বটে?" তবে প্রবীণ যারা, তারা অবশ্য সে-কথা বলবে না। শুধু বর্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা করে দুঃখ-সুখের হিসেবনিকেশ করবে।

এই পালোয়ানপুর গ্রামে আজাহার আর মথুরা নামে দু'জন পালোয়ান থাকত। আজাহার ছিল মুসলমান। মথুরা ছিল হিন্দু।

আজাহারের আসল বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার এক গ্রামে। আর মথুরা ছিল বর্ধমান জেলারই লোক। মথুরার পূর্বপুরুষরা এই বর্ধমান জেলাতেই পালোয়ানপুরে জন্মেছে, মরেছে। তবে মানুষের মতো মানুষ হয়ে থাকেনি তারা। ঠ্যাঙাড়েগিরি করে, ডাকাতি করে জীবন কাটিয়েছে। কাজেই মথুরাও সেই রক্তের ছেলে হয়ে মস্ত বীর হয়ে উঠল। সোনারুন্দীর জমিদার বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে মথুরার বাবার সঙ্গে আজাহারের বাবা কাশেম আলির পরিচয় হয়। ব্রিটিশ তখন রাজত্ব করছে এদেশে। সেই সময় কোনও এক ক্ষেত্রে ডাকাতির অভিযোগে কাশেম আলি ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়। মথুরার বাবা তখন আজাহারকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং মথুরার সঙ্গে অপত্যস্নেহে লালনপালন করেন।

আজাহার আর মথুরা দু'জনে একসঙ্গে বড় হওয়ায় অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে উঠল। দু'জনেই হয়ে উঠল বীরের মতো বীর। চেহারা হল বুনো মোষের মতো।

তবে দিনকাল খারাপ হওয়ায় ডাকাতির জাতব্যবসা তারা ধরল না। তারা গেল অন্য পথে। শরীরের মধ্যে আসুরিক শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য উঠেপড়ে লাগল তারা।

গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারে কুস্তির আখড়া হল তাদের।

সেইখানে চলল নিষ্ঠার সঙ্গে দু'জনের শক্তিসঞ্চয়ের মহড়া। ডন বৈঠক দিয়ে, মুগুর ভেঁজে, কুস্তি করে অল্পদিনের মধ্যেই দু'জনে দু-দুটো অসুর হয়ে দাঁড়াল।

যখন তারা বুঝল যে, তাদের সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠবে এই অঞ্চলে এমন কেউ নেই, তখন একদিন আজাহার বলল, "চল মথুরা, এইবার আমরা ঠ্যাঙা-লাঠি ধরে চারদিক দাপিয়ে বেড়াই।"

মথুরা বলল, "না। আমার মাথায় অন্য এক মতলব আছে।"

আজাহার বলল, "কীরকম?"

"চুরি ডাকাতি বড় বাজে কাজ। ও কাজ আর করব না।"

"তা হলে কী করবি বল? একটা কিছু তো করতে হবে?"

"হ্যাঁ। সেই একটা কিছুর বুদ্ধিই আমার মাথায় এসেছে। আর সে বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে

পারলে আমাদের পেটও ভরবে, খাতিরও পাব। বেশ বুক ফুলিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াব আমরা।"

আজাহারের আর তর সইছিল না। বলল, "বলিস কী রে! তা এরকম মতলব যখন মাথায় এসেছে তখন বলেই ফেল কী করতে চাস?"

মথুরা বলল, "আমরা দিগ্বিজয়ে বেরোব।"

আজাহার হতাশ হয়ে বলল, "দূর। তাতে কী হবে?"

মথুরা বলল, "আরে! আগে শোনই না, কী বলতে চাই।"

"বল।"

"আমরা দিগ্বিজয়ে বেরোব মানে কী? একেবারে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ঘুরে বেড়াব। অর্থাৎ আমরা এমন চ্যালেঞ্জ নেব যে, তাতে আমাদের দু'জনের বাজিমাত হবেই।"

"বটে!"

"হ্যাঁ।"

"সেই চ্যালেঞ্জটা কী শুনি?"

"চ্যালেঞ্জটা হল, আমরা চারদিকে রটিয়ে দেব যে আমরা প্রত্যেক গ্রামে গিয়ে সেখানকার মস্তানদের সঙ্গে লড়াই করতে চাই। শামিয়ানা খাটিয়ে সকলের চোখের সামনে লড়াই হবে আমাদের। সেখানে শক্তিপরীক্ষায় যদি কেউ আমাদের হারাতে পারে তবে আমরা তার কাছে দাসখত লিখে নতিস্বীকার করে চলে আসব। আর যদি না পারে তবে সেই গ্রামের লোকদের আমাদের কাছে বশ্যতাস্বীকার করে রুপোর মেডেল ঝুলিয়ে দিতে হবে আমাদের গলায়। মেডেলের গায়ে সেই গ্রামের নাম খোদাই করা থাকবে। লেখা থাকবে আমরা পরাজিত।"

আজাহার বলল, "শুধু তাই নয়। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিয়ে আসব।"

মথুরা বলল, "না, তা করব না। সেই পরাজয়ের খেসারত স্বরূপ নগদ একশো টাকা দিতে হবে তাদের।"

আজাহার তো লাফিয়ে উঠল শুনে, "মা-শা-আল্লা। মা-শা-আল্লা। ঠিক বলেছিস ভাই।"

মথুরা বলল, "এতে আমাদের পেটও ভরবে, টাকাও হবে। ডাকাতির চেয়ে বরং বেশি রোজগার হবে এতে। লোকে আমাদের ঘৃণা না করে ভক্তি করবে। পুলিশও পেছনে লাগবে না। বেশ বহাল তবিয়তে রাজত্ব করব আমরা। আর যেখানে যে দেশেই যাই না কেন, জয় আমাদের হবেই।"

আজাহার বলল, "বটেই তো! কে পারবে আমাদের সঙ্গে?"

মথুরা বলল, "আমি তো আমার এই সাঁড়াশির মতো হাত দুটো দিয়ে যাকে ধরব তাকে একেবারে বেঁকিয়ে দেব।"

আজাহার বলল, "আর আমি করব কি, আমার এই এক হাতে যার মাথাটা একবার ধরব, আমার হাতের ভেতরেই তার মাথাটা গুঁড়িয়ে একেবারে ছাতু করে দেব।"

আজাহার আর মথুরা দু'জনেই মনে মনে এই ফন্দি এঁটে লোকমুখে সেই কথা সব জায়গায় প্রচার করে দিল। একেই তো আজাহার মথুরার গায়ের জোর এত বেশি ছিল যে, সেই ভয়ে সবাই তটস্থ হয়ে থাকত। তার ওপরে তাদের এই প্রস্তাবের কথা শুনে ভয়ে পিলে শুকিয়ে গেল আশপাশের গ্রামের লোকদের।

আজাহার, মথুরার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় জয়লাভ করতে হবে। কিন্তু সেই পরীক্ষায়

এগোবে কে? যমের মতো অমন দু-দু'জন মূর্তিমান বিভীষিকার সামনে গিয়ে কে দাঁড়াবে?

কেউ সাহস করে না।

গ্রামে গ্রামে তখন স্যাকরারা গিয়ে রুপোর মেডেল তৈরি করতে বসল। সোনার চেনে গাঁথা হবে সেই রুপোর মেডেলের মালা। সেই মালা দুলবে আজাহার আর মথুরার গলায়। রোদ লেগে, আলো লেগে ঝলমল করবে সেই মালা।

গ্রামের লোকেরা চাঁদা তুলতে শুরু করল। কেননা শুধু মেডেল দিলেই তো হবে না। তার সঙ্গে সেলামি বা প্রণামী হিসেবে দিতে হবে একশো টাকা।

না দিয়ে উপায়ই বা কী?

দু-দু'জন অসুরের হাতে বেঘোরে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে নতিস্বীকার করা অনেক ভাল।

আজাহার মথুরার মতো বীর কালেভদ্রে জন্মায়। অতএব জেনেশুনে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আজাহার, মথুরা প্রথমেই গেল সগরাইতে। এখান থেকে দুটো রাস্তা বেঁকে গেছে দু'দিকে। বাঁ হাতি রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ছোট বৈন্যান, রায়না আর কারেলাঘাটের দিকে। তারপর আর পথ নেই। দামোদর পার হয়ে উঠতে হবে জামালপুরের ঘাটে। আর ডান হাতি, মানে সোজা দক্ষিণমুখো রাস্তাটা চলে গেছে একলক্ষ্মী, বুলচাঁদ, মোগলমারি হয়ে জাহানাবাদ (আরামবাগ)। আজাহার মথুরা ঠিক করল, সগরাই হয়ে সেয়ারাবাজার হয়ে সোজা রাস্তা ধরে জাহানাবাদের দিকে চলে যাবে। এই ভেবে সগরাইতে গিয়ে উঠল তারা।

সগরাই গ্রামের লোকেরা তো ভয়েই অস্থির।

যাই হোক, রাত্রিবেলা মস্ত শামিয়ানার নীচে আজাহার, মথুরা হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াল।

ঢাক আর কাঁসিতে বাজনা উঠল লড়াইয়ের।

আসরে মাথা হেঁট করে ঢুকল ভুবন সর্দার। ভুবন সর্দার এ অঞ্চলের নামকরা ডাকাত।

আজাহার বলল, "কী সর্দার! লড়বে নাকি?"

ভুবন বলল, "না হুজুর।"

মথুরা বলল, "সে কী!"

ভুবন বলল, "আমি আপনাদের দাস।"

আজাহার সকলকে শুনিয়ে বলল, "তোমরা শোনো হে, বিখ্যাত ভুবন সর্দার বলছে সে নাকি আমাদের দাস।"

সবাই বলল, "আমরা সাক্ষী। আমরাও আপনাদের কাছে আমাদের নতিস্বীকার করছি।"

মথুরা বলল, "তা হলে নিয়ে এসো আমাদের রুপোর মেডেল।" আজাহার মথুরার গলায় আংটা দেওয়া সোনার চেন ছিল। তাতে এঁটে দেওয়া হল রুপোর মেডেল। একটা আজাহারকে। একটা মথুরাকে।

মথুরা ভুবন সর্দারকে বলল, "এরকম ক্ষমতা নিয়ে তুমি মানুষ মারো সর্দার!"

"কী করব! এ যে আমাদের জাত ব্যবসা।"

আজাহার বলল, "ঠিক আছে। এবার থেকে এ ব্যবসা ছেড়ে অন্য কিছু করো। মনে রেখো এটা তোমার প্রভুর আদেশ।"

"হুজুর মা বাপ।" বলে ভুবন তার লাঠি মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, "এই নামালাম লাঠি। আর এ-কাজ করব না।"

আজাহার, মথুরা এবার গেল আমলেতে।

আমলের মোনা ঘোষ আর পোনা পান ছিল নামকরা পালোয়ান। যেমন শক্তিমান, তেমনই দুর্ধর্ষ।

আমলে বাজারে লড়াইয়ের আসরে দু'পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়াল।

একদিকে আজাহার, মথুরা।

অপরদিকে মোনা, পোনা।

আজাহার বলল, "কী রে মোনা, লড়বি নাকি?"

মোনা বলল, "আলবত।"

মথুরা পোনাকে বলল, "তুই?"

"এক হাত হয়ে যাক না! মন্দ কি?"

আজাহার, মথুরা বলল, "এখনও ভেবে দ্যাখ।"

মোনা, পোনার এ অঞ্চলে খাতির ছিল খুব। কাজেই কিছুতেই তারা হারস্বীকার করতে সাহস পাচ্ছিল না। অথচ মুখে বললেও ভয়ে বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল তাদের। বলল, "ব-ব-বললুম তো।"

আজাহার, মথুরা বলল, "তোরা তো এখনই তোতলাতে শুরু করেছিস। এর পরে কী করবি?"

দর্শকদের ভেতর থেকে একজন বলল, "এর পরে পাঁকে শুয়ে গড়াগড়ি খাবে।"

মোনা, পোনা বুঝল হাওয়া খারাপ। বলল, "না ভাই। সাহস পাচ্ছি না। ক্ষমা করো তোমরা। আমরা হারস্বীকার করছি। শুধু তাই নয়, বরাবরের জন্য এ গ্রাম ছেড়েও চলে যাচ্ছি আমরা। কেননা পরাজয় স্বীকার করে এ গ্রামে মাথা উঁচিয়ে আমরা আর থাকতে পারব না। শুধু গ্রামে কেন, এ তল্লাটে থাকতে পারব না।"

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের বাদ্যি তুমুল ভাবে বেজে উঠে আজাহার-মথুরার জয় ঘোষণা করল।

গ্রামের লোকেরা আজাহার-মথুরার পায়ের তলায় একশো টাকা রেখে গলায় ঝুলিয়ে দিল সেই রুপোর মেডেল। তারপর সারারাত ধরে আজাহার মথুরাকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে চারদিক প্রদক্ষিণ করল।

পরদিন আজাহার, মথুরা আবার রওনা হল অন্য দেশের দিকে।

আজাহার, মথুরার নামে তখন এমন বিভীষিকা লেগে গেছে চারদিকে যে, কোনও পালোয়ানই আর মাতব্বরি করতে সাহস পায় না। যে শোনে আজাহার, মথুরার নাম, সেই গা-ঢাকা দেয়।

অতএব লড়াই আর হয় না।

আজাহার, মথুরা টাকার বাণ্ডিল নিয়ে, মেডেল ঝুলিয়ে ঘুরতে থাকে।

দেশ দেশান্তরে তখন নাম ছড়িয়ে পড়েছে তাদের।

তাদের নিয়ে মুখে মুখে ছেলে-ভুলানো ছড়াও বেরিয়ে গেল কত। ছড়া শুনে দুষ্ট ছেলেরা কান্না ভুলে মায়ের বুকে মুখ লুকোতো। যেই কেউ বলত ওই আজাহার আসছে, ওই মথুরা আসছে, অমনি ছেলেমেয়েরা ভয়ে মা-বাবাকে জড়িয়ে ধরত।

যাই হোক, আজাহার, মথুরা এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন উচালনের প্রান্তে এসে হাজির হল।

উচালন হল বর্ধমান জেলারই অন্তর্গত একটি গ্রাম।

বাঁধা সড়ক ধরে সোজা গ্রামের ভেতরদিকে চলে গেছে একটা রাস্তা। সেই রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটা বটগাছের নীচে বসল দু'জনে।

তখন গ্রীষ্মকাল। বেশ ফুরফুর করে বাতাস বইছিল। আজাহার, মথুরার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল সেই শীতল বাতাসে। গাছের ডালে ডালে পিক পিক করে পাখি ডাকছে। কত রংবেরঙের পাখি।

তখন সন্ধে হয়ে আসছে। ক্লান্ত পাখিরা আসছে গাছের ডালে আশ্রয় নিতে। কলবল কিচিরমিচির করে তারা সারাদিনের সুখদুঃখের কথা বলছে।

আজাহার বলল, "বেশ জায়গাটা না?"

মথুরা বলল, "হ্যাঁ।"

আজাহার বলল, "এবার কিন্তু একঘেয়ে লাগছে সব। যেখানেই যাই সেই একই ব্যাপার। কেউ আর লড়াই করতে চায় না। নাম শুনলেই ভয়ে পালায়। নয়তো নতিস্বীকার করে।"

মথুরা বলল, "কে লড়বে বল? তাদের আর দোষ কী? ভয়েই তো পিলে শুকিয়ে যায় সব। আমাদের এমন অমানুষিক শক্তির সঙ্গে চ্যালেঞ্জ লড়তে কি কেউ পারে?"

"তাই তো বলছি। আর ভাল লাগছে না। অনেক টাকা হয়ে গেছে আমাদের। এগুলো বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আবার নতুন উদ্যমে বেরনো যাবে।"

"তা অবশ্য মন্দ বলিসনি।"

"আজ এই গ্রামে চ্যালেঞ্জ সেরে কাল বরং ফেরা যাবে কী বল?"

"হ্যাঁ, তাই।"

আজাহার, মথুরা বিশ্রাম সেরে গ্রামে ঢুকবে ভাবছে এমন সময় দেখতে পেল রোগা বেঁটে কালোমতো একটা লোক নিজের মনে গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

লোকটিকে দেখতে পেয়ে আজাহার ডাকল, "ও ভাই, শোনো?"

লোকটি উত্তরও দিল না। ফিরেও তাকাল না।

আজাহার আবার ডাকল, "ও ভাই...?"

মথুরা ডাকল, "এই যে! শুনছ?"

লোকটি এবার গান থামিয়ে শিস দিতে দিতে ওদের কাছে এগিয়ে এল। তারপর মাথার ঝাঁকড়া চুল নাড়িয়ে দু'হাত কোমরে রেখে কায়দামাফিক ভাবে দাঁড়িয়ে বলল, "আমায় ডাকছেন?"

আজাহার বেশ ভারিক্কি গলায় বলল, "হ্যাঁ। তোমাকেই ডাকছি। কেননা এখানে তুমি ছাড়া তো আর কেউ নেই।"

"কী দরকার বলুন?"

মথুরা বলল, "তুমি কি এই গ্রামেরই লোক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কী নাম তোমার?"

"আমার নাম বাঁকা।"

"বাঁকা! সে আবার কী নাম?"

"এরকমই নাম। আমি নামেও বাঁকা, কাজেও বাঁকা। বাগদিপাড়ায় থাকি। সবাই আমাকে বাঁকা বাগদি বলে।"

মথুরা বলল, "বেশ। তা দেখে তো তোমাকে বেশ ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে।"

"আজ্ঞে ভাল লোক আমি মোটেই নই। আমার সঙ্গে কারও বনে না। আমার সঙ্গে কেউ বেগড়বাঁই করলেই আমি তার সঙ্গে বাঁকা ব্যবহার করি।"

"সে তো খুব ভাল। তা বলছিলাম কি, আমরা অনেক দূর থেকে আসছি। আজ রাত্রে তোমাদের গ্রামে অতিথি হতে চাই।"

"খুব ভাল কথা। অতিথি হন। কোনও আপত্তি নেই।"

মথুরা বলল, "তা তুমি গ্রামে গিয়ে একটু খবর দিতে পারো?"

"অতিথি হবেন এর জন্য খবর দিতে কে যাবে? গ্রামে যান। যার বাড়ি ইচ্ছে উঠুন। কেউ না করবে না। অত্যন্ত অতিথিবৎসল গ্রাম আমাদের।"

মথুরা বলল, "তবু যাও না। গিয়ে একটু খবর দিয়ে এসো না ভাই?"

লোকটি বেশ প্রসন্ন হয়ে বলল, "আচ্ছা যাচ্ছি। এত করে বলছেন যখন।" বলে সে যাওয়ার উপক্রম করতেই আজাহার বলল, "ওহে শোনো?"

লোকটি ফিরে তাকাল, "বলুন।"

"আর একটা কথা বলব তোমাকে।"

"আবার কী কথা?"

"তোমাদের গ্রামে যদি তেমন পালোয়ান গোছের কোনও লোক থাকে, তবে তাকেও একটু তৈরি থাকতে বোলো।"

লোকটি এবার অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

"আমরা তার সঙ্গে লড়াই করব।"

আজাহারের কথায় লোকটির এবার সন্দেহ হল খুব। সে আর একটু কাছে এগিয়ে এসে কপালটা ঈষৎ কুঁচকে বলল, "তার মানে?"

আজাহার বলল, "মানে অবশ্য একটাই আছে। সে তোমার জানবার দরকার নেই। যাও, তুমি গ্রামে গিয়ে খবর দাও।"

লোকটি বলল, "সে আবার কেমন কথা! আপনারা কে, কী আপনাদের পরিচয়, কিছু না জেনে আমি তো গ্রামে যাব না।"

"সে তোমার জানবার কোনও দরকার নেই।"

"দরকার নেই মানে? আপনারা অতিথি হতে চাইছেন ভাল কথা। কিন্তু অতিথি হয়ে আবার লড়াই করবার প্রস্তাব করছেন কেন? আগে আপনাদের পরিচয় দিন। তারপর গ্রামে যাব।"

আজাহার বলল, "আমাদের পরিচয় পেলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। যা বলি তাই করো।"

লোকটি রেগেমেগে বলল, "এঃ। অজ্ঞান হয়ে যাবে না হাতির মাথা হয়ে যাবে। আপনাদের পরিচয়টা দিয়েই দেখুন না, অজ্ঞান হই কি, কী হই, তখন দেখতে পাবেন।"

আজাহার বলল, "আমরা পালোয়ানপুরের লোক। আমাদের নাম আজাহার, মথুরা।"

"তাতে কী হয়েছে?"

মথুরা বলল, "কেন, আমাদের নাম শোনোনি?"

"না। অমন বিটকেল নাম আমার বাবাও কখনও শোনেনি।"

মথুরা কটমট করে তাকাল লোকটির দিকে। ইচ্ছে হল এক ঘুসিতে লোকটার মুখটাকে

ফাটিয়ে দেয়।

লোকটি বলল, "চোখ রাঙালে কী হবে? ও নাম শুনিনি। যাক। এবার আপনার অভিপ্রায়টা খুলে বলুন দেখি?"

লোকটির কথা শুনে আজাহারের মাথা তো গরম হয়ে উঠল। যাদের নাম শুনলে বাঘে গোরুতে ভয়ে এক ঘাটে জল খায় তাদের নাম জানে না এমন বেকুব কেউ যে কোথাও থাকতে পারে তা তাদের জানা ছিল না।

আজাহার আর মথুরার মধ্যে মথুরার মাথাটা ছিল একটু ঠাণ্ডা। সে অতিকষ্টে আজাহারকে শান্ত করে লোকটিকে তাদের উদ্দেশ্যের কথা এক এক করে সব খুলে বলল।

সব শুনে লোকটি বলল, "ও এই কথা। তোমরা বুঝি দেশে দেশে গিয়ে এসব কাজ করে বেড়াচ্ছ? তা তোমরা তো একটি চড়েরও খদ্দের নও বাপু, তোমাদের আবার লড়াই করবার শখ কেন?"

আজাহার রেগে বলল, "তুমি একটু মুখ সামলে কথা বলবার চেষ্টা করো।"

লোকটিও রেগে বলল, "কেন, ভয়ে নাকি? কে হ্যা তুমি যে, তোমার সঙ্গে মুখ সামলে কথা বলতে হবে?"

আজাহার বলল, "আমাদের এই চেহারা দেখলে যমের বুক পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, আর তুমি বলছ কিনা আমরা একটি চড়ের খদ্দের নই?"

"যা ঠিক তাই বলছি।"

মথুরা ফিসফিস করে আজাহারকে বলল, "এই, বেশি খচমচ করিস না এর সঙ্গে। ব্যাটার বোধ হয় মাথাখারাপ আছে।"

লোকটি সে-কথা শুনতে পেয়ে বলল, "মাথাখারাপ আমার নয়। মাথাখারাপ তোমাদের। এখনও বলছি ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যাও। নাহলে একবার যদি ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করি তো সহজে ছাড়ব না।"

এরপরে আর সহ্য করা যায় না। ছোট মুখে বড় কথা কে কবে সহ্য করেছে?

আজাহারের সারা শরীরে যেন জ্বালা ধরে গেল। তেড়েমেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

লোকটি চোখ রাঙিয়ে বলল, "অ্যাই! বেশি রোয়াব নেবে না।"

মথুরাও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

লোকটির রাগ আরও বেড়ে গেল, "বড্ড গরম দেখছি যে। ওসব আমার কাছে দেখিয়ো না, বুঝেছ? এই উচালনের নামকরা মস্তান আমি। অনেক আচ্ছা আচ্ছা লোককে ঘায়েল করে দিয়েছি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে এক্ষুনি ঠাণ্ডা করে দেব।"

আজাহার, মথুরা তো ভেবেই পেল না লোকটির সত্যিই মাথাখারাপ কিনা। মথুরা ব্যঙ্গ করে বলল, "ওরে আজাহার, একটা ইঁদুরের গর্ত দেখ। গিয়ে লুকিয়ে পড়ি। উনি আমাদের ঠাণ্ডা করে দেবেন।"

লোকটিও ধমকে উঠল অমনি, "চুপ কর, ব্যাটা বদমাশ কোথাকার! টিটকিরি মারছে আবার।"

মথুরা বলল, "দ্যাখো, আমরা অনেক সহ্য করেছি। আমি ইচ্ছে করলে এখুনি এক হাতে তোমাকে টিপে মেরে ফেলতে পারি।"

"তা মারো না। দেখব কত মায়ের দুধ খেয়েছ।"

"না। চুনোপুঁটি মারা আমাদের কাজ নয়, আর ছুঁচো মেরেও আমরা হাত গন্ধ করতে চাই

না। যাও, যা বলছি শোনো। গাঁয়ে গিয়ে খবর দাও।"

লোকটি বেদম খেপে গেছে তখন। বলল, "খবরটবর শিকেয় রাখো। আগে আমার সঙ্গে মোকাবিলা হোক। তারপর খবর। আমাকে এক হাতে টিপে মারবে বলেছ যখন, মারো আগে। তারপর খবর।"

আজহার বলল, "আমাদের ফের ঘাঁটাচ্ছ তুমি?"

"ঘাঁটাবার কী আছে? মারব যখন বলেছ তখন মারো। তুমি আমাকে এক হাতে টিপে মারবে আর আমি তোমাদের দু'জনকে দু'হাতে টিপে মারব। এসো, এগিয়ো এসো।"

আজাহার আর থাকতে পারল না এর পর। রেগে গিয়ে ঠাস করে লোকটার গালে মারল এক চড়। কিন্তু কী আশ্চর্য! যে চড় খেয়ে বহু আচ্ছা আচ্ছা লোকেরও ভুবন অন্ধকার হয়ে গেছে সেই চড় বেমালুম হজম করে লোকটি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আজাহার, মথুরার ওপর। তারপর দু'হাতে দু'জনকে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল একটা ধানকাটা মাঠের মধ্যে।

সেই মহাশক্তিমান দু'দুটো মানুষ তো হতভম্ব হয়ে গেল। এও কি সম্ভব? এ যে বিশ্বাস করা যায় না!

লোকটির কিন্তু কোনও কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঠে নামিয়েই শুরু করল তার খেলা।

দু'হাতে দু'জনের চুলের মুঠি ধরে অবিরাম ঠোকাঠুকি শুরু করল। তার ওপর কিল, চড়, লাথি, ঘুসিও চলল বেপরোয়া ভাবে।

আজাহার, মথুরা অমন মার জীবনে খায়নি। মারের চোটে তারা তখন বাবা রে মা রে করতে লাগল।

লোকটি বলল, "কেমন আরাম লাগছে এবার? তখন বলেছিলুম না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা। ভালয় ভালয় ফিরে গেলেই পারতিস। যেমন গেলি না এইবার তার ফল ভোগ কর।"

আজাহার বলল, "লক্ষ্মী দাদা আমার। এবারের মতো রেহাই দাও আমাদের। আমাদের ঘাট হয়েছে ভাই।"

লোকটি বলল, "পাগল না মাথাখারাপ? এত সহজে আমি ছাড়ি কখনও? এই তো সবে শুরু।"

মথুরা বলল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি ভাই। তোমার কথা না শুনে ঝকমারি হয়েছে আমাদের।"

আজাহার বলল, "আল্লা কসম। আর কখনও আমরা কারও সঙ্গে লড়াই করতে যাব না। তোমাকে আমরা কথা দিচ্ছি ভাই।"

আজাহার, মথুরা দু'জনেই তখন আধমরা হয়ে গেছে। কেটে ছিঁড়ে রক্তও বেরুচ্ছে গা দিয়ে।

এবার বুঝি দয়া হল লোকটির। মার থামিয়ে বলল, "ঠিক বলছিস তো?"

আজাহার বলল, "খোদা কসম।"

"আর কখনও এইসব করতে বেরোবি না?"

"না।"

"তিন সত্যি কর।"

"করলাম।"

লোকটি বলল, "দেখলি তো আমার নামের মহিমা? আমি আগেই বলেছি যে, আমার সঙ্গে বাঁকা ব্যবহার করলেই আমি বেঁকিয়ে দেব। আমার নাম বাঁকা বাগদি। যাক। এবার কান ধরে দশবার ওঠবোস কর।"

আজাহার, মথুরা তাই করল।

"নাকখত দে।"

আজাহার, মথুরা তাই দিল।

লোকটি এবার ওদের ছেড়ে দিয়ে বলল, "যা ব্যাটারা। খুব বেঁচে গেলি এ-যাত্রা। আজকের মতো গাঁয়ে গিয়ে জিরিয়ে নে। কাল সকালেই পালাবি এখান থেকে। আর কখনও যদি এর ত্রিসীমানায় দেখি তো একেবারে শেষ করে ফেলব।" এই বলে আবার নিজের মনে গান গাইতে গাইতে প্রস্থান করল লোকটি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হয়েছে তখন।

আজাহার, মথুরা অতিকষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে গ্রামে গিয়ে ঢুকল। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের কাছে গিয়ে ধপাস করে উপুড় হয়ে পড়ল দু'জনে।

মাতব্বর ব্যক্তিরা তখন মজলিস করছিল চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে। ওদের ওইভাবে পড়তে দেখেই উঠে এল সব। গ্রামসুদ্ধু লোক হইহই করে ছুটে এল।

সবাই জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কী?"

গ্রামের প্রধান ভোলা চক্রবর্তী বললেন, "কে মশাই আপনারা?"

মথুরা অতিকষ্টে বলল, "একটু জল।"

সঙ্গে সঙ্গে জল এল।

আজাহার, মথুরার চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল সকলে।

একজন বলল, "আপনারা কি পালোয়ানপুরের বীর বিখ্যাত আজাহার, মথুরা? আপনাদের গলায় সোনার চেনে রুপোর মেডেল রয়েছে দেখছি?"

আজাহার, মথুরা বলল, "হ্যাঁ ভাই। আমরা তারাই।"

"তা এমন দশা কে করল আপনাদের?"

আজাহার, মথুরা তখন সব কথা খুলে বলল ওদের।

সব শুনে গ্রামের লোকদের তো বিস্ময়ের অবধি রইল না। এমন যমের মতো চেহারার দু'-দু'জন লোককে একা কোনও লোক এইভাবে যে মারতে পারে, তা তাদের ধারণারও বাইরে।

গ্রামবাসীরা বলল, "না মশাই, সেরকম শক্তিমান লোক এ অঞ্চলে নেই। তা ছাড়া এ কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নাকি? আপনাদের শক্তির কাছে দেশ-দেশান্তরের লোক নতি স্বীকার করছে। আর আমাদের গ্রামের একজন লোক আপনাদের দু'জনকে একা এইভাবে মারবে এ কী করে বিশ্বাস করি বলুন?"

আজাহার বলল, "তা হলে কি বলতে চান আমরা মিথ্যে কথা বলছি? আমাদের দু'জনের এই অবস্থা যা আপনারা চোখে দেখছেন এও কি মিথ্যে?"

"তা হলে আপনাদের শুনতে ভুল হয়েছে। সে নিশ্চয়ই অন্য কোনও গ্রামের লোক।"

মথুরা বলল, "আরে না না। শুনতে আমাদের একটুও ভুল হয়নি। সে নিজের মুখে বলেছে এই গাঁয়ে থাকে সে।"

ভোলা চক্রবর্তী বললেন, "অসম্ভব! এরকম একজন লোক আমাদের গ্রামে থাকবে অথচ আমরা তাকে চিনব না, এ কি একটা কথার মতো কথা?"

আজাহার বলল, "সে বলেছে এই গাঁয়ের বাগদিপাড়ায় সে থাকে।"

"বেশ তো, শুধু বাগদিপাড়া কেন, এই গ্রামে যত লোক আছে, ছেলে থেকে বুড়ো থেকে সবাইকে এনে হাজির করছি এখানে। কই দেখিয়ে দিন তো সেই লোকটিকে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাঁয়ের ষোলো আনা লোক সবাইকে লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হল।

আজাহার এক এক করে দেখল প্রত্যেককে। কিন্তু কোথায় সেই লোক! সেই আসল লোকটিকেই খুঁজে পাওয়া গেল না।

গ্রামবাসীরা বলল, "দেখলেন তো? বললুম ওরকম লোক নেই কেউ আমাদের গ্রামে। সে নিশ্চয়ই কোনও ভিন গাঁয়ের লোক। কেননা আমরা এই ক'জন ছাড়া আর একটিও বাড়তি লোক নেই এই গাঁয়ে।"

আজাহার বলল, "আশ্চর্য তো! আপনাদের ভেতর সত্যিই তো দেখলুম না সেই লোকটিকে।"

"আরে মশাই থাকলে তো দেখবেন? ওরকম শক্তিমান লোক এ তল্লাটে নেই।"

"কিন্তু সে যে খালি গায়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। নিজে মুখে বলল এই গাঁয়েই সে থাকে।"

"বাজে কথা বলেছে। ওরকম লোক এ গাঁয়ে থাকেই না! ছোটখাটো মস্তান অবশ্য একজন আমাদের গাঁয়েও আছে। সে হল পশ্চিমপাড়ার গোপলা। ওই দেখুন সে বসে আছে ওখানে।"

আজাহার, মথুরা অবাক হয়ে বলল, "তাই তো! বড় আশ্চর্যের কথা।"

ভোলা চক্রবর্তী বললেন, "আচ্ছা, সে কোনও নামটাম বলেছে আপনাদের?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। নাম বলেছে।"

"কী নাম?"

"বাঁকা বাগদি।"

নামটা শোনামাত্রই সকলে যেন আঁতকে উঠল কীরকম! সবাই সবাইয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

ভোলা চক্রবর্তী বললেন, "বাঁকা বাগদি! নামটা ঠিক শুনেছেন তো মশাই?"

"শুনেছি মানে? ও নাম আমরা জীবনে ভুলব?"

"এ—এ—এ কী করে সম্ভব!"

"কেন, বাঁকা বাগদিকে আপনারা চেনেন না?"

"চিনি না মানে? বিলক্ষণ চিনি। সে তো এই গ্রামেরই লোক। গত বছর ঠিক আজকের দিনে, যে বটগাছটার তলায় আপনারা বসে ছিলেন সেই বটগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল সে।"

এই পর্যন্ত শোনামাত্রই আজাহার, মথুরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরলে আর এক মুহূর্তও সে গ্রামে থাকতে রাজি হয়নি তারা।

ময়রা সিংহের ভূতের গল্প

গল্পটা শুনেছিলুম ময়রা সিংহের মুখ থেকে।

ময়রা সিংহ আমাদের গ্রামের লোক। তার আসল নাম নির্মল সিংহ। ময়রার কাজ করত বলে লোকে তাকে ময়রা সিংহ বলত। গ্রামের মধ্যে ছোটখাটো একটা মিষ্টির দোকানও ছিল তার। ময়রা সিংহ মরে যাওয়ার পর সে দোকান উঠে গেছে। তবে তার মুখে শোনা গল্পটা আজও মনে আছে আমার।

আমাদের গ্রাম থেকে বেরোবার মুখে কুলির (রাস্তা) ধারে একটা বেলগাছে নাকি এক ভূত থাকত। ভূতটা কারও কোনও অনিষ্ট করত না। কাউকে ভয় দেখাত না। শুধু সন্ধের পর গাছের ডালে বসে পা দোলাত আর সেই গাছতলা দিয়ে কেউ গেলেই তার মাথায় একটি লাথি মেরে দিত।

দিনের পর দিন এইরকম ভুতুড়ে ব্যাপার নিয়মিত ঘটত বলে ভয়ে সন্ধের পর কেউ আর সে পথে পা বাড়াত না। কেননা বেলগাছটা ছিল কুলির ধারেই এবং বেলগাছের যে ডালে ভূতটা থাকত সেই ডালটা ছিল কুলির ওপর ঝুঁকে। তাই কুলি ছেড়ে অন্য পথেই লোকজন যাতায়াত করত।

ভূতটাকে তাড়াবার জন্য গাঁয়ের লোকেরা অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। ওঝা গুনিন ডেকে নানারকম ক্রিয়াকলাপ করেও তাড়ানো যায়নি ভূতটাকে। অনিষ্ট হওয়ার ভয়ে গাছটাকে কেটে ফেলতেও সাহস করেনি কেউ। এইরকম যখন অবস্থা তখন একদিন আগুরিদের একটা লোক ঠিক করল যেমন করেই হোক ভূতটাকে ফাঁদে ফেলে সে জব্দ করবে। লোকটার নাম মৃত্যুঞ্জয়। ডাকনাম মৃত্যুন। সে ছিল যেমন বলবান তেমনই সাহসী। কথায় বলে সাতটা এঁড়ে গোরুর যা শক্তি, একজন আগুরির গায়ে সেইরকম শক্তি। তাই মৃত্যুনের কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল না কেউ। দু-একজন জিজ্ঞেস করল, "কী করে কী করবে শুনি?"

মৃত্যুন বলল, "শুনেছি গোরুর দড়িতে ভূত নাকি বাঁধা পড়ে। সেই গোরুর দড়ি দিয়েই ভূতটাকে আমি বাঁধব।" এই বলে ভূতটাকে কায়দায় ফেলবার জন্য মৃত্যুন আরও দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে তোড়জোড় শুরু করে দিল।

তারপর একদিন রাত্রিবেলা শুরু হল তাদের ভূত ধরার অভিযান। ময়রা সিংহের দোকানটা হল ঘাঁটি। দোকানে খাওয়াদাওয়ার জন্য লুচি মণ্ডা ইত্যাদি তৈরি হতে লাগল। মৃত্যুন বলল, "এইবার শুরু হোক আমাদের কাজ। কিন্তু এ কাজের জন্য চাই একটা শক্ত দড়ি আর দুটো তেজি বলদ।"

একজন বলল, "দড়ি তো জোগাড় হয়েছে, কিন্তু বলদ কোথায় পাব?"

"কারও কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসো।"

"কিন্তু ভূতের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য বলদ দিতে কি রাজি হবে কেউ?"

মৃত্যুন কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "কেউ না দেয়, কোথাও থেকে চুরি করেও আনতে হবে।"

তাই হল। চুরি করেই আনা হল। পুবপাড়া থেকে লুকিয়ে একজনের বলবান দুটো বলদ নিয়ে আসা হল।

তারপর শুরু হল আসল কাজ।

একটা দড়ির মাঝখানে ফাঁস তৈরি করে দড়ির দু'দিকের খুঁট দিয়ে বলদ দুটোকে বেঁধে ফাঁসটা মাথার ওপর ধরে মৃত্যুন একা চলল কুলি ধরে সেই গাছতলার দিকে।

ভূতটা তখন নিজের মনে গাছের ডালে বসে পা দোলাচ্ছিল।

এমন সময় মৃত্যুন এসে পড়ল সেই গাছতলায়।

যেই না এসে পড়া অমনই মাথার পোকা নড়ে উঠল ভূতটার। সে করল কি, তার স্বভাবমতো মৃত্যুনের মাথার ওপর মেরে দিল এক লাথি।

মৃত্যুন তো এইরকমই চেয়েছিল। ভূতটা তার মাথায় লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁসটা টেনে দিল সে। তারপর আর কোনওদিকে না তাকিয়ে চোঁচা দৌড় দিয়ে উঠল এসে ময়রা সিংহের দোকানে।

সেখানে মৃত্যুনের জন্য যারা অপেক্ষা করছিল, মৃত্যুন তাদের নিজের কীর্তির কথা বলল। বলে সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে খেতে লাগল লুচি, মণ্ডা ইত্যাদি।

ওদিকে ভূতটাও তখন গোরুর দড়িতে বাঁধা পড়ে বেশ রীতিমতো জব্দ হয়ে গেছে।

গোরুতে ভূত চেনে। ওরা নাকি অশরীরী হলেও ভূতকে দেখতে পায়। তাই তাদের দড়িতে একটা আস্ত ভূতকে বাঁধা পড়তে দেখে বলদ দুটো তো ভয়ানক হাঁকডাক করে ছুটোছুটি করতে লাগল। একই দড়ির দু'দিকের খুঁটে বলদ দুটো বাঁধা। মাঝের ফাঁদে আটকে রইল ভূত। বলদ দুটো ভয় পেয়ে যত ছোটে, তাদের টানাটানিতে ভূতের বাঁধনটা তত বেশি শক্ত হয়।

এইভাবে প্রায় সারারাত ধরেই হাঁকডাক ও ছুটোছুটি চলতে থাকে। সারা গ্রাম তোলপাড় হয়।

মৃত্যুন ও তার লোকজনেরা ময়রা সিংহের দোকানে বসে সব শোনে।

বলদ দুটো কখনও এ পাড়ায়, কখনও ও পাড়ায় ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তাদের ডাক কখনও খুব কাছ থেকে শোনা যায়, কখনও বা শোনা যায় দূর থেকে। ক্রমে একসময় আর শোনাই যায় না তাদের ডাক।

রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে।

মৃত্যুন তার লোকেদের বলল, "এবার তো একবার দেখতে হয়। কেননা ভূতটা কী অবস্থায় আছে দেখে যাদের বলদ তাদের ফেরত দিয়ে আসত হবে তো! নাহলে কাল সকালে জানাজানি হয়ে গেলে পাড়ায় পাড়ায় দাঙ্গা বেঁধে যাবে।"

একজন বলল, "এই অন্ধকারে কোথায় খুঁজব?"

"একটা আলো নিয়ে চলো না দেখি সবাই মিলে।"

মৃত্যুনের কথামতো একটা লণ্ঠন নিয়ে সবাই চলল বলদ খুঁজতে। এদিক-সেদিক করে নানাদিক খুঁজে একসময় তারা গ্রামের প্রান্তে গিয়ে হাজির হল।

গ্রামের প্রান্তে চাঁদের পুকুর নামে একটা পুকুর আছে।

ওরা দেখল সেই পুকুরের পাড়ে একই ভাবে বাঁধা অবস্থায় বলদ দুটো শুয়ে শুয়ে

হাঁপাচ্ছে আর তাদের দড়ির ঠিক মাঝখানের ফাঁসে বাঁধা রয়েছে একটা আধপোড়া কাঠ। এই কাঠটার মধ্যেই যে ভূতটা ভর করে ছিল তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও। তাই সকলে মিলে তক্ষুনি ভাল করে পুড়িয়ে ফেলল কাঠটাকে। তারপর কাঠপোড়ার সমস্ত ছাই চাঁদের পুকুরের জলে বিসর্জন দিয়ে বলদ দুটোকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে এল।

ভূতের উৎপাতও বন্ধ হয়ে গেল সেদিন থেকে। গাঁয়ের লোকেরা আবার নিশ্চিন্ত হয়ে সেই পথে চলাফেরা করতে লাগল।



বিজলের ডাঙা

হুগলি জেলার রূপরাজপুরের ঁপ্রবোধকৃষ্ণ পাল মহাশয় গল্পটি আমাকে বলেছিলেন। তবে এও বলেছিলেন যে, এই গল্পের সময়সীমা সঠিক করে বলা শক্ত। কেননা বহুদিনের পুরনো ঘটনা এটি। হুগলি বর্ধমান বর্ডারে বর্ধমান জেলার মধ্যে বিজলে নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ একদিন ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ঝগড়া করে গ্রামের প্রান্তে ধু-ধু মাঠের ধারে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। সংসারে নানা অভাব অভিযোগ। সেই নিয়েই ঝগড়াঝাঁটি। ব্রাহ্মণীর বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে ব্রাহ্মণ তাই আত্মহত্যা করবেন স্থির করে গাছে উঠে সঙ্গে আনা গামছা দিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করলেন। তারপর টেনেটুনে দেখে যখন বুঝলেন ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই, তখন শেষবারের মতো একবার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে গলায় ফাঁস দিতে গেলেন। যেই না ওই কাজ করতে যাবেন, অমনই হল কি, একটা কালো হাত হঠাৎ কোথা থেকে এসে গামছাটাকে টেনে ধরল।

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় অন্ধকারে ব্রাহ্মণ দেখতে পেলেন একটা ছায়াশরীর গাছের মোটা ডালে হেলান দিয়ে বসে ফিকফিক করে হাসছে। সেদিকে তাকাতেই ভয়ে বুক কেঁপে উঠল ব্রাহ্মণের।

ছায়াশরীর বলল, "কী ব্যাপার ঠাকুর! আপনি হঠাৎ আত্মহত্যা করতে এসেছেন যে? আপনি ব্রাহ্মণ। পুরজনের হিতকামনা করবেন, মানুষকে সৎ উপদেশ দেবেন, তার জায়গায় আপনি এসেছেন আত্মহত্যা করতে? এ কাজ কি আপনার সাজে? ছিঃ ঠাকুর! আপনি কি জানেন না আত্মহত্যা মহাপাপ!"

ব্রাহ্মণ বললেন, "সবই জানি ভাই, সবই বুঝি। কিন্তু সব বুঝেও বড় জ্বালায় জ্বলে এই কাজ করতে এসেছি।"

"কিন্তু আমি তো আপনাকে এ কাজ করতে দেব না ঠাকুর। ওই কাজ করে আমি এই অবস্থায় যে কত বছর আছি, তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। এর থেকে উদ্ধার নেই। আপনার ছেলে নেই, মেয়ে নেই, শুধু কর্তা আর গিন্নিতে থাকেন। আপনি এ কাজ করতে যাবেন কোন দুঃখে?"

ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু তুমি আমার এত খবর রাখলে কী করে ভাই?"

"তার আগে আপনি আমার কথার উত্তর দিন। বলুন, কেন এ কাজ করতে এসেছেন?"

"দুঃখের কথা কী আর বলব ভাই, আমার গিন্নিকে তো তুমি চেনো না! অমন দজ্জাল মেয়েছেলে এই তল্লাটে দুটি নেই। তার জ্বলনে বাড়িতে কাক চিলও বসতে পারে না। তাই এমনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি যে, ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাব বলেই এ কাজ করতে এসেছি আমি।"

ছায়ামূর্তি এক লাফে গাছের ডালের ওপর খাড়া হয়ে বলল, "ওরে বাব্বা! আপনার

গিন্নির কথা আর বলবেন না ঠাকুর। ওরকম মেয়েমানুষ আমি কখনও দেখিনি। ওকে আমিও চিনি হাড়ে হাড়ে। আপনাদের বাড়ির পাশেই যে আমগাছটা আছে, সেই গাছে আমার একশো বছরের বাস। শুধু আপনার গিন্নির চিৎকার চেঁচামেচি আর গালাগালির চোটে আজ বছরখানেক হল আমিই পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি এখানে। কাজেই যার গালাগালিতে ভূত পালায়, আপনি মানুষ হয়ে তাকে নিয়ে ঘর কী করে করবেন? তা ঠিক আছে, আপনাকে আত্মহত্যা করতে হবে না। আপনি এইখানেই থাকুন। আমি আপনার থাকার ব্যবস্থা করছি।"

ব্রাহ্মণ তখন গাছ থেকে নেমে এসে মাটিতে বসলেন। ভূতও নেমে এল। সে এক আশ্চর্য রকমের পরিবেশ। একদিকে ঘন জঙ্গল এবং অপরদিকে ধু-ধু মাঠ।

ব্রাহ্মণ বললেন, "সবই তো বুঝলুম। কিন্তু তুমি যে আমাকে থাকতে বলছ, এই জঙ্গলে আমি থাকব কোথায়? আর যদিও থাকি, খাবটা কী?"

"সে চিন্তা আপনার নয় ঠাকুর। সে চিন্তা আমার। আমি এই গাছতলায় আপনাকে একটি ঝোপড়ি বানিয়ে দেব। আপনি দিব্যি বহাল তবিয়তে সেখানে থাকবেন। আর এই যে দেখছেন ধু-ধু মাঠ, এটা হচ্ছে অনাবাদী পতিত জমি। এই জমির দখল নিয়ে আপনি চাষবাস করুন। এতে যা ফসল ফলবে, তা সবই আপনি ভোগ করে সুখে দিন কাটাতে পারবেন।"

"কিন্তু।"

"এর মধ্যে কোনও কিন্তু নেই। আপনার ব্যবস্থা আমি করছি। আপনি একটু বসুন! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বন্ধুবান্ধবেরা এসে পড়বে। আমি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই সবকিছু করব আপনার।"

ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন এবং সামনে বসা বন্ধু ভূতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে নানারকম আলোচনা কবতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে অন্যান্য ভূতেরা দলে-দলে সেখানে এসে হাজির হয়ে ব্রাহ্মণের সব কথা শুনল। তারপর প্রত্যেকেই একমত হয়ে ব্রাহ্মণের পুনর্বাসনের ব্যাপারটা মেনে নিল। সকলে মিলে অনেক যুক্তিতর্কের পর বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ, তালগাছ থেকে পাতা ইত্যাদি এনে সে রাতের মতো ব্রাহ্মণের থাকার একটা আস্তানা করে দিল।

ব্রাহ্মণ মনের আনন্দে সেই আস্তানায় আশ্রয় নিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করলেন। রাত শেষ হতেই বিদায় নিল ভূতেরা। যাওয়ার আগে বনের ভেতর থেকে নানাবিধ ফলমূল ব্রাহ্মণের জন্য রেখে গেল তারা। ব্রাহ্মণ তো বেজায় খুশি। এইভাবেই যদি জীবনের ক'টা দিন কেটে যায় তো মন্দ কী?

বিজলের ডাঙা ভূতের উপদ্রবের জন্য সেকালে কুখ্যাত ছিল খুব। এর আশেপাশের গ্রামের লোকেরা যেমন—পাঁচশিমুল, আসতাই, ন'পাড়া, দোগেছে, আবুঝহাটি, গুড়বাড়ি, দশতনপুর, ইটলা, সাপুড়, জরুল প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ভুলেও কেউ ওদিকে যেত না। কাজেই সবাই যখন শুনল ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ঝগড়া করে ব্রাহ্মণ বিজলের ডাঙার দিকে চলে গেছে, তখন ধরেই নিল সবাই যে, ভূতেরা আস্ত গিলে খেয়েছে ব্রাহ্মণকে। বিশেষ করে কয়েকজন দুঃসাহসী লোক যখন ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে-করতে এই পথে এসে দূর থেকে অশ্বত্থ গাছের ডালে গামছার ফাঁস ঝুলতে দেখল, তখন

ধারণাটাকে একেবারেই সঠিক বলে মেনে নিল। অতএব ব্রাহ্মণ বেঁচে থেকেও সকলের কাছে মৃত প্রতিপন্ন হলেন। কিন্তু তা হলে কী হয়, ব্রাহ্মণীর কবলমুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ দারুণ সুখী। ভূতেরা তাঁর কোনও অভাবই রাখল না।

সারাদিন ব্রাহ্মণ একলা থাকেন। রাত্রিবেলা বন্ধু ভূতেরা সহায় হয়। তাদের দয়ায় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মালিক হয়ে গেলেন তিনি। একদিন ভূতেরা বলল, "আপনি এক কাজ করুন। এই জমি তো অনাবাদী পড়ে আছে। আপনি একে আবাদ করে ফসল ফলান।"

ব্রাহ্মণ বললেন, "বললি তো বেশ! আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ জমি চষব কী করে? আমি কি চাষের কাজ কিছু জানি?"

ভূতেরা বলল, "হুঁ। এ বড় সমস্যার কথা বটে! তা ঠাকুর, আপনি এক কাজ করুন, রাত্রিবেলা গ্রামের লোক ঘুমিয়ে পড়লে গ্রামবাসীদের ঘর থেকে লুকিয়ে গোটাকতক কোদাল জোগাড় করে নিয়ে আসুন দেখি, বাকি কাজটা আমরাই করে দেব।"

ব্রাহ্মণ তাই করলেন। ভূতের পরামর্শ মতো গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে এর-ওর বাড়ি থেকে কোদাল-কুড়ুল ইত্যাদি যা পেলেন, নিয়ে এলেন।

তাই নিয়ে সারারাত ধরে চলল ভূতের উপদ্রব। সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে রাতারাতি মাটি কুপিয়ে ভূতেরা চাষের উপযোগী করে ফেলল। তারপর বলল, "যান, যাদের জিনিস তাদের ফেরত দিয়ে আসুন।"

ব্রাহ্মণ তাই করলেন।

আর একদিন ভূতেরা বলল, "ঠাকুর, কয়েকটা বালতি চাই যে! জমিতে জল দিতে হবে।"

ব্রাহ্মণ তখনই গ্রামে গিয়ে বালতি নিয়ে এলেন।

এইভাবেই শুরু হল চাষ-আবাদ। দেখতে-দেখতে সবুজ শস্যে খেত ভরে উঠল। মাঠের ধান মাঠে পাকল। ভূত মজুরেই সবকিছু করে। ব্রাহ্মণের গোলাভরা ধান হল। এত ধান যে, আশপাশের গ্রামের লোকের খামারে অত ধান নেই।

সেটা ছিল খরার বছর। চারদিকে অন্নের জন্য হাহাকার পড়ে গেল। কত মানুষ না খেতে পেয়ে মরল। অথচ ব্রাহ্মণের গোলাভর্তি ধান। তাই একদিন ব্রাহ্মণ আর থাকতে না পেরে সন্ধের সময় চুপিচুপি গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন। ভাবলেন, ব্রাহ্মণীকে সব কথা বলে ক্ষমা-ঘেন্না করে নিয়ে আসবেন এখানে। কিন্তু হিতে বিপরীত হল।

ব্রাহ্মণকে রাতের অন্ধকারে দেখামাত্রই ভয়ে চিৎকার করে এমন কাণ্ড বাধালেন ব্রাহ্মণী যে, গ্রামসুদ্ধু লোক হইহই করে লাঠি-সোটা নিয়ে ছুটে এল। তারপর ব্রাহ্মণকে দেখেই তো চক্ষুস্থির। সবাই তাঁকে ভূত মনে করে নির্দয় ভাবে লাঠিপেটা করতে লাগল। কয়েক ঘা লাঠির বাড়ি খেতেই রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়লেন ব্রাহ্মণ। তারপর যখন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেলেন, তখনই গ্রামের লোকেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু তখন সব শেষ। একমাত্র সৎকার ছাড়া করবার আর কিছুই ছিল না তখন।

অপঘাতে মৃত্যু। তাই তৃতীয় দিনে খুব ঘটা করেই শ্রাদ্ধ হল ব্রাহ্মণের। গ্রামের লোকেরা চাঁদা তুলেই ব্রহ্মহত্যার পাপ ঢাকতে সব ব্যবস্থা করল। অনেক লোকজনও খেল। কিন্তু বন্ধু ভূতেরা ব্রাহ্মণের যে শ্রাদ্ধবাসরের আয়োজন বসিয়েছিল সেদিন, তার যেন তুলনাই নেই। গ্রামের লোকেরা বিজলের ডাঙার দিকে না গেলেও দূর থেকেই দেখতে পেল হাঁড়ি ভর্তি মণ্ডা-মিঠাই ক্রমাগত আকাশপথে নেমে আসছে বিজলের

ডাঙায়। সারারাত ধরে শুধু নামছে তো নামছেই। সে নামারও আর শেষ নেই। যতক্ষণ না ভোর হল, ততক্ষণ এক নাগাড়ে ওইভাবে নামতেই লাগল সব, তারপর থেকে প্রতি বছরই ওই বিশেষ দিনটিতে গ্রামের লোকেরা দেখতে পেত ওই একইভাবে আকাশ থেকে খাবার নেমে আসছে বিজলের ডাঙায়। তবে এখন আর আসে না। আর সেইসব বন্ধু ভূতেরাই বা এখন কে কোথায়, তাই বা কে জানে!



সতে মুচি

সতে মুচি জাতে মুচি হলেও জুতো সেলাই সে করে না। পেশা তার ঢোল বাজানো। সেজন্য কেউ কেউ বলে সতে বায়েন। সতে কিন্তু তার নামের শেষে বায়েন বলে না, বলে মুচি, সত্যেশ্বর মুচি। এই সত্যেশ্বর মুচি বা সতে মুচিকে নিয়ে আমাদের গ্রামে ভারী মজার একটি গল্প প্রচলিত আছে।

আমাদের গ্রামের অনতিদূরে রায়না নামে এক বিখ্যাত গ্রাম আছে। একদিন সতে এবং ওর দূরসম্পর্কের এক জ্যাঠামশাই ভূষণ কী এক জরুরি কাজে খুব ভোরে রায়না যাওয়া ঠিক করল। আগের দিন রাত্রে সব ঠিকঠাক করে পরদিন ভোরবেলায় ভূষণ এসে সতেকে ডাকল, "সতে!"

তখন নিশিভোর। আকাশ তখনও অন্ধকার। একটিও কাকপক্ষী ডাকেনি। তেমন সময় ভূষণ ডাকল, "সতে! এই সতে!"

কিন্তু কোথায় সতে! সাড়া নেই শব্দ নেই। অবশেষে অনেক ডাকাডাকির পর সতের বউ দরজা খুলল।

ভূষণ বলল, "কী ব্যাপার? সতেকে ডেকে দাও। সকাল করে না গেলে কোনও কাজই যে হবে না।"

সতের বউ তো আকাশ থেকে পড়ল।

"ওমা! এই তো খানিক আগে আপনি এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন? আবার এখন এসে ডাকাডাকি করছেন, বলি ব্যাপারটা কী?"

ভূষণের তো চক্ষু তখন চড়কগাছ।

"আমি এসে ডেকে নিয়ে গেলাম! আমি তো এই আসছি।"

"না। আপনিই তো ডাকলেন তাকে। সেও অমনই আপনার ডাক শুনে বেরিয়ে গেল।"

ভূষণ তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, "কী সর্বনাশ!"

"তা হলে কী হবে? একেবারে আপনার মতো গলায় কে তাকে ডাকল তবে?"

ভূষণ বলল, "ঠিক বলছ, আমার মতো গলা? না কি অন্য কেউ ডেকেছে?"

"না গো জ্যাঠা, না। অবিকল আপনার মতো গলায় তাকে ডাকল। আমার মন বলছে নিশ্চয়ই কোনও অমঙ্গল হয়েছে তার। আপনি এক্ষুনি খোঁজখবর নিন। আমি মেয়েমানুষ, আমি কোথায় কী করব?"

ভূষণ বলল, "বড় আশ্চর্য ব্যাপার বটে! নিশিভোরে অবিকল আমার মতো গলা করে ডাকল। সেও অমনই বেরিয়ে গেল। এ তো দেখছি অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার। ঠিক আছে, তুমি কিচ্ছুটি ভেবো না। আমি এখনই ব্যবস্থা করছি।"

সঙ্গে সঙ্গে লোকজন জড়ো করে ফেলল ভূষণ।

দেখতে দেখতে সকালও হয়ে গেল। তারপর শুরু হল খোঁজাখুঁজির পালা। গাঁয়ের সর্বত্র

তন্নতন্ন করে খোঁজা হল সতেকে। দু'জন রায়না গেল। দু'জন খণ্ডঘোষে তার শ্বশুরবাড়িতে গেল। দু'জন গেল জাহানাবাদ। কিন্তু কোথায় সতে? শুধু শুধু খোঁজাখুঁজিই সার হল।

সতের বউ তখন কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

ভূষণ বলল, "কী বিপদ! খুঁজে পাওয়া গেল না বলে হাল ছেড়ে দিলে কী করে হবে? আবার খোঁজো। যেখান থেকে পারো খুঁজে বের করো তাকে।"

আবার শুরু হল খোঁজাখুঁজির পালা। বনজঙ্গল তোলপাড় করা হল। কিন্তু তবুও কোনওখানে সতের এতটুকু চিহ্নও পাওয়া গেল না।

ভূষণ বলল, "পুকুরে জাল ফেলে দেখো। যদি কেউ কোনও অপকর্ম করে ডুবিয়ে রেখে থাকে তাকে!"

জাল নামল পুকুরে। সতে সেখানেও নেই। কাজেই বাধ্য হয়েই হাল ছেড়ে দিতে হল। নিশিভোরে একজন জলজ্যান্ত মানুষ বেমালুম উবে গেল গ্রামের বুক থেকে, এই সংবাদটাই শুধু বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র।

দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন, দু'দিন, তিনদিন। চারদিনের দিন ভূষণ ওর মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিল। তখন চৈত্রের শেষ। দুপুরবেলা। খাঁ-খাঁ করছে রোদ্দুর। একটা ছাতি মাথায় খালি পায়ে সতের কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল ভূষণ। গাঁয়ের প্রান্তে বাবুরমায়ের খালের ওপারে মালগোড়ে বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে বিরাট এক বটগাছের নীচে গিয়ে ভূষণ বসল। এই পথে কতদিন সতেকে সঙ্গে নিয়ে ভূষণ তার মেয়ের বাড়ি গেছে। এই গাছতলায় কতবার বিশ্রাম করতে বসে দু'জনে কত গল্প করেছে। সেইসব কথা ভাবতে লাগল ভূষণ। ভাবতে ভাবতে সতের জন্য মনটা তার আরও বেশি খারাপ হয়ে গেল। কী যে হল মানুষটার! বেমালুম উবে গেল। গাঁয়ের লোকে কত কথাই না বলছে এসব ব্যাপার নিয়ে। কেউ বলছে, ওকে ঠিক নিশিতে ডেকেছে। কেউ বলছে, বাঘে খেয়েছে। কেউ বলছে, দেশত্যাগ করেছে। যার যা ইচ্ছে সে তাই বলছে। দুষ্ট লোকেরা বলছে, ওসব ভূষণেরই কারসাজি। সে-ই নিশ্চয়ই কোনও কিছুর লোভে সরিয়েছে সতেকে। শেষের কথাটা শুনলে কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুকের ভেতরটা। কিন্তু মানুষের মুখে তো হাতচাপা দেওয়া যাবে না। কাজেই যে যা বলে তা চোখ কান বুজে শুনে যেতে হয়।

ভূষণ যখন গাছতলায় বসে বসে এইসব ভাবছে সেই সময় হঠাৎ ওর পায়ের ওপর জলের মতো এক ফোঁটা কী যেন পড়ল টস করে। ভূষণ ভাবল এ নিশ্চয়ই কাকপক্ষীদের কাজ। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে আবার যখন আর এক ফোঁটা পড়ল তখন আর সন্দেহভঞ্জন না করে পারল না। ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য ওপরদিকে তাকাতেই মাথাটা গেল ঘুরে। যা সে দেখতে পেল তা স্বচক্ষে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না। ভূষণ দেখতে পেল সেই বটগাছের অতি উচ্চে তিনটি মোটা মোটা ডালের ফাঁকে চুপচাপ শুয়ে আছে সতে। আর তারই কাতর দুটি চোখ বেয়ে টপটপ করে ঝরে পড়ছে সেই জলের ফোঁটা।

সতেকে দেখতে পেয়েই ভূষণ লাফিয়ে উঠল, "সতে! এই সতে!"

কিন্তু কে দেবে সাড়া? সাড়া নেই শব্দ নেই। সতে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে। ভূষণ আবার ডাকল, "সতে রে!"

সতে এবারও সাড়া দিল না।

ভূষণ ফের ডাকল, "এই! এই সতে! ওখানে শুয়ে আছিস কেন? আমি জ্যাঠামশাই। আমাকে চিনতে পারছিস না?"

সতে নিরুত্তর।

ভূষণ বুঝল গতিক সুবিধের নয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ভৌতিক ব্যাপার রয়েছে। নয়তো মাথাখারাপ হয়েছে সতের। কিন্তু ভৌতিক ব্যাপারই যদি হয় তা হলে তো একে এখানে একা ফেলে রেখে কাউকে ডাকতে যাওয়া ঠিক হবে না। ততক্ষণে মাল পাচার হয়ে যাবে। তারপর তন্নতন্ন করে খুঁজে মরে গেলেও আর কোথাও পাওয়া যাবে না তাকে। অথচ ওকে ওখান থেকে নামিয়ে আনাও তার একার কর্ম নয়।

যাই হোক, ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সেখান দিয়ে ভূষণেরই এক চেনা লোক যাচ্ছিল। ভূষণ তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে তাকে সব কথা খুলে বলে গাছতলায় নিয়ে এল তাকে। তারপর সতের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই। ওই দ্যাখো।"

ওপরদিকে তাকাতেই লোকটির তো চক্ষুস্থির, "আরে! সত্যিই তো। ওই তো আমাদের সতে মুচি।"

"ওকে ওখান থেকে এক্ষুনি নামিয়ে ফেলতে হবে।"

"তা তো হবে। কিন্তু ও এখানে এল কী করে?"

"সেইটেই তো আশ্চর্য!"

"আমার মনে হয়, এ নিশ্চয়ই সেই তেনাদের কাজ। যখন-তখন যাদের নাম করতে নেই। ঠিক আছে। তুমি এক কাজ করো। গাছের ওপর উঠে সতেকে একটু ছুঁয়ে থাকো। আমি ততক্ষণে লোকজন সব ডেকেডুকে আনছি। নাহলে ওকে ওখান থেকে টেনে নামানো তোমার-আমার কর্ম নয়।" এই বলে লোকটি দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলে গেল।

আর ভূষণও তৎক্ষণাৎ গাছে উঠে ছুঁয়ে ফেলল সতেকে।

তারপর লোকজন এলে সবাই মিলে ধরাধরি করে সতেকে নামানো হল। পালকিতে শুইয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল। রোজা এসে ঝাড়ফুঁক করতে অনেকটা সুস্থ হল বেচারা।

দিনকতক পরে যখন সে একেবারে সুস্থ হয়ে উঠল তখন একদিন সকলের কাছে সব কিছু সবিস্তারে খুলে বলল সে। সতে বলল, সেদিন ভোরবেলায় ভূষণের মতো গলা করে কে যেন তাকে ডাকল। আর সেও অমনই মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেরিয়ে এল সেই ডাক শুনে। কিন্তু বাইরে এসে কাউকেই সে দেখতে পেল না। তখন কেমন যেন সর্বশরীর ছমছমিয়ে উঠল তার। এমন সময় হঠাৎ সে বুঝতে পারল তার পায়ের তলা থেকে মাটি ক্রমশ যেন সরে সরে যাচ্ছে এবং অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে সে। তখন সে কতবার চেষ্টা করল চিৎকার করে কাউকে ডাকবার। কিন্তু তার গলা দিয়ে তখন এতটুকু শব্দ আর বের হল না। কেমন যেন বোবা হয়ে গেল সে। তারপর বাতাসে ভাসতে ভাসতে খালের ধারে ওই বটগাছের ডালে গিয়ে আটকে গেল। সেই থেকে তিন-চারটে দিন ওইখানেই ওই গাছের ডালেই একভাবে কেটে গেছে তার। ওই গাছের তলা দিয়ে কত লোকজনকে সে যেতে-আসতে দেখেছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও গলা দিয়ে এতটুকু শব্দ বের করেও কাউকে সে ডাকতে পারেনি। সারাটা দিন যে কীভাবে কাটত তার, তা একমাত্র সে-ই জানে। সন্ধের পর সে দেখতে পেত কিম্ভূতকিমাকার দুটো মুখ ভাঁটার মতো চোখ বের করে এগিয়ে আসত তার দিকে। আর সারারাত ধরে তারা লকলকে জিভ বের করে অবিরাম তাকে চাটত। চেটে চেটে তার শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে খেত তারা। তারপর ভোর হলেই আবার ওকে ফেলে রেখে চলে যেত। সারাদিনে আর আসত না। সেই সন্ধের পরে আবার আসত।

সতের মুখে এই অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেল সকলে।

লালুমিঞার মাঠ

লম্বায় ছ' ফুটেরও বেশি। চওড়াতেও তদুপযুক্ত। শক্তসমর্থ বলিষ্ঠ চেহারা। কপালের একপাশে বীভৎস রকমের একটা দাগ আছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চুলগুলি কপালের ওপর লুটিয়ে থাকে সবসময়। বুনো শুয়োরের মতো কুতকুতে চোখে যার দিকে তাকায় তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। ওর নাম লালুমিঞা।

হিংস্র জন্তুর চেয়েও মারাত্মক ওই মানুষটির ভয়ে অঞ্চলের লোকেরা সদাই তটস্থ। অনেকের ধারণা, ভিনগাঁয়ে লালুমিঞার ডাকাতের দল আছে। সচরাচর কারও ক্ষতি সে করে না। তবে রাগলে কিন্তু রক্ষে নেই। তাই লালুমিঞার শারীরিক শক্তির সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা ওকে ঘাঁটায় না।

একদিন দুপুরবেলা লালু তার ছোট ছেলেটিকে নিয়ে দাওয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, এমন সময় জমিদারের পাইক এসে হাজির।

পাইক বাবাজি লালুকে হাড়ে হাড়ে চেনে। একবার সদরঘাটে দামোদরের জাত-এ (মেলা) লালু এমন ধাতানি দিয়েছিল ওকে যে, সে-কথা আজও ভোলেনি সে। অথচ জমিদারের হুকুম লালুকে ধরে নিয়ে যেতেই হবে। তাই সে ভয়ে ভয়ে এসে ডাকল, "লালুমিঞা আছ নাকি? ও লালুভাই?"

পাইকের ডাকে ঘুম ভাঙল লালুর। সে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে পাইককে পত্নীর ভাই সম্বোধন করে মুখিয়ে উঠল, "কেন রে শা—?"

"বড়কর্তা তোমাকে একবার হুকুম করেছেন গো।"

"তাই নাকি? তোদের বড়কর্তাকে বোলগে যা লালুমিঞা কারও বাপের চাকর নয় যে, ডাকলেই যাবে।"

পাইক বলল, "আঃ চটছ কেন লালুভাই? এই তোমার এক দোষ। আমাকে হুকুম করেছেন, আমি হুকুমনামা নিয়ে এসেছি। একবার চলো না ভাই কাছারিতে।"

লালু ভেংচে বলল, "এই ভরদুপুরে লালুমিঞা যাবে জমিদারের কাছারিতে? আস্পর্ধা তো কম নয়! যা ভাগ এখান থেকে। নাহলে আস্ত একটা কাঁচা বাঁশ তোর পিঠে আমি ভাঙব।"

পাইক আর কী করে? ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনওরকমে পালিয়ে এল সেখান থেকে। তারপর ফিরে এসে বড়কর্তাকে বলল, "ওকে ধরে আনতে পারলাম না হুজুর।"

বড়কর্তা গম্ভীরভাবে বললেন, "এল না তা হলে?"

"না হুজুর। মিঞাসাহেব বলে ডাকতেই তেড়ে যেন মারতে এল। বাবাঃ। কী তম্বি তার। ওকে ধরে আনা আমার কম্ম নয়।"

"একটু বুঝিয়েসুঝিয়ে বলেছিলি?"

"হ্যাঁ কর্তা।"

বড়কর্তা আরও একটু গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

গাঁয়ে ষোলোআনার সকলেই মান্য করেন বড়কর্তাকে। একে রাশভারী লোক, তায় জমিদার। প্রজাদের ওপর খুব যে একটা অত্যাচার করেন তা নয়, তবে কোনওমতেই কারও ঔদ্ধত্য সহ্য করেন না। রেগে গেলেই তাঁর জমিদারি রক্ত টগবগিয়ে ফোটে। কড়া মেজাজে কাজ করে যান। লালুর বেয়াদবি অনেক সহ্য করেছেন তিনি। আর নয়!

এদিকে লালুরও জেদ, জমিদারই হোক বা রাজা-মহারাজাই হোক, একদম ওপরওয়ালা ছাড়া আর কাউকেই মানবে না সে। লালু বলে, "তোদের বড়কর্তা তোদের কাছেই থাক। ওকে আবার মানব কী রে? তোরা ব্যাটারা যেমন চাষা। তেল মাখানো তোদের স্বভাব, তেল মাখাগে যা। আমার কাছে বড়কর্তা দ্যাখাতে আসিস না, বুঝলি? যত্তসব।"

পাইকের মুখে সব শুনে তাই মনে মনে খেপে ব্যোম হয়ে উঠলেন বড়কর্তা। বর্ধমানের এই ছোট্ট গ্রামখানির জমিদার তিনি। প্রতিটি প্রজা তাঁকে মান্য করে। একমাত্র লালু ছাড়া। লালুমিঞা সামান্য একজন প্রজা। তার এই মাত্রাছাড়া ঔদ্ধত্যে কার না রাগ হবে? তাই নিষ্ফল আক্রোশে অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই তিনি বললেন, "ওর ব্যবস্থা আমি করছি।"

সন্ধের সময় বড়কর্তা কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মজলিসে বসেছিলেন। এই সময়টায় একটু জোর আড্ডা হয়। গ্রামের বিশিষ্ট কয়েকজন তোষামুদে লোক বসে বসে তাঁর চাটুকারি করে মন জোগায়। কোনওদিন গানবাজনাও হয়। আজকের মজলিসটা অবশ্য অন্য ধরনের হচ্ছিল। বিষয় লালুমিঞা।

লালুমিঞা কারও ক্ষতি না করলেও তার হাতে দু'-একটা চড়-চাপড় খায়নি এমন লোক এ গাঁয়ে খুব কমই আছে। কাজেই লালুর বেপরোয়া স্বভাবের জন্য অনেক দুষ্ট লোকেরই রাগ ছিল তার ওপর। কুচক্রী সুদখোর ও মহাজনরা তো প্রায়ই হেনস্থা ভোগ করত লালুর হাতে। সেইসব অভিযোগ শুনতে শুনতেও বড়কর্তার মন বিষিয়ে ছিল লালুর ওপর। যাই হোক, লালুমিঞাকে নিয়ে আলোচনা যখন তুঙ্গে তেমন সময় হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে লালুমিঞার আবির্ভাব হল সেখানে।

লালু এসে বুক ফুলিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল সকলের সামনে।

অন্যান্য প্রজারা এসে নমস্কার করে সসম্ভ্রমে ভয়ে ভয়ে কথা বলে। লালু কিন্তু ওসবের ধার ধারে না। বেশ রাগত গলায় বলল, "অমন দিনদুপুরে আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন কেন? জানেন না সে সময় মানুষ একটু বিশ্রাম করে?"

বড়কর্তা লালুর আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করে বললেন, "গলার স্বরটা একটু নামিয়ে আর মাথাটা অল্প হেঁট করে কথা বলো। মনে রেখো তুমি হলে আমার সামান্য একজন প্রজা, আর আমি হলাম এ গাঁয়ের জমিদার।"

লালু বলল, "তাতে কী হয়েছে? সেই গরমে আপনি যখন-তখন ডাকবেন আর আমাকে ভয়ে ভয়ে ছুটে আসতে হবে নাকি?"

"সবাই তো তাই আসে।"

"সবাই-এর কথা ছেড়ে দিন। আমার নাম লালুমিঞা। আমি রাজা-উজিরও মানি না, জমিদারেরও পরোয়া করি না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেটের ভাত জোটাই, ধামায় করে কেউ আমার ঘরে ক্ষুধার খাদ্য ধরে দিয়ে যায় না। অতএব—।"

"এত ঔদ্ধত্য তোমার?"

"এতে ঔদ্ধত্যের কী দেখলেন? থাক, ওইসব বাজে কথা রেখে এখন বলুন কেন ডেকেছেন?"

"তুমি বছরের পর বছর খাজনা দিচ্ছ না, তাই ডেকেছি।"

"খাজনা! কীসের খাজনা?"

"জমির খাজনা। আমার গ্রামে বাস করছ, জমি চষে ফসল ফলাচ্ছ, তার খাজনা।"

"খাজনা আমি দেব না, বুঝেছেন? লালুমিঞার কোনও খাজনা নেই। তার খাজনা খোদাতালার কাছে, জমিদারের কাছে নয়। দুনিয়ার মাটি খোদার দান। খোদার সম্পত্তি সবার সম্পত্তি। কাজেই খোদার সম্পত্তির কোনও জমিদারও নেই, খাজনাও নেই।"

বড়কর্তার সমস্ত মুখখানি রাগে লাল হয়ে উঠল। কুটিলতায় ভরে উঠল যেন। প্রচণ্ড ধমকের সুরে দাবড়ে উঠলেন, "লালুমিঞা!"

লালু হেসে বলল, "ওতে কোনও লাভ হবে না কর্তামশাই। যতই চ্যাঁচান, খাজনা আমি দিচ্ছি না।"

বড়কর্তা সিংহনাদ করে উঠলেন, "এই কে আছিস?"

সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে জনাকয়েক শক্তিমান লোক অতর্কিতে ঘিরে ফেলল লালুমিঞাকে।

"বেঁধে ফ্যাল ব্যাটাকে। চাবকে ওর পিঠের চামড়া আমি ছাড়িয়ে নেব। আমার চাবুকটা কোথায় গেল?" বলেই দেওয়ালের হুকে ঝোলানো শঙ্কর মাছের চাবুকটা পেড়ে আনলেন বড়কর্তা।

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য লালু একটুও প্রস্তুত ছিল না। তাকে লেঠেল দিয়ে আটক করিয়ে বেঁধে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে জানলে আসতই না সে। তবুও লালুমিঞা বোধ হয় আসুরিক শক্তির অধীশ্বর ছিল। তাই 'হাঃ হাঃ' করে একবার ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠেই সহসা তিন হাত লাফিয়ে দাপটের সঙ্গে দু'জনের পেটে প্রবল বেগে দু' পায়ে লাথি মেরে এবং দু' বাহুর প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেল উল্কার মতো।

ঘটনাটা যে কী ঘটল তা টের পেতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। লাথি খাওয়া লোক দুটি দু'হাতে পেট ধরে গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে। সকলে মিলে ধরাধরি করে তাদের শুশ্রূষার জন্য নিয়ে গেল।

চাবুকটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বড়কর্তা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর সাপের চোখের মতো ক্রুদ্ধ ও তীক্ষ্ণ চোখে লালুর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, "নায়েবমশাই?"

শয়তান নায়েব সশব্যস্ত হয়ে আদেশ প্রার্থনা করলেন, "বলুন হুজুর।"

"আমার সমস্ত লেঠেলদের গোপনে তৈরি হতে বলুন। লালুমিঞা খেপে গেছে। নিশ্চয়ই একটা ভয়ানক কাণ্ড কিছু করে বসবে সে। যেমন করেই হোক এর একটা বিহিত করতেই হবে।"

"কী বিহিত করবেন?"

বড়কর্তা নায়েবমশাইয়ের কানে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। শুনে নায়েব মশাইয়ের হিংস্র মুখ কুটিল আনন্দে ভরে উঠল।

গভীর রাত। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী। চারদিক আবিল অন্ধকারে ঢাকা।

বড়কর্তা লেঠেলদের নিয়ে সেই ঘন অন্ধকারেই পা টিপে টিপে এসে উপস্থিত হলেন লালুমিঞার বাসায়। লাঠি, সড়কি, ভোজালি, তীর, কাঁড়, সবরকম অস্ত্রই সঙ্গে ছিল ওদের।

গরমের দিন। লালু নিশ্চয়ই দাওয়াতেই শুয়ে থাকবে। কাজেই এক কোপে ওর মাথাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে একটুও সময় লাগবে না। কিন্তু কোথায় লালু? শূন্য দাওয়ায় একটা কুকুর শুয়ে ছিল। ওদের দেখেই পালাল।

নায়েবমশাই তবুও দাওয়ায় উঠে ঘরের ভেতর উঁকি মারতেই দেখলেন লালুমিঞা তার বউ ও ছেলেকে নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘরের ভেতর শুয়ে আছে। ঘরের কোণে টিমটিম করে একটি রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে। মাথার কাছে একটি দা রাখা আছে। সম্ভবত আকস্মিক কোনও বিপদের ভয়েই লালুর সাবধানতা।

নায়েবের ইশারায় বড়কর্তা উঠে এলেন দাওয়ায়। জানলার ফাঁক দিয়ে একবার ঘুমন্ত লালুকে দেখলেন। তারপর চাপা গলায় লেঠেলদের আদেশ দিলেন বাড়িটা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে। একজনকে তীর কাঁড় নিয়ে এগিয়ে আসতে বললেন। নিজে সরে এলেন জানলার ধার থেকে।

বড়কর্তার আদেশে তীর কাঁড় নিয়ে এগিয়ে এল একজন। এসে একবার বেশ ভাল করে দেখে নিল তার লক্ষ্যবস্তুকে। তারপর দরজায় শিকল তুলে দিয়েই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে তীরনিক্ষেপ করল লালুর বুকে।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল লালু। ওর বউ এবং ছেলেটিও ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। তাদের কাতর কান্নায় সাড়া দিতে এগিয়ে এল না কেউই।

এতেও ক্ষান্ত হল না জমিদারের লোকরা। বড়কর্তার নির্দেশেই ফিরে আসবার সময় শুধু একটি দেশলাই কাঠি ধরিয়ে দিয়ে এল লালুমিঞার ঘরের চালায়। রাতের অন্ধকারে লালু ও তার বউ-ছেলের একই সঙ্গে আসমান ও জমিন এক হয়ে গেল।

বড়কর্তার একমাত্র ছেলে বিমল কলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। ছেলে বড় হয়েছে। তাই তার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে জমিদারিতে বসাবেন মনে করে বড়কর্তা চিঠি পাঠালেন ছেলের কাছে। চিঠিতে এও লিখে দিলেন, "সামনের মাসে অমুক তারিখে বাবাজীবনের বিয়ের ঠিক হয়েছে। অতএব কোনওরকমেই যেন গ্রামে আসতে বিলম্ব না হয়।"

বিমল চিঠি পেয়ে খুবই আনন্দিত হল। পত্রপাঠ কলেজে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরল সে। তবে আসবার আগে নির্দিষ্ট দিনক্ষণের কথা কিছু না জানিয়ে আসায় বড়কর্তা ছেলের জন্য গাড়িঘোড়া পাঠাবার কোনও ব্যবস্থাই করেননি।

রাত খুব বেশি নয়। সেয়ারাবাজারে এসে মাঠে মাঠে মাইল তিনেক যেতে পারলেই গ্রামে পৌঁছনো যাবে। পথে চোর-ডাকাতের ভয় আছে। কেননা যে সময়কার কথা বলছি তখন এতদঞ্চলে দুর্ধর্ষ সব ডাকাতরা বাস করত। এইসব ডাকাতদের মোকাবিলা করতে কালঘাম ছুটে যেত ইংরেজ সরকারের। বিমল তাই সতর্ক হয়েই গ্রাম অভিমুখে রওনা হল।

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। একটু পরেই বৃষ্টি নামবে হয়তো। তা নামুক। ভালয় ভালয় বাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়। বিমলের হাতে টর্চ ছিল। তবু সে পাছে চোর-ডাকাতের হাতে পড়ে, এই ভয়ে টর্চ জ্বালল না। বিমল নিজেও খুব শক্তিমান ছিল, তাই সে সাহস করে খুব সতর্কতার সঙ্গে অন্ধকারে সাবধানে পথ চলতে লাগল।

আকাশে বর্ষার মেঘ ঘন হচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকেই। বিমল কিছুটা পথ আসার পরই সেই মেঘের পরিণতি দেখতে পেল। সে কী প্রচণ্ড বৃষ্টি। সঙ্গে ঝড়। প্রবল বর্ষণে দুর্যোগ যেন ঘনতর হয়ে উঠল। একটি গাছতলায় দাঁড়িয়ে একা বিমল বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে। এই ঝড়বৃষ্টিতে বিমলের এমনি অসুবিধে হলেও অনেকটা নির্ভয় হল এই ভেবে যে, এই দুর্যোগে আর যাই হোক, চোর-ডাকাতের হাতে পড়তে হবে না। কারণ তারাও এবার আশ্রয় খুঁজবে।

বৃষ্টির দাপট একটু কমলে আবার চলা শুরু করল বিমল। একটা মাঠ পার হয়ে আর এক মাঠে এসে পড়ল সে। এমন সময় সে দেখতে পেল হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা অতিকায় চেহারার তেজি ষাঁড় রণং দেহি মূর্তিতে পথরোধ করে দাঁড়াল ওর। সামনের দু' পায়ের খুরের সাহায্যে কাদামাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে ঘন ঘন শিং নাড়া দিতে লাগল।

বিমল দেখল মহাবিপদ। ষাঁড়টা এমনভাবে পথ আটকেছে যে, পাশ কাটাবার উপায় পর্যন্ত নেই।

কিন্তু এ কী! এ কী ভয়ানক কাণ্ড! ষাঁড়টা যে ক্রমশ বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে ষাঁড়টা ক্রমশ পর্বতাকার ধারণ করল।

বিমল জমিদারের ছেলে। ভাল খেয়ে মেখে নিয়মিত ব্যায়াম করে সেও কম বলিষ্ঠ ছিল না। এই অলৌকিক দৃশ্যে তাই রীতিমতো ভীত হয়েও সে ভাব চেপে রেখে সে বলল, "কে তুমি? কেন এমন জাদু দ্যাখাচ্ছো?"

ষাঁড়টা তার ককুধ ঝাঁকিয়ে 'হোগ ঘোঁৎ' করে একটা শব্দ করল।

বিমল বলল, "তুমি তো ষাঁড় নও। তুমি কোনও অলৌকিক শক্তির ধারক। বলো তুমি কে?"

ষাঁড়টি এবার পর্বতাকার ছেড়ে আস্তে আস্তে ছোট হতে লাগল। তারপর হঠাৎ মাঠময় প্রচণ্ড দাপাদাপি করে আবার ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রবল বর্ষণ থেমে গেলেও টিপটিপ করে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে। সেই আলোয় বিমল দেখতে পেল বৃষ্টির জল ষাঁড়ের গায়ে লাগছে না।

ষাঁড়টা একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর আবার বড় হতে লাগল একটু একটু করে।

বিমল বলল, "কেন তুমি আমাকে পথ চলতে দিচ্ছ না?"

প্রত্যুত্তরে বিশাল ষাঁড় ঘন ঘন শিং নাড়ল।

বিমল আবার বলল, "আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। তবে কেন তুমি এইভাবে পথরোধ করছ আমার?"

ষাঁড় মানুষের গলায় বলল, "তুই না করলেও তোর বাবা করেছে।"

"আমার বাবা কী ক্ষতি করেছে তোমার? তুমি কে?"

একটি প্রচণ্ড অট্টহাসির সঙ্গে উত্তর এল, "আমি তোর যম। আমার নাম লালুমিঞা।"

চমকে উঠল বিমল। লালুমিঞা! পত্র মারফত সে জেনেছিল লালুর মৃত্যুর খবর। কিন্তু কে, কেন এবং কীভাবে তাকে মেরেছিল তা সে জানত না। তাই বলল, "তোমার মৃত্যু সংবাদ আমি পেয়েছি। তবে তোমার ব্যাপারে কিছুমাত্র আমি জানি না। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। অতএব আমাকে ভয় না দেখিয়ে পথ ছাড়ো।"

"আমি তোকে ভয় দ্যাখাতে আসিনি রে নির্বোধ। তোকে মারতে এসেছি। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই।"

"আমার অপরাধ?"

"তোর অপরাধ তুই ওই নিষ্ঠুর জমিদারের ছেলে। তোর বাবা নৃশংসভাবে কাপুরুষের মতো হত্যা করেছে আমাকে। শুধু আমাকে নয়, আমার নিরপরাধ বউ, আমার বড় আদরের সন্তান হাসানকেও রেহাই দেয়নি সে। আমার বুকের মানিক আমার চোখের সামনে ঝলসে গেল। রাতের অন্ধকারে আমার সুখের ঘরে আগুন দিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মারল তোর বাবা। ওই দ্যাখ সেই আগুন। এই আগুনে তোকেও পুড়িয়ে মারব বলে আমি বড় আশায় দিন গুনছিলুম।"

বিমলের চোখের সামনে হঠাৎ মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুনে একটা কুঁড়েঘর পুড়ছে। আর ঘরের মধ্যে প্রাণান্ত চিৎকার করে অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে তিনটি মানুষ। কী ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য। মানুষগুলো বাঁচবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। একটি পুরুষ, একটি নারী ও একটি শিশু দগ্ধ হচ্ছে সেই আগুনে।

বিমল জ্ঞান হারাল।

একটু পরেই আবার জোর বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টির জল চোখেমুখে যেতেই সংবিৎ ফিরে পেয়ে আবার উঠে বসল বিমল।

চারদিক সেই ঘন অন্ধকারেই ঢাকা।

একটু আগের দ্যাখা ঘটনার দৃশ্যটা ওর দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হল। আবার পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলল সে গ্রামের দিকে। এই মাঠ পেরোলে আর একটি মাঠ। তারপরই ওদের গ্রাম। কিন্তু না। কিছু পথ যাওয়ার পর আবার সেই ভয়ঙ্কর ষাঁড় এসে পথরোধ করে দাঁড়াল ওর। রক্তচক্ষুতে বলল, "যাবি কোথায় বাছাধন? মৃত্যুর জন্য তৈরি হ।"

বিমল বলল, "বেশ, হলাম। তবে একটা কথা, তুমি বলছ আমার বাবা তোমাকে এবং তোমার বউ-ছেলেকে কাপুরুষের মতো হত্যা করেছে। কিন্তু তুমি নিজেও কি আজ সেই কাজ করছ না?"

"না। আমি তো অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করতে চাইছি না। তোকে জানিয়েই এই কাজ করছি।"

"মানলাম। কিন্তু সত্যিই যদি তুমি নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণ করতে না চাও তা হলে অমন সাংঘাতিক রূপ ধারণ না করে সমমূর্তিতে দ্যাখা দিয়ে আমার মোকাবিলা করো।"

"তাতে লাভ? আমি অসুরের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। এখন প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে আরও অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি।"

"ওসব বাজে কথা রেখে তুমি তোমার আসল রূপ ধরো।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন ভোজবাজি হয়ে গেল। লালুমিঞা পূর্ব রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হল বিমলের সামনে। মানুষের কলেবরে অর্থাৎ আগে যেমন দেখতে ছিল ঠিক তেমনই চেহারায় দেখা গেল তাকে।

এর পর শুরু হল ভূতে-মানুষে তুমুল লড়াই।

সারারাত ধরে দু'জনে ভীষণ লড়াই করতে লাগল। সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য। এইভাবেই ভোর হয়ে এল। আকাশে শুকতারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্রমশ।

এই অশরীরী অলৌকিক শক্তির সঙ্গে লড়াই করে বিমল ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বেশিক্ষণ বুঝতে পারল না সে। অবসন্ন দেহে মাটিতে পড়ে গেল।

লালুমিঞা ভয়ঙ্কর রূপ ধরে দু'হাতে তুলে নিল তাকে।

বিমল কাতর গলায় বলল, "না না, আমাকে মেরো না। আমাকে ক্ষমা করো লালুভাই।"

লালুমিঞা বলল, "অনেক আগেই তোকে শেষ করে দিতাম, শুধুমাত্র তোকে আমি তিল তিল করে মারব প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বলেই লড়াই করার ছলে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকবার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। এখন ভোর হয়ে আসছে। দিনের আলো ফুটে উঠলে আমার শক্তি আর কাজ করবে না। তাই তোকে শেষ করেই আমি বিদায় নেব এবার।" বলে বিমলের বুক চিরে চোঁ-চোঁ করে ওর সমস্ত রক্তটুকু শুষে নিয়ে ওকে ওর বাড়ির দেউড়িতে শুইয়ে দিয়ে এল।

সকালবেলা চাকর ও দরোয়ানের চিৎকারে ছুটে এল সবাই। বড়কর্তা, বিমলের মা, ছেলেকে বুকে নিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। গ্রামের লোকজনও ছুটে এল।

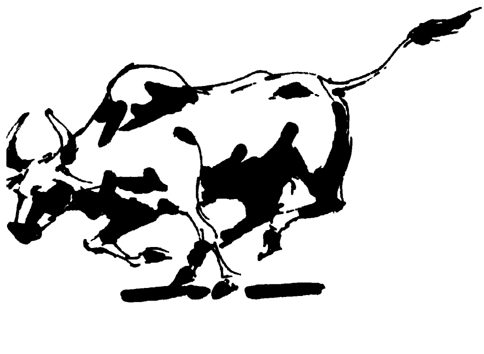
রক্তাক্ত ও কর্দমাক্ত বিমলের চোখেমুখে জল দিয়ে পাখার বাতাস করতে লাগল সকলে। কেউ ভেবেই পেল না বিমলের এইরকম দশা কী করে হল।

একটু পরে জ্ঞান ফিরল বিমলের। তবে কিনা ওর প্রাণবায়ু শেষ হয়ে আসছে তখন। তবুও অতিকষ্টে গতরাতের ঘটনাটা সকলকে বলে মা-বাবার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ল সে।

সারা বাড়িতে কান্নার রোল উঠল।

বিমলের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই নিভে গেল এই বংশের শেষ প্রদীপটি।

এই গল্পের এখানেই শেষ। ঘটনাকাল পুরনো হলেও যে মাঠে লালুমিঞার সঙ্গে বিমলের ওই রোমহর্ষক ব্যাপারটি ঘটেছিল, সেই মাঠকে আজও লোকেরা লালুমিঞার মাঠ বলে। অনেকে বলে, কালোমতো একটা ষাঁড় নাকি এখনও মাঝেমধ্যে গভীর রাতে ওই মাঠের মাটিতে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে উন্মাদের মতো ছুটোছুটি করে। তাই হাজার কাজ থাকলেও রাতভিতে ওই মাঠের ধারেকাছে যায় না কেউ।



বালিডাঙার মাঠ

মির্জানগরের মাঠ পেরিয়ে কানানদী পার হয়ে কিছুটা পথ গেলেই ডান দিকে যে পুকুরটা পড়বে সেই পুকুরকে এ অঞ্চলের লোক এড়িয়ে চলে। কেননা, ভয়ঙ্কর পুকুর সেটা। সুরুকখানার পুকুর। পুকুরের চারপাশে ঘন বাঁশবন। গভীর কালো জল। পুকুর-ভর্তি মাছ। কিন্তু ধরে না কেউ। এমনও প্রবাদ আছে, এই পুকুর থেকে নাকি মাছরাঙায় মাছ নেয় না। সাপেও ব্যাঙ ধরে না। অথচ মেছো পুকুর। আদিবাসী সম্প্রদায়ের কিছু লোক বা যাযাবর বেদেনিরা দু-একবার চেষ্টা করেছিল এই পুকুরের পাশে বসবাস করে এর বদনাম ঘোচাতে। কিন্তু পারেনি। একরাত যে থেকেছে সে-ই বলেছে 'বাপরে বাপ'।

তা এই পুকুরকে নিয়ে কিন্তু আজকের এই গল্প নয়। বর্ধমানের মুছখানা মথুরাপুর থেকে হরিহর যাচ্ছিল ওর বোনের বাড়ি। অনেকদিন কোনও খবরাখবর না পেয়ে মনে মনে খুব উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। এমন সময় হঠাৎই একজনের মুখে শুনতে পেল ওর বোনের নাকি খুব অসুখ। তাই আর একটুও দেরি না করে সে গামছায় দুটি মুড়ি বেঁধে রওনা হল বোনের বাড়ির দিকে।

হরিহর যে পথে যাচ্ছিল সেই পথেই এই সুরুকখানা এবং বালিডাঙার মাঠ। তা এই দুটো জায়গাই ছিল খুব খারাপ। এখন বালিডাঙার মাঠ পার হতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি ওর বোনের বাড়ি পৌঁছনো যায়। আর এই মাঠকে ত্যাগ করলে বা অন্য পথে ঘুরে গেলে তিন-চার মাইল পথ হাঁটা তো বেশিই হয় উপরন্তু বোনের বাড়ি পৌঁছতে রাতও হয়ে যায় খুব। তাই হরিহর মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে জেনেশুনেই এই বালিডাঙার মাঠে নামল।

ভূতের উপদ্রবের জন্য এ-মাঠে চাষও হয় না বলতে গেলে। আর লোকজনও থাকে না। হরিহর মাঠে নেমে দেখল, ধু-ধু করছে মাঠ। দিগন্তবিস্তৃত। চৈত্রের রোদ্দুরে লি-লি করছে যেন। এই দিনের আলোয় তাই ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। একবার জয়দুর্গা বলে কোনওরকমে মাঠটা পার হতে পারলেই নিশ্চিন্তি। রাতভিত হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। এখন এখানে ভয় কী? ভূতেরা আর যাই করুক দিনের বেলায় তো ভয় দেখাবে না। আর সত্যিই যদি ভয় দেখায় তো ভূত কী জিনিস তা স্বচক্ষে দেখাই যাবে। কেননা, ভূত আছে শুনেছে। অন্ধকারে পুকুরপাড়ে বনে-বাদাড়ে ভূতের ভয়ে গা ছমছম করে, তাও জানে। কিন্তু ভূত ও নিজে কখনও দেখেনি, বা কেউ দেখেছে বলে শোনেনি। তা এই বালিডাঙার মাঠে এসে সত্যি-সত্যিই যদি ভূত দেখা যায় তো মন্দ কী?

হরিহর আপন মনেই এগিয়ে চলেছে। তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, মনটাও ওর ভাল নেই। বহু কষ্ট করে বোনটার বিয়ে দিয়েছে ও। অথচ এই এক বছরের মধ্যে ওর এমন একটা অসুখের কথা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। তাই স্বাভাবিকের চেয়েও একটু দ্রুত পা চালিয়ে ও মাঠের ওপর দিয়ে পথ চলতে লাগল।

বেশ খানিকটা গেছে এমন সময় হঠাৎই মনে হল কে যেন ওর পেছন-পেছন আসছে। হরিহর একবার তাকিয়ে দেখল। কই, কেউ তো নেই। আবার চলা শুরু করল। আবার ওই একই রকম মনে হল। ভারী মজার ব্যাপার তো!

এমন সময় হঠাৎ ওর সামনে কে যেন একজন পথরোধ করে দাঁড়াল। দেখল কাস্তে হাতে এক কৃষাণ। মাথায় গামছার ফেট্টি বাঁধা। কৃষাণটি গম্ভীর গলায় বলল, "ওহে ও ছোকরা, বলি এই ভরদুপুরে বালিডাঙার মাঠ পার হয়ে যাচ্ছ কোথায়?"

হরিহর বলল, "আমার বোনের খুব অসুখ। তাই দেখতে যাচ্ছি।"

"কেন, আর কোনও পথ ছিল না?"

"সে-পথে গেলে রাত্রি হয়ে যাবে, তাই এই পথে যাচ্ছি। খুব বাড়াবাড়ি অসুখ কিনা।"

"বাড়াবাড়ি না ছাই। বুকে সর্দি বসে জ্বর হয়েছিল। এখন সেরে গেছে। ভালই আছে এখন। তুমি আর এগিও না। যেমন এসেছ তেমনই ফিরে যাও। হয় ঘুরে যাও, নয়তো ঘরে যাও।"

"তা কী করে হয় ভাই?"

"যা বলছি শোনো। আর এগিও না। আমাদের সভা চলছে এখন। গেলে অসুবিধে হবে। তোমার বোনের বাড়ির খবর ভাল।"

হরিহর বলল, "খবর ভাল হোক মন্দ হোক, এত পথ কষ্ট করে এসেছি যখন, ফিরে তো যাব না। আবার কাল কে আসে? যা হয় হবে। আমি যাবই।"

কৃষাণ বলল, "আমার কথা তা হলে শুনবে না তুমি?"

হরিহর ওর কথার উত্তর না দিয়েই এগিয়ে চলল। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই হঠাৎ ওর শরীরে কীরকম যেন একটা শিহরন খেলে গেল। ও দেখল একটা প্রাচীন বটগাছের নীচে কতকগুলো কায়াহীন ছায়া গোল হয়ে বসে আছে। আর তাদের মাঝখানে বসে আছে গলায় হাড়ের মালা পরা আর-এক ছায়ামূর্তি। এই কি তবে ভূতের রাজা? আর এরা সবাই ভূত? ভূত ছাড়া এরা আর কীই-বা হতে পারে? কারও কোনও শরীর নেই। শুধু ছায়াগুলো রয়েছে।

হরিহর যেতেই ওদের সভার কাজ থেমে গেল।

সবাই চুপচাপ।

ভূতের রাজা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হরিহরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কে তুই! এমন আচমকা এসে পড়ে আমাদের সভার কাজ পণ্ড করলি কেন?"

হরিহর দারুণ ভয় পেয়ে বলল, "আজ্ঞে, আমি নিরুপায় হয়ে এই পথে এসে পড়েছি। তা ছাড়া আমি তো আপনাদের কোনও ক্ষতি করিনি। আমি তো এপাশ দিয়ে যাচ্ছি।"

"আমার কোনও লোক তোকে এ-পথে আসতে বারণ করেনি?"

"করেছিল। তবে সে যে আপনার লোক তা অবশ্য আমি জানতাম না।"

"সে আমারই লোক।"

ভূতের রাজা হরিহরকে আর কিছু বলল না, শুধু হাত নেড়ে দলের লোকেদের ইশারা করতেই সবাই মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইল শুধু। হরিহর বুঝল কাজটা সে সত্যিই ভাল করেনি।

হরিহরের একবার ভয় হল। আবার ভয়কে জয়ও করল সে। জীবনে এই প্রথম ভূত দেখল ও। তাও দিনদুপুরে। এ গল্প ও করবে কার কাছে? যাকে বলতে যাবে সেই তো

হাসবে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক হরিহর নিজে তো করেছে। হ্যাঁ, ভূত আছে। সত্যিই আছে। এবং সে ভূত জনশ্রুতির নয়, বাস্তবের। কেননা, সে নিজের চোখে ভূত দেখেছে।

যাই হোক, সন্ধের আগেই সে বোনের বাড়িতে পৌঁছল। হরিহরের মুখে সব কথা শুনে ওর বোনের শ্বশুর এবং অন্যান্য লোকেরা সবাই খুব বকাবকি করল ওকে। সবাই বলল, "কাজটা খুব ভাল করোনি হরিহর। যে-পথে কেউ আসে না সে-পথে এই ভরদুপুরে কেন তুমি এলে? তাও এলেই যখন, ওই কৃষাণের নিষেধ তুমি উপেক্ষা করলে কেন? এখন যদি তুমি ওদের কোপদৃষ্টিতে পড়ো, তোমাকে রক্ষা করবে কে?"

হরিহরের বোন বলল, "তা ছাড়া আমার সত্যি-সত্যিই কোনও ভারী অসুখ হয়নি দাদা। সামান্য একটু জ্বরই হয়েছিল। বুকে সর্দি বসে জ্বর। কয়েকটা ইনজেকশন নিতেই সেরে গেছে। এদিকে অনেকদিন তুমি আসোনি বলে তোমার কোনও খবর-টবর না পেয়ে মনে দুঃখ হয়েছিল খুব। দারুণ অভিমান হয়েছিল। তাই আমাদের গ্রামের একজন লোক তোমাদের ওদিকে গেলে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করেছিল, 'বউমা, তোমার বাপের বাড়িতে কোনও খবর দিতে হবে?' তা আমি বলেছিলাম, 'না। কোনও খবরই দিতে হবে না। তবে দাদার সঙ্গে যদি দেখা হয়, কিছু যদি জিজ্ঞেস করে তখন বোলো যে, তোমার বোন মরতে বসেছে। তুমি সেই কথা শুনেই ছুটে এসেছ দাদা। কিন্তু এটা তুমি কী করলে?'"

যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। কাজেই আর ভেবেচিন্তে কোনও লাভ নেই। এখন ভালয়-ভালয় ও পথ ত্যাগ করে অন্য পথে বাড়ি ফিরতে পারলেই হয়! কিন্তু বাড়ি ফেরার আগে সেই রাতেই হরিহর দু-একবার রক্তবমি করে অসুস্থ হয়ে পড়ল। শুধু কি রক্তবমি? সেইসঙ্গে প্রবল জ্বর আর ভুল বকা।

পরদিন সকালেই হরিহরের ইচ্ছেমতো ওর বোনের বাড়ির লোকেরা হরিহরকে গোরুর গাড়িতে শুইয়ে তার গ্রামে পাঠিয়ে দিল।

বালিডাঙা থেকে অত শরীর খারাপ নিয়ে মথুরাপুরে ফিরে এল বটে হরিহর, তবে কিনা কাজের কাজ কিছুই হল না। যত দিন যেতে লাগল ততই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে লাগল ওর। বহু ডাক্তার বদ্যি ওঝাপত্তর করল। কিন্তু না। কিছুতেই কিছু হল না। হাজার রকমের তুকতাক, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক, সবই বৃথা হল।

অবশেষে এক সত্যিকারের গুনিনের সন্ধান পেল ওর বাড়ির লোকেরা।

গুনিনকে সন্তুষ্ট করে ডেকে আনতেই সব দেখেশুনে গুনিন বললেন, "হ্যাঁ। আমি পারব এ ভূত ছাড়াতে। এ বড় জাঁদরেল ভূত। খুব রেগে গিয়ে ধরে আছে ওকে।"

তা গুনিনের ঝাড়ফুঁকে সত্যিই কাজ হল। দু-চারবার সরষে চোঁয়া ছুড়ে মারতেই আর প্যাকাটির ফুঁ দিতেই "বাবা রে, মা রে" করে ভূত হরিহরকে ছেড়ে পালাতে পথ পেল না।

কিন্তু মুশকিল হল এই, গুনিন আসেন, ঝাঁড়ফুঁক করেন, ভূতও পালায়। কিন্তু যেই গুনিন বাড়ি ফেরেন, ভূত এসে আবার ধরে।

বারবার যখন এইরকম হতে থাকে রোগীর বাড়ির লোকেরা তখন আবার ধরে গুনিনকে। বলে, "বাঁচান মশাই। মরে গেলুম। আর তো পারি না। আপনি গেলেই রোগী সুস্থ হয়। আর আপনি খালপার হলেই আবার ধরে রোগীকে।"

তা সেদিন গুনিন নিবারণ হালদারমশাই খুবই রেগে বললেন, "আজই তা হলে ও ব্যাটার

শেষদিন হোক। ওর জন্য আমার কেন বদনাম হয়। তা ঠিক আছে, তোমরা যাও। আজ গিয়ে আমি এমন ওষুধ দেব যে, আর ওর ধারেকাছে কোনও ভূত কখনও আসতে সাহস করবে না। ও ভূত তো কোন ছার।" এই বলে হালদারমশাই তাঁর শেষ দাওয়াই ব্রহ্মকবচ হাতে নিয়ে রওনা হলেন রোগীর বাড়ির দিকে।

গ্রামসুদ্ধ লোক গুনিনের কেরামতি দেখবার জন্য হাঁ করে বসে ছিল। গুনিন যেতেই হইহই করে উঠল সকলে।

হালদারমশাই বললেন, "না, আজ আর আমি কোনওরকম ঝাড়ফুঁক করব না। একটা রক্ষাকবচ পরিয়ে দেব শুধু। তারপর দেখব কোন ভূতে কী করে ওকে ধরে।"

গুনিনকে দেখেই ভূত পালাল।

সুস্থ লোকটির গলায় কবচ বেঁধে গুনিন বললেন, "এই তোমার রক্ষাকবচ বাবা। খুব যত্নে রেখো এটা। অন্তত বছরখানেক। আর তোমাকে ভূতে ধরবে না।"

হরিহর হালদারমশাইকে প্রণাম করল। এবং সত্যি-সত্যিই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। অর্থাৎ, সেদিন গুনিন চলে যাওয়ার পরেও আর তাকে কোনও ভূতেই ধরল না।

এই ব্যাপারে ওঝা হিসেবে নিবারণ হালদারের ধন্য-ধন্য পড়ে গেল চারদিকে। পড়বে নাই-বা কেন? এমন বেয়াড়া ব্যাপার তো হামেশা ঘটে না। তা কে কবেই বা এসব দেখেছে। ওইরকম একটা ঢ্যাটা-ভূতকে জব্দ করা কি চাট্টিখানি কথা? হালদারমশাইও তাই বিজয়গর্বে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন চারদিকে।

পরদিন সন্ধেবেলা ফাঁকা মাঠে একা পেয়ে ভূতেরা এসে ধরল হালদারমশাইকে। বলল, "হালদার, তুই মস্ত গুনিন। গুনিনের সেরা গুনিন। কিন্তু আমাদের পেছনে লেগে তুই খুব একটা ভাল করলি না। এখনও বলছি আমাদের শিকার আমাদের হাতে তুলে দে।"

হালদার বললেন, "থাম ব্যাটারা। আমি নিবারণ হালদার। আমার সঙ্গে লাগতে আসিস না। আর ওকে তোদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা হলে এই যে দেশময় ধন্যি-ধন্যি পড়ে গেছে আমার নামে, সব তা হলে বৃথা হয়ে যাবে। তোরা অন্য কাউকে ধর। আমি তাকে ছাড়াব না।"

"হরিহর আমাদের শিকার। আমরা খুব রেগে আছি ওর ওপর। কাজেই ওকে ছাড়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।"

"তা আমার কী? হরিহরকে ভাল করে আমার দেশজোড়া খ্যাতি। এ সুনাম আমিও হারাতে চাই না।"

ভূতেরা বলল, "আমাদের কথা তুই শুনবি না তা হলে?"

"না।"

"ঠিক আছে। আমরাও এর বদলা নেব। তোর একটিমাত্র ছেলে তো? আনাচে-কানাচে যেখানে-সেখানে ঘোরে। আমরা তার গলা টিপে মারব। তবে তোকে আমরা আর একবার ভেবে দেখার সময় দিলাম।"

"তোদের যা ইচ্ছে কর।"

"তা তো করব। কিন্তু এখনও বলছি হালদার, ওই কবচ তুই খুলে নিয়ে আয়।"

"সম্ভব নয়।"

"তা হলে ধরলাম তোর ছেলেকে। তোর ছেলে এখন পুকুরপাড়ে ওর বন্ধুদের সঙ্গে

আড্ডা দিচ্ছে। ধরলাম ওকে। এখনই বেশি ক্ষতি করব না। তবে ঘাড়টা একটু ব্যথা করে দেব।" বলে একটু নীরবতার পর আবার বলল, "তোর ছেলের মুখ দিয়ে এখন রক্ত উঠছে হালদার। তাড়াতাড়ি যা। তবে তুই যাওয়ার আগেই আমরা ওকে ছেড়ে দেব।" এই কথা বলেই ভূতেরা বেপাত্তা।

আর নিবারণ হালদারও দারুণ ভয় পেয়ে ছুটলেন সেই পুকুরপাড়ে তাঁর ছেলের কাছে।

ওই তো। ওই তো তাঁর ছেলেকে ঘিরে সবাই কেমন গোল হয়ে বসে আছে। তবে কি সত্যিই ভূতেরা ধরল ওকে?

হালদারমশাই গিয়ে ঝাড়ফুঁক করে জলপড়া দিয়ে ছেলেকে ঘরে আনলেন। ছেলের তখন প্রবল জ্বর। অনবরত ভুল বকছে। শুধু বলছে, "ও বাবা গো! কী বড় বড় চোখ। ও বাবা গো। আমাকে কামড়াতে আসছে। আমি মরে যাব বাবা গো। ওই দ্যাখো, আমার কাঠ সাজাচ্ছে।"

হালদারমশাই দেখলেন গতিক সুবিধের নয়। তাঁর যতরকম বিদ্যে জানা ছিল প্রয়োগ করে ছেলেকে তিনি সুস্থ করবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর একটু সুস্থ হল ছেলেটি।

পরদিন সন্ধেবেলা ভূতেরা আবার হালদারমশাইকে বলল, "কী গুনিন, দেখলি তো আমাদের মহিমা? আমরা যা বলি তা করি। এখনও সময় আছে কিন্তু। তোর ছেলেকে শুধু ধরেই একটু মোচড় দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। এবার কিন্তু জানে মেরে দেব। ভেবে দ্যাখ কী করবি? তোর কাছে খ্যাতি বড় না ছেলে বড়? ভেবে দ্যাখ, তোর কিন্তু ওই একটিমাত্র ছেলে।"

হালদার বললেন, "আমার কাছে খ্যাতিই বড়। ছেলে নয়।"

"ঠিক আছে। হরিহরের বদলাটা তোর ছেলেকে দিয়েই নিতে হবে দেখছি। তবে আর একবার সুযোগ তোকে দেব।"

হালদার চিন্তান্বিত হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। চিন্তার কারণ আছে বইকী! হতচ্ছাড়া ভূতগুলো আগে যদি কিছু বলত, তখন না হয় চিন্তা করে দেখা যেত। কিন্তু এখন নিজের হাতে লোকের গলায় কবচ বেঁধে সেই কবচ খুলে আনবে কী করে? এদিকে ওদের যত রাগ এখন ছেলেটার ওপব পড়েছে। হালদারমশাইয়ের সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল।

বাড়ি ফিরতেই হালদারমশাইয়ের স্ত্রী তো কেঁদে এসে হালদারের পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন।

হালদার বললেন, "কী ব্যাপার! হল কী তোমার? কাঁদছ কেন?"

"তার আগে বলো, তোমার কি সত্যি-সত্যিই মতিচ্ছন্ন হয়েছে?"

"তার মানে?"

"তার মানে তুমি ভালরকমই জানো।"

"আরে! কী হল বলবে তো?"

"কী হল তুমি জানো না? এই তো একটু আগে পুকুরঘাটে আমাকে দেখা দিয়ে ওরা বলে গেল তুমি নাকি ওদের কথায় রাজি হচ্ছ না? ওরা বলছে এখনও সময় আছে, হালদারমশাইকে একটু বুঝিয়ে বলো যেন ওই কবচটা কালই গিয়ে খুলে নিয়ে আসে। ওরা এ-কথাও বলেছে, আমরা সচরাচর কারও ক্ষতি করি না। ওই লোকটাকে বারণ করা সত্ত্বেও

আমাদের জরুরি মিটিং-এর দিন ও জোর করে ওই মাঠে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ওরা বারবার বলেছে তুমি ওঝাগিরি করছ বলে ওদের কোনও রাগ নেই তোমার ওপর কিন্তু ওদের কথা তুমি যদি না শোনো, যদি তুমি ওদের মুখের গ্রাস ফিরিয়ে না দাও তা হলে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই ওরা তোমার ছেলেকে মারবে। আমাকে মারবে। এখন বলো তোমার এত দরদ কেন ওদের ওপর? কীসের এত জেদ তোমার? শুধু তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্যই না ওরা আমার ছেলেটার মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত ওঠাল। সব জেনেশুনেও চুপ করে আছ তুমি? তুমি বাপ না পিশাচ?"

হালদারমশাই এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে বললেন, "ওরা বুঝি এইসব কথা বলেছে তোমাকে?"

"না বললে জানলাম কী করে বলো?"

"কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জানো, আমি ওই কবচ কী করে খুলে আনব?"

"কেন? কাল সকালেই তুমি অন্য একটা বাজে কবচ হাতে নিয়ে ওদের বাড়ি যাও। তারপর গিয়ে বলো, এই নতুন কবচটা আরও বেশি জোরালো। এই কথা বলে আসল কবচটা খুলে নিয়ে নকল কবচ পরিয়ে চলে এসো। ভূতেরা বলেছে ওই কবচ খুলে নিয়ে তুমি ঘরে ফিরলেই ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে মেরে ফেলবে লোকটাকে। ঝামেলা একেবারেই চুকে যাবে।"

হালদারমশাই বললেন, "বেশ। তাই করব। ওরা আবার এলে এই কথাই তুমি বলে দিও।"

হালদারগিন্নি দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

পরদিন সকালে হালদারমশাই নতুন একটি কবচ নিয়ে আবার গেলেন মথুরাপুরে। হরিহর তখন গোয়ালে গোরু-বাছুরের দেখাশোনা করছিল। হালদারমশাইকে দেখেই এগিয়ে এল সে, "ব্যাপার কী হালদারমশাই?"

হালদারমশাই বললেন, "ব্যাপার কিছুই নয়। শুধু দেখতে এলাম আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা।"

"কী যে বলেন! আপনার দেওয়া কবচ গলায় বেঁধে রেখেছি। ভূত তো ভূত, ভূতের বাবারও আর সাধ্য নেই যে এখানে আসে।"

"ঠিক আছে। এখন ওই কবচটা তুমি আমাকে ফেরত দাও।"

"সে কী!"

"ভয় নেই। এই কবচের বদলে তোমাকে আর একটা এমন কবচ দেব যে, তা আরও সাঙ্ঘাতিক। এই কবচটা তো শুধু তোমাকেই রক্ষা করবে, কিন্তু এই নতুন কবচ রক্ষা করবে তোমার পুরো পরিবারকে।"

এই কথা শুনে হরিহর সরল বিশ্বাসে কবচটা খুলে দিল হালদারমশাইকে। তাঁরই দেওয়া জিনিস তিনি ফিরিয়ে নেবেন, এতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার হয়তো একদিন নতুন কোনও কবচ দেবেন। এরকম তো হতেই পারে। তাই সরল বিশ্বাসে কবচটা হালদারমশাইকে দিয়ে দিল হরিহর।

হালদারমশাই নিজে হাতে ওর গলা থেকে রক্ষাকবচটি খুলে নিয়ে নতুন একটি নকল কবচ বেঁধে দিলেন। তারপর ভগবানের নাম স্মরণ করে বেরিয়ে এলেন ওদের বাড়ি থেকে।

মথুরাপুরের সীমানা যেই পেরিয়েছেন অমনই শুনতে পেলেন কে যেন বলল, "আমাদের

রাজা তোর ওপর খুব খুশি হয়েছে গুনিন। আমরা তোর ওপর সন্তুষ্ট। আর তোর বউ-ছেলের কোনও ভয় নেই। এখন ওরা নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে। তোর ছেলের ওপর থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছি। আর এও বলে রাখছি, আমরা যদি কাউকে কখনও ধরি আর ওঝা হয়ে তুই যদি সেখানে যাস, তা হলে তোকে দেখামাত্রই আমরা তাকে ছেড়ে দেব।"

হালদারমশাই নিশ্চিন্ত হলেন। একজন রোগীকে সারাতে না পারলেও এরকম অনেক রোগীকে যদি বাঁচাতে পারেন, সেটাই বা মন্দ কী! তাঁর কর্মদক্ষতা তাতে কিছুমাত্র কমবে না। বরং উত্তরোত্তর সুনাম বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

ওদিকে হালদারমশাই চলে আসামাত্রই হরিহরও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওর বাড়ির লোকেরা দেখল হরিহরের মুখটা কেমন যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। হরিহর কথা বলতে পারছে না। দুটো চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। এক অদ্ভুত আতঙ্কে নীল হয়ে আসছে ক্রমশ। বাড়ির লোকেরা দেখতে না পেলেও হরিহর বেশ বুঝতে পারল কালো পোড়া দুটো হাত ওর গলা টিপে ওকে মেরে ফেলতে চাইছে। হরিহরের শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ও ধীরে-ধীরে লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে। ওর মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে।

ওর বাড়ির লোকেরা গুনিনকে ডাকতে ছুটল। কিন্তু গুনিন তখন কোথায়? গুনিন তখন নাগালের বাইরে।



ব্রহ্মডাঙার মাঠ

যে সময়কার কথা বলছি তখন আমার বয়স চোদ্দ-পনেরোর বেশি নয়। মাকড়দার কাছেই আছে ঝাঁপড়দা। নামটা শুনলেই তখন হাসি পেত। তা সেই ঝাঁপড়দাতে আমাদের এক বন্ধু ছিল, তার নাম ক্যাবা। ক্যাবলাকান্ত থেকে ক্যাবা কিনা জানি না, ওই নামেই তাকে ডাকত সবাই। তা সেই বন্ধুটি বেওড়পাড়ায় মুড়িউলি মাসির বাড়িতে আসত বলেই তার সঙ্গে আমার এবং আমার বন্ধুদের পরিচয়।

সে যাই হোক, একদিন ক্যাবা আমাদের ধরে বসল দু-একদিনের জন্য ওদের গ্রামে যেতে হবে। ওর এই আমন্ত্রণে আমরা কেউ না করলাম না। গোরা, আমি আর পল্টন তিনজনেই লাফিয়ে উঠলাম। যেহেতু মুড়িউলি মাসির বোনপো, তাই বাড়িতেও কেউ এই যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করল না। মুড়িউলি মাসির বাড়ি নার্নায়। ক্যাবাদের দক্ষিণ ঝাঁপড়দায়। আমাদের হাওড়া শহর থেকে জায়গাটার দূরত্বও বেশি নয়।

একদিন সকালে ক্যাবার সঙ্গেই আমরা চললাম ওদের দেশে। তখন হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন কোম্পানির ট্রেন চালু ছিল। সেই ট্রেনে চেপে আমরা ঘণ্টা দেড়েকের জার্নির পর ডোমজুড়ে এসে নামলাম।

ডোমজুড় তখন এত উন্নত ছিল না। চারদিকে মাটির অথবা ছিটেবেড়ার ঘর এবং বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এইখান থেকে দক্ষিণ ঝাঁপড়দা হয়ে একটি বনপথ সোজা চলে গেছে নার্নার দিকে। নার্নার পঞ্চানন্দ হলেন অত্যন্ত জাগ্রত।

যাই হোক, সেই পথ ধরে একসময় শ্মশান পার হয়ে একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম আমরা। সেইখানে অনেক সুপ্রাচীন বট ও অশ্বত্থের সমারোহ দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। তারই মাঝে বহুদিনের পুরনো একটি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত বাড়িতে এতে ঢুকলাম আমরা।

ক্যাবা বলল, "এই আমাদের বাড়ি।"

বাড়ির চেহারা দেখে বুক শুকিয়ে গেল। এ তো ভূতের বাড়ি। এই বাড়িতে কোনও মানুষ বাস করে? বাড়ির ইটগুলো সব নোনা লেগে ঝরে পড়ছে। কোথাও জোরে একটু শব্দ হলেও বোধ হয় ভেঙে পড়বে বাড়িটা। এই বাড়ির দোতলার একটি ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল।

সব দেখেশুনে গোরা বলল, "খুব জোর একটা রাত, তার বেশি নয়। কাল সকাল হলেই পালাব আমি।"

পল্টন বলল, "এ নির্ঘাত ভুতুড়ে বাড়ি। আজ রাতে ভূত এসে যদি আমাদের গলা টিপে না মারে তো কী বলেছি।"

আমি বললাম, "তার চেয়েও বেশি ভয় হচ্ছে আমার সাপ অথবা বিছের।"

যে ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ঘরে সাবেক কালের একটা পুরনো পালিশ ওঠা ভাঙা খাট ছিল। তাতে ছিল দুর্গন্ধযুক্ত তেলচিটে বালিশ আর চটের ওপর ছেঁড়া

কাঁথা বিছানো গদি। এই বিছানায় শুতে হবে ভেবেও গা যেন ঘুলিয়ে উঠল।

একটু পরে ক্যাবা আমাদের নীচে নিয়ে গিয়ে ওর বাবা-মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

ওঁরা সবাই খুব খুশি হলেন আমাদের দেখে।

ক্যাবার মা বললেন, "গরিবের বাড়িতে কেউ তো আসে না বাবা, তোমরা এসেছ বলে খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। আমাদের ঘরদোর ভাল নয়, বিছানাপত্তর ভাল নেই। খুব কষ্ট হবে তোমাদের।"

ক্যাবার মায়ের আন্তরিকতাপূর্ণ কথা শুনে মন ভরে গেল আমাদের। সত্যিই স্নেহময়ী জননী তিনি। বললাম, "তাতে কী? ও আমরা ঠিক মানিয়ে নেব।"

ক্যাবার মা বললেন, "যাও, কুয়োতলায় গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এসো। আমি তোমাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করি।"

আমরা ক্যাবার সঙ্গে কুয়োতলায় গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিলাম। ও দড়ি-বালতি নিয়ে জল তুলে দিতে লাগল। আমরাও জল খরচ করতে লাগলাম। তারপর গামছায় মুখ-হাত মুছে ঘরে আসতেই ক্যাবার মা আমাদের প্রত্যেককে মেঝেয় আসন পেতে বসিয়ে গরম গরম লুচি, আলুভাজা, বোঁদে আর পানতুয়া খেতে দিলেন। খুব তৃপ্তির সঙ্গে আমরা খেয়ে নিলাম সেগুলো।

খাওয়াদাওয়া হলে আমরা ক্যাবার সঙ্গে গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এখানে এত ঘন ও বড় বড় গাছ চারদিকে যে, মনে হল এর পত্রছায়া ভেদ করে সূর্যের আলো বোধ হয় কারও ঘরে কখনও ঢোকে না। দিনমানেও তাই অন্ধকার।

যাই হোক, এইভাবে আমরা সারা গ্রাম তোলপাড় করে একসময় স্টেশনের দিকে এগোলাম।

এখানটা তবু জমজমাট।

চাঁপাডাঙার দিকে যাওয়ার জন্য একটি ট্রেন তখন তার দেশলাই খোলের মতো শরীর নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। আমরা যাওয়ার পরই হুইস্‌ল দিয়ে নড়ে উঠল ট্রেনটা। আর তার একটু পরেই চারদিক থেকে রব উঠল, গেল-গেল-গেল।

কী ব্যাপার? না, স্টেশন থেকে বেরিয়ে দক্ষিণবাড়ির মাঠের দিকে যেতে গিয়ে একটা ছাগলকে চাপা দিয়ে উলটে গেছে ট্রেনটা।

অমনই ছোট— ছোট— ছোট।

অনেক লোকের সঙ্গে আমরাও ছুটলাম। কতকগুলো লোক ট্রেনের মাথায় বসে ঠ্যাং ছড়িয়ে বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে যাচ্ছিল, তাদেরই অনেকে ছিটকে ছুটকে পড়ায় লেগেছে খুব। বাকি যারা, তারা ট্রেনের কামরা থেকে সামান্য আঘাত পেয়ে বেরিয়ে এসে দড়ি বাঁশ ইত্যাদি নিয়ে চেষ্টা করছে আবার কামরাগুলোকে লাইনের ওপর তুলে বসানোর জন্য। একটা বোকা পাঁঠা এমনভাবে কাটা পড়েছে যে, তার ধড় একদিকে মুণ্ডু আর একদিকে হয়ে গেছে।

যাই হোক, প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় কাত হওয়া দু-তিনটে বগিকে ঠিকভাবে বসানো হল।

আবার নড়ে উঠল ট্রেন। আমরাও বিদায় নিলাম।

দুপুরবেলা স্নানপর্ব শেষ হলে মধ্যাহ্নভোজন। কাঁসার থালায় মোটা চালের ভাত। বড় জামবাটিতে করে পেঁয়াজ দিয়ে মুসুর ডাল। এছাড়া শাকভাজা, আলুভাজা, ঢ্যাঁড়সভাজা। পোস্তর চচ্চড়ি, শোলমাছের ঝোল আর আমের চাটনি তো ছিলই। সময়টা তখন গরমের

দিন। বৈশাখ মাস।

আমরা বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে সুপুরি এলাচ মুখে দিয়ে ওপরের ঘরে শুতে এলাম। এতক্ষণে কিন্তু পরিবেশটা আমরা মানিয়ে নিতে পেরেছি। খাটে না শুয়ে ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতেই আমরা শুয়ে পড়েছি। শুয়ে শুয়ে কত গল্পই না হল আমাদের! বেশি গল্প করতে লাগলাম ট্রেন ওলটানোর ওই ব্যাপারটা নিয়ে। ভাগ্যে বগিগুলো সব কাত হয়েছিল, না হলে কেউ না কেউ মরতই।

পল্টন বলল, "রেল দুর্ঘটনায় মরলেই লোকগুলো সব ভূত হত।"

গোরা বলল, "তা কেন হবে? ওরা হত কন্ধকাটা।"

আমি বললাম, "বা রে! কন্ধকাটা বুঝি ভূত নয়?"

ক্যাবা বলল, "যতক্ষণ না কেউ নিজে থেকে রেললাইনে মাথা দিয়ে গলা না কাটাবে ততক্ষণে সে কন্ধকাটা হবে না। তবে অপঘাতে মরলে অন্য ভূত সে হবেই।"

আমাদের যখন এইরকম সব আলোচনা হচ্ছে তখন হঠাৎই নাদাপেটা কদমছাঁটা একটা ছেলে এসে ক্যাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি ফিসফিস করে কী যেন বলল।

শুনেই তো লাফিয়ে উঠল ক্যাবা। বলল, "দারুণ হবে রে! কোথায় করবি? ব্রহ্মডাঙার মাঠে? তবে আর দেরি কেন? জোগাড়যন্তর কর সব।"

ছেলেটা চলে যেতেই ক্যাবা এসে বলল, "আজ রাতে একটা জোর পিকনিক হবে আমাদের। খালধারে ব্রহ্মডাঙার মাঠে। তোরাও থাকবি।"

পল্টন বলল, "বলিস কী রে! তা মেনুটা কী শুনি?"

"গরম ভাত, পাঁঠার মাংস আর আমের চাটনি।"

গোরা বলল, "চাঁদা কত করে? পাঁঠার তো অনেক দাম।"

ক্যাবা বলল, "তেল-নুনটা ঘর থেকেই জোগাড় হয়ে যাবে। চালেরও অভাব হবে না। আমও আছে গাছের ডালে, দু-চারটে পেড়ে নিলেই হবে। কিনতে হবে শুধু গুড়, চিনিটা। মাংসটা তো ফাউ। অর্থাৎ কিনা তখনকার সেই কাটা পড়া পাঁঠাটাই হবে আজ রাতে আমাদের খোরাক। আমার বন্ধু ওই হেবোটা সবার নজর এড়িয়ে সরিয়ে নিয়ে এসেছে পাঁঠাটাকে। অমন নধর পাঁঠা সচরাচর পাওয়া যায় না। সত্যি, ভোজটা যা হবে না!"

ক্যাবার কথায় গোরা, পল্টন উৎসাহিত হলেও আমার মন কিন্তু সায় দিল না। বললাম, "দ্যাখ, খাওয়ার জন্য একটা পাঁঠাকে যদি কাটা হয় বা ঠাকুর দেবতার থানে বলি দেওয়া হয়, সে আলাদা কথা। কিন্তু রেলে কাটা পড়া বা অন্য কোনওভাবে অপঘাতে মরা কোনও প্রাণীর দেহ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ না করাই ভাল।"

ক্যাবা বলল, "দুর বোকা, কেটে খাওয়া আর রেলে কাটা পড়া একই ব্যাপার হল। কিছুই হবে না ওতে। চল তো!"

আমার গা ঘিনঘিন করলে কী হবে, গোরা আর পল্টনের দেখলাম উৎসাহ খুব। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতেই হল ওদের সঙ্গে।

ব্রহ্মডাঙার মাঠে তখন হেবো ছাড়াও আরও দু-তিনজন জড়ো হয়েছে। সবাই মিলে একটা গাছের ডালে পাঁঠাটাকে ঝুলিয়ে তার ছাল-চামড়া ছাড়াতে লেগে গেছে।

এই করতে-করতেই বেলা কাবার।

সন্ধেবেলা মাঠে গর্ত করে সেই গর্তের মুখে ইট বসিয়ে উনুন তৈরি করা হল। তারপর শুকনো ডালপালা জোগাড় করে তাই জ্বাল দিয়ে শুরু হল রান্নাবান্না। দেখতে দেখতে আমরা

প্রায় দশ-বারোজন হয়ে গেলাম। আমের চাটনি, ভাত আগেই তৈরি হয়েছিল। গরমাগরম মাংস রান্না হলেই শুরু হবে খাওয়াদাওয়া। কুমোরদের বাড়ি থেকে কিছু মাটির গেলাস চেয়ে আনা হয়েছিল। একটা বালতিতে করে নিয়ে আসা হয়েছিল এক বালতি জল। ক্যাবা একটা কলাগাছ থেকে কতকগুলো পাতা কেটে এনেছিল। সবই ঠিক ছিল। কিন্তু সবকিছুই ওলটপালট হয়ে গেল খেতে বসবার সময়।

গরম মাংসর হাঁড়ি উনুন থেকে যেই না নামানো অমনই শুনতে পেলাম, "ব্যা-ব্যা-ব্যা।"

চমকে উঠলাম সবাই, এত রাতে ব্রহ্মডাঙার মাঠে কাদের ছাগল ডাকে? যেমন-তেমন ডাক নয়, অন্তিমের ডাক। বলির আগে পাঁঠারা যেভাবে ডাকে, ঠিক সেইরকম। আর তারপরই মনে হল, মাঠময় কী যেন ছুটে বেড়াচ্ছে।

একটু পরেই হঠাৎ একটা ঢিপ করে শব্দ। যেন ভারী কিছু একটা লাফিয়ে পড়ল গাছের ডাল থেকে। আমাদের সঙ্গে দুটো হ্যারিকেন ছিল। সে দুটোও নিভে গেল দপদপিয়ে। আর সেই অন্ধকারে আমরা দেখতে পেলাম কিম্ভূতকিমাকার একটা মূর্তি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রান্না হওয়া সেই মাংসর হাঁড়িটার দিকে।

আমরা তখন আর আমাদের মধ্যে নেই। বাবা রে মা রে করে যে যেদিকে পারলাম পালালাম। ক্যাবা, আমি, গোরা আর পল্টন এক ছুটে ওদের বাড়িতে।

ক্যাবার মা তো সব শুনে খুব বকলেন ক্যাবাকে। বললেন, "বলিহারি রুচি তোদের! অপঘাতে মরা কোনও প্রাণিদেহর মাংস কেউ খায়? তার ওপরে ভর সন্ধেবেলা তোরা গেছিস ব্রহ্মডাঙার মাঠে। ওটা যে একটা দোষাস্ত মাঠ তা বুঝি ভুলে গিয়েছিস?"

আমরা সবাই মাথা হেঁট করে বকুনি হজম করলাম।

যাই হোক, সে রাতে মাংস-ভাতের বদলে দুধ-ভাত খেয়েই শুতে গেলাম আমরা। পরদিন সকাল হতেই আমরা বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

পরে—অনেক পরে ক্যাবার মুখে শুনেছি, একটা মুণ্ডহীন ছাগলকে প্রায়দিনই সন্ধের পর রেললাইনের ধারে অথবা ব্রহ্মডাঙার আশেপাশে তার ছায়াশরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সে কারও ক্ষতি করে না, ভয় দেখায় না, ডাকেও না। শুধু দেখা দেয় আর মিলিয়ে যায়। তবে আমরা কিন্তু আর কখনও ও-মুখো হইনি।



দক্ষিণবাড়ির মাঠ

হাওড়া শহরের ঐতিহ্য মার্টিন কোম্পানির ছোট্ট রেলগাড়িটি আগে তেলকল ঘাট থেকে ছাড়ত। তেলকল ঘাট থেকে ছেড়ে হাওড়া ময়দান, কদমতলা হয়ে বালিটিকুরি ইত্যাদির ওপর দিয়ে আমতা শিয়াখালা চাঁপাডাঙায় চলে যেত। তারপর তেলকল ঘাট ও হাওড়া ময়দান বন্ধ হয়ে গেলে ট্রেন ছাড়ত কদমতলা থেকে। পরে অর্থাৎ সেই বোমা পড়ার বছর, মানে এই গল্প লেখার চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে কদমতলা থেকেও স্টেশন উঠে গিয়ে হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি বাঙালবাবুর ব্রিজের তলা থেকে ছাড়ত। তা যাক, মার্টিন রেলের ইতিহাস এটা নয়। মানে সেই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগের সালটা ঠিক মনে নেই, তবে সেটা বোমা পড়ার বছর। শহরের লোক সাইরেনের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে এবং বোমা পড়ার ভয়ে যখন শহর ছেড়ে পালাচ্ছে তখনকার গল্প। এখন যেমন মফস্বলের বাসগুলোর অবস্থা, তখন ঠিক সেইরকম ছিল মার্টিন রেলের অবস্থা। এমনিতেই এই ট্রেনের ছাদে চেপে যেতে লোকে ভালবাসত, তার ওপর তখন যুদ্ধের বছর। প্রাণের ভয়ে মানুষ পালাচ্ছে। কাজেই ওপর-নীচে গাদাগাদি করে লোক চলেছে দেশের দিকে।

তখন মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত। ভবনাথবাবুও সপরিবারে চলেছেন গ্রামের দিকে। কোথায় যাবেন, কী করবেন কিছু ঠিক নেই। শুধু সবাই পালাচ্ছে তাই তিনিও পালাচ্ছেন। স্ত্রী এবং দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। খুবই গরিব লোক। টিকিটও কাটতে পারেননি। যাই হোক, ট্রেন তো তার আপন গতিতে ছাগলের মতো মুখ নেড়ে নেড়ে চলেছে। তিনিও কোনওরকমে এককোণে ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে জড়সড় হয়ে বসে চলেছেন। ছেলেমেয়ে দুটি নিতান্তই ছোট্ট। ট্রেনের দুলুনিতে এবং রাতের আধিক্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ট্রেনের ভিড় একটু একটু করে কমতে লাগল।

ডোমজুড় ছাড়ার পর একজন চেকার উঠলেন ট্রেনে।

ভবনাথবাবু নিজেও তখন বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

চেকার তাঁকে ঠেলা দিয়ে বললেন, "আপনি এখনও নীচে বসে আছেন কেন? উঠুন। ওপরের সিট তো খালি হয়েছে। ছেলেমেয়েগুলোকে শুইয়ে দিন।"

ভবনাথবাবু ঝেড়েমেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছেলেমেয়ে দুটোকে সিটে শুইয়ে দিয়ে বউকে সিটে বসিয়ে নিজেও বসলেন। গাড়ি একদম ফাঁকা। এই ছোট্ট কামরাটিতে তাঁরা ছাড়া আর জনা চারেক লোক রয়েছে।

চেকার বললেন, "আপনাদের টিকিটগুলো দেখান। যাবেন কোথায়?"

ভবনাথবাবু বললেন, "আমি গরিব মানুষ বাবু। একটা দোকানে বিড়ি বাঁধার কাজ করি। টিকিট কাটবার পয়সা আমার নেই।"

"বেশ, তা না হয় বুঝলুম। অনেকেই টিকিট কাটতে পারেননি। কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?"

"কোথায় যাব তাও জানি না। ভগবান যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাব।"

"তার মানে?"

"এই ট্রেন যেখানে গিয়ে একেবারে থেমে যাবে, আমরা সেখানেই নেমে যাব।"

"এই ট্রেন তো চাঁপাডাঙা যাবে। আপনিও সেখানে যাবেন? দেশ কোথায় আপনার?"

"আমার দেশ ঘর নেই। ওখানে গিয়ে যার হোক আশ্রয়ে উঠব। আমার এই বাচ্চা দুটির মুখ চেয়ে কেউ না কেউ আশ্রয় দেবে নিশ্চয়ই।"

চেকারবাবু আর কোনও কথা না বলে অন্য যাত্রীদের টিকিট চেক করে দরজার হাতল টেনে পাশের কামরায় চলে গেলেন।

ডোমজুড় ছেড়ে দক্ষিণবাড়ির মাঠের ওপর দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে উড়িয়ে ট্রেন ছুটছে। এমন সময় হল কি, কলার খোসায় পা হড়কে মানুষ যেরকম উলটে যায় ঠিক সেইভাবে উলটে পড়ল ট্রেনটা। কী যে হল তা কে জানে? এক-একটা বগি দেশলাইয়ের খোলের মতো এক-একদিকে ছিটকে পড়ল। এর পর ভবনাথবাবুর আর কিছু মনে নেই।

ভবনাথবাবুর যখন জ্ঞান ফিরল তখন তিনি হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের বিছানায় শয্যাশায়ী আছেন। ইতিমধ্যে তিন-তিনটে দিন কোথা দিয়ে কেটে গেছে। হাসপাতালে আহতদের কত লোক তো দেখতে আসছে। কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে এল না। ডাক্তার নার্স আয়া সকলকেই জিজ্ঞেস করেন তিনি, তাঁর খোঁজে কেউ এসেছিল কিনা বা তাঁর স্ত্রী পুত্রদের খোঁজখবর কেউ দিতে পারে কিনা, কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারল না তাঁকে। মনের দুঃখে এবং গভীর চিন্তায় ভবনাথবাবু দিশাহারা হয়ে পড়লেন। আরও দু-চারদিন থাকার পর ছুটি হল তাঁর।

ছুটির পর প্রথমেই ফিরে এলেন তিনি নিজের বাড়িতে। যদি তাঁর বউ ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে আবার সেখানে ফিরে এসে থাকে, সেই আশায়। কিন্তু না। সেখানেও কেউ নেই। ছোট্ট ঘরটিতে আগের মতোই তালা দেওয়া। গভীর আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল তাঁর। হাতে একটিও পয়সা নেই। পেটে প্রচণ্ড খিদে। চেনাজানা প্রতিবেশীরা সকলেই প্রায় স্থানত্যাগ করেছে। এখন একমাত্র ভিক্ষে করা ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। যাই হোক, তবু ওরই মধ্যে এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হতে নিজের বিপদের কথা বলে গোটা দুই টাকা ধার নিলেন। তারপর সামান্য কিছু জলযোগ সেরে হেঁটে হেঁটে কদমতলায় এসে ট্রেন ধরলেন। আমতার গাড়ি। সেই গাড়িতে করে তিনি ডোমজুড়ে এসে নামলেন। এর পর লাইন ধরে শুরু হল হাঁটা। কেননা এইখানেই দক্ষিণবাড়ির মাঠের কাছে ট্রেনটা উলটে গিয়েছিল। ওদের খোঁজখবর হয়তো ওইখানেই পাওয়া যেতে পারে।

ভবনাথবাবু লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন দক্ষিণবাড়ির মাঠে এসে পড়লেন তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। এখনকার মানুষ তখনকার সেই দক্ষিণবাড়ির মাঠের রূপ কল্পনাও করতে পারবে না। এক গভীর জঙ্গলময় প্রান্তরে কিছু ধানজমি নিয়ে দক্ষিণবাড়ির মাঠ। সেখানে গিয়ে তিনি ঘটনাস্থল আবিষ্কার করে ফেললেন। দেখলেন দু-তিনটি বগি তখনও সেখানে উলটে পড়ে আছে। ভবনাথবাবুর দু'চোখে জল এল। কিন্তু এই মাঠের মাঝখানে কোথায় যাবেন তিনি, কাকেই বা কী জিজ্ঞেস করবেন?

এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন বেশ জোরালো টর্চের আলো ফেলে তাঁর সামনের সরু লাইন ধরে স্লিপারের ওপর দিয়ে কে যেন আসছে।

ভবনাথবাবু আশার আলো দেখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

টর্চের আলো এবার তাঁর মুখের ওপর পড়ল। কাজেই লোকটিকে দেখতে পেলেন না তিনি।

লোকটি কঠিন গলায় বললেন, "কে আপনি! এখানে কী করছেন?"

ভবনাথবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "আজ্ঞে, কিছু করিনি।"

"কিছু করেননি তো এই ভর সন্ধেবেলা লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আত্মহত্যা করতে এসেছেন? না ফিস প্লেট খুলছেন?"

"আজ্ঞে না না। ওসব কিছুই করিনি আমি।"

"তবে কি এই মাঘ মাসের শীতে এখানে এসেছেন হাওয়া খেতে? জানেন না মাত্র ক'দিন আগে এখানে একটা মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনা হয়ে গেছে?"

ভবনাথবাবু বললেন, "জানি। সেই ট্রেনে আমিও ছিলাম।"

"আপনিও ছিলেন? সে কী! আপনি মারা যাননি?"

"মারা গেলে তো আপদ চুকেই যেত মশাই। কিন্তু আমার বউ আর দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়েও সঙ্গে ছিল। তাদের কোনও খোঁজখবর না পেয়ে বড়ই চিন্তিত আছি। তাই আমি এখানে এসেছিলাম যদি কেউ তাদের কোনও একটা খোঁজখবর আমাকে দিতে পারে সেই আশায়।"

"অ। আপনি তা হলে সেই লোক।"

"কেন? আপনি আমায় চেনেন? আপনি কি তাদের খবর জানেন? বলুন না তারা কোথায়? তারা বেঁচে আছে তো?"

এ-কথার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু টর্চের আলোটা নিভে গেল।

প্রথম কিছুক্ষণ চারদিকে অন্ধকার দেখলেন ভবনাথবাবু। তারপর আলো-আঁধারের ধাঁধা কাটলে চোখের সামনে যাকে দেখতে পেলেন তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। ইনি তো সেই চেকারবাবু। যিনি বিনা টিকিটের যাত্রী জেনেও কিছু বলেননি তাঁকে।

ভবনাথবাবু হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন, "বলুন, আমাকে দয়া করে বলুন তারা বেঁচে আছে কিনা?"

চেকারবাবু ভবনাথবাবুকে বললেন, "আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"আপনার বউ আর ছেলেমেয়ের কাছে। তবে একটু তাড়াতাড়ি পা চালাবেন কিন্তু। আপনাকে পৌঁছে দিয়েই আমাকে ফিরতে হবে। আজও আমার নাইট ডিউটি কিনা।"

ভবনাথবাবু সেই অন্ধকারে রেলের স্লিপারে পা দিয়ে চেকারবাবুর পিছু পিছু এগিয়ে চললেন। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর মাঠে নামলেন দু'জনে। মাঠে নেমেও খানিক গিয়ে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন চেকারবাবু। তারপর দূরের একটা কলাবনের দিকে টর্চের আলো ফেলে বললেন, "ওই যে দেখছেন কলাবাগান, ওইখানেই আমার বাড়ি। আমি আর বাড়ি পর্যন্ত যাব না। আমাব দেরি হয়ে যাবে। আপনার বউ এবং ছেলেমেয়ে ওইখানেই আমার মায়ের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। যান, চলে যান।"

ভবনাথবাবু সেই অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর মনে কেমন যেন সন্দেহ হল। কেননা তাঁকে বাড়ি দেখিয়ে দেওয়ার পর চেকারবাবুর আর কোনও অস্তিত্বও দেখতে পেলেন না তিনি। তবে কি তিনি ভূতের পাল্লায় পড়লেন? তাঁর সারা গায়ে কাঁটা

দিয়ে উঠল। এ কোথায় এলেন তিনি? জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই এখানে।

যাই হোক, তবু তিনি সাহসে ভর করে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে সেই কলাবাগানের কাছে এসে একটি মাটির ঘরে আলোর রেখা দেখতে পেলেন। আশপাশে আরও দু-একটি মাটির ঘরও রয়েছে। একটি ঘরের ভেতর থেকে এক মহিলার বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার শব্দ তিনি শুনতে পেলেন। ভবনাথবাবু থমকে দাঁড়ালেন সেখানে। তারপর আস্তে করে বললেন, "বাড়িতে কে আছেন?"

বলার সঙ্গে সঙ্গে কান্না থেমে গেল।

অমনই শুনতে পেলেন তাঁর ছেলেমেয়ে দুটির গলা, "ওমা! বাবা এসেছে। মাগো—।"

ভবনাথবাবুর বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এসে ভবনাথবাবুকে দেখেই আনন্দে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন, "তুমি বেঁচে আছ? আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি আবার তোমাকে ফিরে পাব বলে।"

ভবনাথবাবু ছেলেমেয়ে দুটিকে বুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

এক বৃদ্ধা ঘরের ভেতরে মাদুর পাতা বিছানায় শুয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল। বলল, "কে গো বউমা? তোমার উনি কি ফিরে এলেন?"

"হ্যাঁ মা।"

বৃদ্ধা এবার চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলল, "সবার সবাই তো ফিরে এল মা, আমার খোকা কবে ফিরে আসবে? খোকাই যে আমার সব। সে ছাড়া আমি কী করে বাঁচব গো?"

ভবনাথবাবুর স্ত্রী আঁচলের খুঁট দিয়ে বৃদ্ধার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধা বলল, "দাও, ছেলেকে খেতে দাও মা। গরিবের ঘরে যা আছে, দুটি দাও।"

ভবনাথবাবুর স্ত্রী ভবনাথবাবুকে হাত মুখ ধোওয়ার জল দিয়ে একটি বাটিভর্তি মুড়ি কলা দুধ গুড় ধরে দিলেন।

ভবনাথবাবু তৃপ্তির সঙ্গে সবকিছু খেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ছেলেমেয়ে দুটিও বাবাকে পেয়ে আনন্দে ছুটোছুটি করতে লাগল।

এর পর ভবনাথবাবুর স্ত্রী উনুনে আঁচ ধরিয়ে আবার রাতের খাওয়ার তোড়জোড় করতে লাগলেন। এইভাবে আপনজনকে ফিরে পেয়ে তাঁর আনন্দের আর অবধি নেই।

ভবনাথবাবুর মন ভরে উঠল গভীর প্রশান্তিতে।

খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রিবেলায় শুয়ে শুয়ে সে-রাতের মর্মান্তিক ঘটনার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। ভবনাথবাবুর স্ত্রী বললেন, ট্রেন দুর্ঘটনার রাতের কথা তাঁরও কিছু মনে নেই। যখন সকাল হল তখন দেখলেন বহু লোক উদ্ধারকার্যে নেমেছে। ছেলেমেয়ে দুটি তাঁর বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে কাঁদছে। আহত লোকদের লরি করে হাসপাতালে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং নিহতদের দাহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেখানে তোমার খবর কেউই দিতে পারল না। কিছু লোক আমাদের নিয়ে এসে এই বাড়িতে তুলল। কেননা এই বুড়ির একমাত্র ছেলে রেলের চেকার। এবং দুর্ঘটনায় সেও মারা গেছে। বুড়িকে অবশ্য বলা হয়নি সে-কথা। আমরাও নিরাশ্রয়। তাই বুড়ির দেখাশোনার জন্য এখানে এসে উঠেছি। বুড়িকে অবশ্য বলা হয়েছে ওঁর ছেলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মৃত্যুসংবাদটা এখনও দেওয়া হয়নি। কিন্তু তবুও মায়ের প্রাণ তো! হয়তো সবই বুঝতে পারে।

ভবনাথবাবু আর কোনও কথা বললেন না। কীভাবে তিনি এখানে এসেছেন সে-কথাটা একেবারে চেপে গেলেন। শুধু চারদিকে খোঁজখবর নিতে নিতে যে এখানে এসে পড়েছেন

সেই কথাটাই শুনিয়ে দিলেন। এবং এও শুনিয়ে দিলেন যে, কাল সকালেই তিনি সবাইকে নিয়ে আবার হাওড়ার বাড়িতে ফিরে যাবেন। বুড়ির দেখাশোনা এখানকার প্রতিবেশীরাই করুক। তিনি থাকছেন না। তবে মনে মনে বুড়ির ছেলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কেননা তাঁর ধারণা ছিল ভূতেরা শুধু ভয়ই দেখায়। কিন্তু সুযোগ পেলে মানুষের উপকারও যে তারা করে, বুড়ির মৃত সন্তানের প্রেতাত্মাই তা দেখিয়ে দিল।



স্বর্গারোহণ পালা

খুব কম করেও পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

কলকাতার এক নামকরা যাত্রা কোম্পানি মেদিনীপুরের এক গ্রামে চলেছে তাদের দল নিয়ে যাত্রা করতে। তখনকার যাত্রাওয়ালারা আজকের মতো এমন লাক্সারি বাসে যাতায়াত করত না। চার-পাঁচটি গোরুর গাড়ি বোঝাই করে অভিনেতা ও দলের অন্যান্য লোকদের নিয়ে যাযাবরের মতো এক দেশ থেকে আর এক দেশে রওনা হত।

এই দলটিও চলেছে। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে, নদী নালা ডিঙিয়ে, বনজঙ্গল অতিক্রম করে চলেছে। দলের অধিকারী রাখহরি ভাণ্ডারী মহাশয় অত্যন্ত সদাশয় লোক। কোনও পার্টির কাছ থেকে দলের গাওনার জন্য বায়নানামা করার পর কথার খেলাপ করেন না। এবং নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা আগেই তিনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যান। কিন্তু এবারের যাত্রায় মনে মনে তিনি একটু প্রমাদ গণলেন। গন্তব্যস্থল এখনও সাত ক্রোশ দূর। অথচ আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ। ঘন মেঘমালায় আকাশ ভরে আছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গোরুর গাড়ি যদি রেলগাড়ির মতো ছোটে তা হলেও তিনি দুর্যোগ এড়িয়ে পৌঁছতে পারবেন না। একেবারে নামে নামে অবস্থা। তবু তিনি চালকদের গাড়ির গতি দ্রুত করতে বলে শঙ্কিত চোখে আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন।

দলের লোকেরাও চিন্তিত হয়ে পড়ল খুব। সত্যিই তো, এইভাবে যাওয়া যায় কী করে! তারা বলল, "অধিকারী মশাই, এবার বোধ হয় আমাদের দলের মান আর রইল না।"

অধিকারী বললেন, "সে বললে তো হবে না ভায়া। যত দুর্যোগই হোক, যেতে আমাদের হবেই।"

"তা তো হবেই। কিন্তু যাবেন কী করে? এ যা অবস্থা দেখছি, এখানেই না আটকা পড়তে হয়!"

"জয় গুরু জয় গুরু। দেখা যাক কী আছে কপালে! একে আষাঢ় মাস, তায় আকাশের এই অবস্থা।"

"ওরা কি এই বর্ষাকাল ছাড়া যাত্রা করাবার সময় পেল না?"

"সে বললে কি হয়? গ্রামগঞ্জের ব্যাপার। চাঁদা তুলে টাকাপয়সা জোগাড় করবে তবে তো? বোশেখ মাসে হরিসভা দিয়েছিল, তখনই যাত্রা হওয়ার কথা। কিন্তু টাকাপয়সার জন্যই পিছিয়ে গেল। তাই এই অসময়ে হচ্ছে। ওদের বড় আশা, আমাদের দলের যাত্রাগান শুনবে। তাই দোনোমনো করেও বায়নাটা নিয়েই নিলাম।"

"কিন্তু আকাশ যেরকম করছে তাতে...।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এ যেন প্রলয়ের পূর্বাভাস।"

বলতে বলতেই ঝড় উঠল। সে কী দারুণ ঝড়। গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। গাছ ওপড়াল। গোরুর গাড়ির ছতরি উড়ল। ধুলোয় কুটোয় ভরে গেল চারদিক। ঝড় আর জলের

দাপট মূর্তিমান বিভীষিকার মতো দেখা দিল। সামাল সামাল রব উঠল চারদিকে।

এদিকে যে গ্রামে যাত্রা হওয়ার কথা, তারাও তখন হায় হায় করছে। শুধু কি এই গ্রামের লোক? ভিন গাঁ থেকেও দলে দলে লোক সকাল দুপুর থেকে চাটাই মাদুর থলে বিছিয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে কলকাতার পেশাদারি দলের যাত্রা শোনবার জন্য। রাত দশটার মধ্যে যাত্রাপার্টির আসবার এবং বারোটায় যাত্রা আরম্ভ করবার কথা। তার জায়গায় এ কী হল?

যাই হোক দুপুরের পর থেকে আরম্ভ হয়ে একটানা সেই দুর্যোগ রাত ন'টা নাগাদ কেটে গেল। চারদিকে কাদায় কাদা। নিচু জায়গাগুলো জলে ডুবে গেছে। কোথাও বা পথের ওপর দিয়ে জলস্রোত বইছে। শামিয়ানা ছিঁড়ে কাদায় মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে একপাশে। সবাই বিষণ্ণ মনে বসে বসে ভাবছে—তাই তো, যাত্রা হোক বা না হোক সেটা বড় কথা নয়। এই অজ গ্রামে আসতে গিয়ে অতবড় দলের লোকজনগুলোর কী অবস্থা হল? তারা যে কোথায় কতদূরে কীভাবে আছে তাই-বা কে জানে? সবাই মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল, দেখো ঠাকুর যেন দলটির কোনও ক্ষতি না হয়। যাত্রা আজ না হয় কাল হবে। কিন্তু মানুষগুলো যেন প্রাণে বাঁচে।

গ্রামবাসীরা এইরকম সব চিন্তা করছে এমন সময় দেখা গেল পর পর পাঁচটি গোরুর গাড়ি কাদায় মাখামাখি অবস্থায় এসে থামল বারোয়ারিতলায়।

সকলে হইহই করে হ্যাজাক লণ্ঠন নিয়ে ছুটল সেখানে।

অধিকারী মশাই ভুঁড়ি দুলিয়ে নেমে এলেন গোরুর গাড়ি থেকে।

গ্রামবাসীরা অবাক! বলল, "এই দুর্যোগে আপনারা এলেন কী করে?"

"কেন! না আসবার কী আছে? আমার নাম রাখহরি ভাণ্ডারী। কথার খেলাপ আমি করি না। দুর্যোগে কষ্ট পেয়েছি ঠিকই, তবে ওসব আমাদের গা সওয়া। এখন আপনারা অনুমতি দিলেই যাত্রা আরম্ভ হবে।"

এর আবার অনুমতি! চোখের পলকে বারোয়ারিতলা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। হ্যাজাক লণ্ঠনের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল চারদিক। যাত্রার কনসার্টের ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল গ্রামখানি। কী আনন্দ! কী আনন্দ। সেই আনন্দময় পরিবেশে যাত্রা শুরু হল। অগণিত দর্শক মুগ্ধ চোখে যাত্রা দেখতে লাগল। কেউ দুঃখে কাঁদল, কেউ-বা আনন্দে হাততালি দিল।

ক্রমে রাত শেষ হয়ে এল।

যাত্রা শেষ হয়ে এল।

কিন্তু এ কী! এও কি সম্ভব!

শেষ দৃশ্যে নরবলি আছে। এরা যে সত্যি-সত্যিই একটা লোককে হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে নরবলি দিল। তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেন। এঁদের আশীর্বাদে সেই কাটা মুণ্ডু আবার জোড়াও লেগে গেল। বিস্মিত অভিভূত দর্শকরা ভেবেও পেল না এসব কী হচ্ছে। এরকম সাংঘাতিক পালা এর আগে আর কখনও দেখেনি তারা। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। ব্রহ্মা বর দান করে আসরের মাঝখান থেকে হাউইয়ের মতন উড়ে স্বর্গে চলে গেলেন। ব্রহ্মার পর বিষ্ণু আর মহেশ্বর। মাটি ছেড়ে তাঁদেরও দেহটা ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল। শুধু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নন। অন্যান্য কুশীলবরাও ওইরকম একই ভাবে স্বর্গারোহণ করলেন।

দর্শকদের তো তখন মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। যাঃ বাবা। এসব আবার কী কাণ্ড!

এইসব ঘটতে ঘটতে ভোরের আলো ফুটে উঠল। আর ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট পার্টির লোকগুলোও কীরকম যেন আবছা হয়ে যেতে লাগল। আর কনসার্টের সুরও মনে হল ক্রমশই যেন দূরে, বহুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই এক সময় সুরও মিলিয়ে গেল, লোকগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন সকালবেলায় দেখা গেল পাঁচটি গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে একটি যাত্রার দল আসছে। গোরুর গাড়িগুলো বারোয়ারিতলায় এসে থামতেই অধিকারী মশাই হাতজোড় করে এসে বললেন, "হে সজ্জন গ্রামবাসীগণ, আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। জীবনে এই প্রথম আমি কথার খেলাপ করলাম। কাল পথিমধ্যে ভয়ংকর দুর্যোগে পড়ে আমরা বহু চেষ্টা করেও আসতে পারিনি। তবে আসতে যেমন পারিনি তেমনই ওই একই টাকার অঙ্কে পর পর দু'রাত আমরা আপনাদের গ্রামে যাত্রাগান করব। আশা করি আপনারা সবাই খুব খুশি হবেন?"

গ্রামবাসীরা কী যে বলবে আর কী করবে তা ভেবে পেল না। বলল, "সে কী মশাই! আপনারা তো কাল ঠিক সময়েই এসেছিলেন। সারারাত ধরে অভিনয় করলেন। তারপর শেষরাতে ভেলকি লাগিয়ে চলেও গেলেন। আবার এখন এসেছেন হেঁয়ালি করতে? বলি ব্যাপার কী?"

অধিকারী বললেন, "দেখুন মশাই, বাজে কথা বলবেন না। আমি হলুম সিংহরাশির জাতক। লোকের সঙ্গে হেঁয়ালি করার মতো মেজাজ আমার নেই। কাল রাতে দুর্যোগে আমরা আটকা পড়েছিলাম। এই সবে আসছি। সময়ে উপস্থিত হতে পারিনি বলে আপনারা আমাকে বিদ্রূপ করছেন? এই নিন আপনাদের বায়নার টাকা।" বলে গেঁজে থেকে টাকার থলিটা বের করে অধিকারী মশাই ছুড়ে দিলেন সকলের সামনে।

সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল, "থামুন, থামুন মশাই! আপনি হলেন স্বনামধন্য লোক। আমাদের গ্রামে আপনার মতো লোকের পায়ের ধুলো পড়েছে বলে আমরা গর্বিত। আমরা কখনও আপনার মতো লোককে বিদ্রূপ করতে পারি? আপনি বিশ্বাস করুন, অত দুর্যোগেও কাল রাত্রে গ্রামে যাত্রা হয়ে গেছে। এবং আপনার দলই করেছে।"

"তা কী করে সম্ভব!"

"বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন। আপনার অভিনেতারা কে কীসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তা আমাদের গ্রামের যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।"

অধিকারী ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, "বেশ, বলুন তো দেখি?"

গ্রামবাসীরা বলল, "ওই তো উনি ব্রহ্মার পার্ট করেছিলেন। উনি হয়েছিলেন বিষ্ণু। উনি মহেশ্বর। আর ওই যে উনি, ওঁকেই তো বলি দেওয়া হয়েছিল। উনি হয়েছিলেন অমুক— উনি তমুক।"

অধিকারী বললেন, "আশ্চর্য! আমাদের এই পালা হচ্ছে এ মরশুমের নতুন পালা। এ তো আপনাদের জানবার কথা নয়। অথচ আপনারা যে যা বলছেন, সবই ঠিক—উনি আমাদের দলে ব্রহ্মা সাজেন, উনি বিষ্ণু, উনি মহেশ্বর। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কাল রাতে আমরা আসতে পারিনি। আমরা দারুণ ঝড়জলে এখান থেকে সাত ক্রোশ দূরে হরিদাসপুর গ্রামে আটকে পড়েছিলাম। আপনারা ইচ্ছে করলে ওখানকার ভুবন মালাকারের বাড়িতে একজন লোককে পাঠিয়ে খবর নিয়ে আসতে পারেন।"

গ্রামের লোকেরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল, "হরিদাসপুর গ্রাম! ভুবন মালাকার!"

অধিকারী বললেন, "হ্যাঁ। হরিদাসপুর গ্রাম। ভুবন মালাকার। কাল ওই দুর্যোগের রাতে ওই গ্রামের লোকেরা ভুবন মালাকারের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাদের না তুললে সারারাত কী দুর্গতি যে হত আমাদের, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। অমন অতিথিবৎসল গ্রাম আমি দেখিনি। অতগুলো লোককে পেটভরে খাইয়ে দাইয়ে রাত শেষ হওয়ার আগেই আমাদের সড়কে পৌঁছে দিয়ে আপনাদের গ্রামে আসার সহজ পথটি দেখিয়ে না দিলে আজও বিকেলের আগে এখানে আমরা আসতে পারতাম না।"

অধিকারীর মুখে সব শুনে গ্রামের লোকেরা তো থ। বলল. "আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে কলেরার মহামারীতে ওই গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। হরিদাসপুরে এখন গ্রামের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু বন আর জঙ্গল।"

"আর ভুবন মালাকার?"

"ওই মহামারীর কবল থেকে তিনিও রক্ষা পাননি।"

"সে কী! কাল রাতে আমরা তা হলে ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম!"

"শুধু কি আপনারা? আমরাও যে কাল সারারাত জেগে কাদের যাত্রা দেখেছি তা এবার ভালই বুঝতে পারছি। উঃ কী সাংঘাতিক সেই যাত্রা। যাক, ভাগ্য ভাল যে, প্রাণে বেঁচে গেছেন। এখন বিশ্রাম করুন। তারপর রাত্রিবেলা মনের আনন্দে আপনাদের যাত্রা দেখব।"

অধিকারী বললেন, "না, রাত্রে নয়। যাত্রা আজ দুপুরেই হবে। তারপর রাত্রিটা বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালেই পালাব আমরা এখান থেকে। আর এ তল্লাটে নয়!"

অধিকারীর কথামতো তাই হল। দিনদুপুরেই খোলা আকাশের নীচে যাত্রা দেখল সকলে।

এই অলৌকিক যাত্রাপালার কথা প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শোনার পরও এখনকার লোকেরা হেসে উড়িয়ে দেয়। কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। বলে, এটা একটা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কিছুই নয়!



কী ভয়ঙ্কর রাত

১৯৫০ সালের কথা। আমরা তিন বন্ধুতে জুনপুট বেড়াতে গেছি। তখন এখনকার মতো এমন যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। কাঁথি থেকে গোরুর গাড়িতে অথবা পায়ে হেঁটে জুনপুট যেতে হত। আমরা তিনজনে খুব ভোর ভোর রওনা হলাম কাঁথি থেকে। ইচ্ছেটা জুনপুটের নির্জন সমুদ্রতীরে ঝাউবনের শোভা দেখব। জেলেদের মাছধরা দেখব। আর দু'দিনের ছুটি উপভোগ করে ফিরে আসব কলকাতায়।

জুনপুট এখনও ভাল করে গড়ে ওঠেনি। তখনকার অবস্থা তা হলে বোঝ। না ছিল হোটেল, না ছিল থাকার ব্যবস্থা, না কোনও কিছু। জঙ্গলময় একটি গ্রাম ছিল জুনপুট। গ্রাম থেকে সমুদ্রতীরের দূরত্বও ছিল প্রায় এক মাইল। আমরা কাঁথি থেকে মাইল পাঁচেক পায়ে হেঁটে যাওয়ার পর জুনপুটের সমুদ্রতীরে পৌঁছলাম।

আমাদের তিনজনেরই ছিল সেই প্রথম সমুদ্রদর্শন। সমুদ্রের বিশাল আকার দেখে আমাদের সে কী আনন্দ! তখন গ্রীষ্মকাল। এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢেউয়ের সে কী নাচুনি! তাই দেখে আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্রতীরের চনচনে রোদের উত্তাপ এড়াতে আমরা তটসংলগ্ন ঝাউবনে বসে নানারকম আলোচনা করতে লাগলাম।

আমাদের সমস্যা হল থাকার ব্যাপার নিয়ে। একটা রাত্রি অন্তত এখানে না থাকলে ঠিক মন ভরবে না। কিন্তু থাকব কোথায়? কাছেপিঠে থাকার মতো কোনও আশ্রয়স্থানই দেখতে পেলাম না। কয়েকজন মাঝিমাল্লা সেখানে ঘোরাফেরা করছিল। তাদের জিজ্ঞেস করতে কেউ কথার উত্তরই দিল না আমাদের। একজন শুধু বলল, "এখানে কেউ থাকে না বাবু। এখানে থাকার সেরকম ব্যবস্থা নেই। আপনারা কাঁথিতেই ফিরে যান।"

আমার সঙ্গে যে দু'জন বন্ধু ছিল তাদের একজনের নাম বিমান, অপরজনের নাম প্রশান্ত।

বিমান বলল, "দেখুন আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি সমুদ্র দেখব বলে। তা আপনাদের নৌকোতেই আমাদের একটা রাত থাকার ব্যবস্থা করে দিন না!"

মাঝি বলল, "আমরা সন্ধের আগেই এখান থেকে চলে যাব। তা ছাড়া বিশ্বাস করুন, এ জায়গা ভাল নয়।"

"কেন, চুরি ডাকাতি হয়?"

"না না। কার কী আছে যে, চুরি ডাকাতি হবে? অন্য উপদ্রব হয় এখানে, আপনারা থাকতে পারবেন না। কেউ থাকে না এখানে।"

বিমান বলল, "অন্য উপদ্রব মানে ভূতের উপদ্রব তো? তা হলে শুনুন, ভূতে আমরা বিশ্বাস করি না। আর ভূত বলে যদি কিছু থাকেও, তা হলে আমাদের উপদ্রবে তারাই পালাবে এখানে থেকে।"

মাঝিটা এবার গম্ভীর মুখে তাকাল আমাদের দিকে। তারপর খুব রাগত স্বরে বলল, "বাবু, আমার মাথার চুল পেকে গেছে। আপনারা এখনও ছেলেমানুষ। অনেক আচ্ছা আচ্ছা

লোককে দেখলুম আমি। ওনাদের সম্বন্ধে একটু ভেবেচিন্তে মন্তব্য করবেন। বুঝতে পারছি আপনাদের নিয়তিই আপনাদের মুখ দিয়ে এইসব বলাচ্ছে। তবু বলছি শহর বাজারে যা করেন এখানে কোনওরকম গোঁয়ার্তুমি করবার চেষ্টা করবেন না। এ বড় খারাপ জায়গা।"

বিমান বলল, "বেশ তো, পরীক্ষা হোক। আপনাদের কুসংস্কার বড়, না আমাদের সাহস।"

"যা ইচ্ছে করুন। আমি এখানকার ব্যাপার জানি বলেই সাবধান করে দিলুম আপনাদের। আর একটু পরেই পাড়ি দেব আমরা সাগর দ্বীপে। কেউ থাকব না এখানে, তখন মরবেন।"

প্রশান্ত বলল, "সাগর দ্বীপ এখান থেকে কতদূর?"

"তা দূব আছে বইকী! বরং চলুন আপনারা আমাদের গ্রামে।"

"তাই কি পারি? এই ঝাউবনে আজ রাত্রে ভূতের সঙ্গে ডান্স না করে কী করে যাই বলুন?"

মাঝি আর আমাদের সঙ্গে কোনও কথা না বলে পাশের একটি নৌকোর পাটাতনে উঠে ভাত খেতে বসে গেল।

আমরা তখন নিজেদের মনে সমুদ্র সৈকতে ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে দিঘামুখী হয়ে এগিয়ে চললাম। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর ঘন ঝাউবনের ভেতর হঠাৎ একটি দোতলা বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটা হাল আমলের নয়। বহু পুরনো। দেখে কোনও রাজবাড়ি বলে মনে হল।

আমি বিমানকে বললাম, "ওই দেখ বিমান।"

বিমান বলল, "তাই তো রে! বাড়ি এখানে কোত্থেকে এল?"

প্রশান্ত বলল, "এগিয়ে চল তো দেখি। যদি এখানে কোথাও একটু থাকবার ব্যবস্থা ম্যানেজ করতে পারি।"

এমন সময় আমাদের পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "ওটা ভূতের বাড়ি।"

আমরা পিছু ফিরে দেখলাম বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কুচকুচে কালো গায়ের রং। পরনে হাফপ্যান্ট। সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসছে।

বিমান বলল, "তুমি কে বাবা, ঝাউবনের কেলেমানিক? তুমি নিজেই একটা ভূত নও তো?"

ছেলেটি বলল, "আমার নাম কেলেমানিক নাকি? আমার নাম তো বিশু।"

"তা বিশুই হও আর শিশুই হও, ওই বাড়িটা কাদের?"

"রাজাদের। ও বাড়িতে এখন কেউ থাকে না। ওটাকে সবাই ভূতের বাড়ি বলে। রাত্রে ওখানে কুকুর ডাকে। বন্দুকের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। নাচগান হয়।"

"বলিস কী রে! এত কিছু হয় এখানে?"

"হ্যাঁ গো। মিথ্যে কথা বলছি না।"

প্রশান্ত বলল, "আমরা ওই বাড়িতে এক রাত্রি থাকতে চাই।"

বিশু বলল, "কেউ পারে না তো তোমরা। শখ মন্দ নয়! ওঃ! কী বলে? আমার বাবা ওই বাড়ির বাগানের মালী ছিল, বাবাই থাকতে পারে না।"

"তুই কখনও থেকেছিস ওই বাড়িতে?"

"আগে বাবার সঙ্গে থেকেছি।"

আমি বললাম, "আমরা যদি এক রাত ওই বাড়িতে থাকি, তোর বাবাকে বলে একটু

থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবি আমাদের?"

"পারব। তবে এখানে কেউ থাকে না। যারা থাকে ভূতে তাদের গলা টিপে মেরে ফেলে।"

বিমান বলল, "গুল মারবার জায়গা পাসনি ব্যাটা? কেউ যদি থাকেই না তো ভূতে গলাটা টেপে কার? তোর?"

বিশু এ-কথার উত্তর দিতে পারল না।

প্রশান্ত বলল, "এই বাড়িতে থেকে তুই কাউকে মরতে দেখেছিস?"

"না।"

"তবে চল। তোর বাবার কাছে নিয়ে চল আমাদের। তোর বাবা ব্যবস্থা করে দিলে এই বাড়িতেই আমরা রাত্রিবাস করব আজ।"

বিশু আমাদের ওর পিছু পিছু আসতে বলে ঝাউবনের বাইরে এল। তারপর ডানদিকের পথ ধরে কিছুটা এগোতেই দেখা গেল একজন বুড়ো মতো লোক জঙ্গল থেকে ঘাস কেটে থলির বস্তায় পুরছে। বিশু বুড়োর কাছে গিয়ে কানে কানে কী যেন বলল।

বুড়ো তাড়াতাড়ি বস্তা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি ওই রাজবাড়ির বাগানের মালী ছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমরা জুনপুট বেড়াতে এসেছি। কিন্তু এখানে কোথাও থাকার জায়গা পাচ্ছি না। আপনি কি পারেন ওই বাড়িটাতে আমাদের এক রাত্রি থাকার ব্যবস্থা করে দিতে?"

"কেন পারব না? বাড়ির চাবি তো আমার কাছে। তবে কি জানেন, ও বাড়িতে থাকা উচিত নয়। ওটা ভূতের বাড়ি। ও বাড়িতে এক রাত কেউ থাকলে সে পাগল হয়ে যায়।"

"ওই বাড়িতে থেকে পাগল হয়ে গেছে এমন কাউকে আপনি দেখাতে পারবেন?"

"না।"

"তবে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন কেন?"

বুড়ো বলল, "তা আমি বলি কি বাবু, আপনারা কাঁথিতেই ফিরে যান। এখানে রাত্রিবাস করবেন না।"

প্রশান্ত বলল, "কেন, ওখানে কোনও দলের গোপন আড্ডা হয় বোধ হয়?"

"না বাবু। গভীর রাতে ও বাড়িতে আলো জ্বলে। নাচগান হয়। বন্দুকের শব্দ শোনা যায়।"

আমি বললাম, "গুষ্টির মাথা হয়।"

প্রশান্ত বলল, "তবে হ্যাঁ, তুমি চাবি দিলে আজ রাত্রে ও বাড়িতে সত্যিই আলো জ্বলবে। নাচগান হবে। বন্দুকের আওয়াজ অবশ্য শোনাতে পারব না। আর এও দেখে রেখো, এই শেষ রাত। আমরা তিনজনে আজ সারারাত ধরে এমন ভূতের নাচ নাচব যে আর কখনও ওই বাড়িতে ভূতের উপদ্রবই হবে না।"

বুড়ো বলল, "এক মিনিট দাঁড়ান আপনারা।" বলে, হনহন করে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এল একটা চাবির গোছা নিয়ে। বলল, "নিন চাবি। কাল কখন ফিরবেন আপনারা?"

"তা ধরুন ভোরবেলা।"

"ঠিক আছে। আমি এখানেই থাকব। না থাকি বিশু থাকবে। চাবিগুলো ফেরত দিয়ে

যাবেন। আর একটা কথা, ঘরের জিনিসপত্তরে দয়া করে হাত দেবেন না, বাগানের ফুল ছিঁড়বেন না।”

আমি বললাম, “না না, ওসব কিছু করব না আমরা।” তারপর বললাম, “আচ্ছা এখন তো বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। এখানে খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্থা করা যায়?”

“যান না, গ্রামে যান আপনারা। কোনও বাড়িতে টাকাপয়সা দিয়ে দেবেন, ওরাই রেঁধে দেবে। ফেরার সময় কারও কাছ থেকে একটা হারিকেন চেয়ে আনবেন।”

“আমাদের কাছে মোমবাতি আছে।”

“তা হলে তো খুব ভাল।”

আমরা চাবির গোছাটা সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই চলে গেলাম জুনপুট গ্রামে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে। এবং রাতের আহার সংগ্রহ করতে। যাওয়ার সময় দেখলাম সেই মাঝিরা তখন নোঙর খুলে সাগর দ্বীপে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমরা তাদের যাত্রাপথের দিকে চেয়ে থাকলেও তারা কিন্তু ফিরেও তাকাল না আমাদের দিকে।

গ্রামে গিয়ে আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে রাতের জন্য কিছু মুড়ি আর রসগোল্লা নিয়ে আবার সমুদ্র সৈকতে ফিরে এলাম। সমুদ্র এখন আরও অশান্ত। আরও উত্তাল। যত জোরে হাওয়া বইছে সমুদ্র ততই ফুলছে। আমরা বালুচরের গা ঘেঁষে ঝাউবনে ঢুকলাম।

বিশু আমাদের দেখেই ছুটে এল। তারপর আমাদের আগে আগে চলতে লাগল সে।

আমি বললাম, “কী রে ব্যাটা, বেশ তো মনের আনন্দে নাচতে নাচতে যাচ্ছিস। ভয় করছে না?”

বিশু বলল, “ভয় করবে কেন? আপনারা তো আছেন। তা ছাড়া দিনের বেলা ওখানে কিছু হয় না, ভূত আসে রাত্রিবেলা।”

“তোরা দিনের বেলা ঢুকিস ওখানে?”

“আমরা কোনও সময়ই ঢুকি না।”

যাই হোক, আমরা সেই পুরনো রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। বড় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত দোতলা বাড়ি। গেটের তালাটার অবস্থা দেখে মনে হল বেশ কয়েক বছর খোলা হয়নি এর দরজা। আমরা বহু কষ্টে তালা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ঘন ঘাস ও আগাছায় ভরে আছে চারদিক। আর চাঁপা, গন্ধরাজ ও ম্যাগনোলিয়ার গন্ধে ম ম করছে। আমরা ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। বাড়িটা বাইরে যেমন পোড়ো বলে মনে হয়, ভেতরে কিন্তু তা নয়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মনে হল দিনকতক আগে বুঝি কেউ এসে এখানে থেকে গেছে।

আমরা নীচের তলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। নীচে-ওপর মিলে মোট দশখানা ঘর রয়েছে এ বাড়িতে। বড় বড় ঘর। মাঝখানে একটি হলঘর।

বিশু বলল, “এটা রাজাবাবুদের জলসাঘর।”

আমি বললাম, “এই ঘর থেকেই তা হলে গানবাজনার আওয়াজ শোনা যায়?”

“হ্যাঁ।”

এই ঘরটি ছাড়া প্রায় সব ঘরই খাট আলমারি এবং নানারকমের দামি জিনিস দিয়ে সাজানো। খাটের ওপর পুরু গদি। দুধসাধা বেডশিট দিয়ে ঢাকা। যেন এইমাত্র পেতে রেখেছে কেউ। কোথাও এতটুকু ধুলোর আস্তরণ নেই।

বিমান বলল, “রহস্যটা বুঝতে পারছিস? আসলে ভূতটূত কিছু নয়। এই বাড়ি রীতিমতো

গোপনে ব্যবহার করা হয়। আর গ্রামের লোকেরা মনে করে ভূতের উপদ্রব হচ্ছে।”

বিশু বলল, “আপনারা বিশ্বাস করছ না তো? থাকো না রাত্রিবেলা, তারপর বুঝবে।”

প্রশান্ত বলল, “ভূত যদি থাকে তা হলে আমাদের সঙ্গে দেখা হবেই। আমরা আজ সারা রাত ধরে ভূতেদের সঙ্গে এই জলসাঘরে নাচগান করব। তারপর কাল সকাল হলেই ভূতগুলোকে ধরে সোজা নিয়ে যাব তোদের গ্রামে।”

আমি বললুম, “তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি বিশু? তা হলে দেখবি ভূতগুলোকে কী রকম জব্দ করব আজ।”

বিশু বলল, “না বাবা। দরকার নেই।”

বিমান বলল, “তুই থাকলে হত কি, তোকে দেখেই ভূত পালাত। যা কালো তুই! ভূতেরা বোধ হয় তোর চেয়ে ফরসা। ভূত এলেই আমরা তোকে দেখিয়ে বলতাম, এই দেখ তোদের বাচ্চাকে আমরা ধরে রেখেছি।”

বিশু বলল, “না, এ বাড়িতে কিছুতেই থাকব না।”

আমরা খাবারগুলো ঘরের ভেতর রেখে ওয়াটার বটলটা দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে আবার চললাম সমুদ্রতীরে। কেননা সন্ধে হতে এখনও অনেক দেরি। কী করব অতক্ষণ ওই বাড়িতে চুপচাপ বসে থেকে? বিশেষ করে সারাটা রাত যখন ওই বাড়িতে থাকতেই হবে আমাদের। তার চেয়ে সি-বিচে গিয়ে একটু ঘুরে বেড়ালে সমুদ্রের অনেক নতুন নতুন রূপ দেখতে পাব। ঝাউবনে ঝাউয়ের হাহাকার শুনতে পাব। আসলে সমুদ্রদর্শনের জন্যই তো আমাদের এখানে আসা।

সমুদ্রে এখন ভাটার টান। জল যত সরে যাচ্ছে ততই বিভিন্ন রকমের ঝিনুকের খোলার বহর দেখা যাচ্ছে। আমরা কাড়াকাড়ি করে সেইসব ঝিনুক কুড়োতে লাগলাম। এমন সময় দেখি আমাদের অদূরেই সেই নির্জন বালুচরে এক সুন্দরী মহিলা নিজের মনেই ঝিনুক কুড়িয়ে চলেছেন। দেখে বেশ বড় ঘরের বউ বলেই মনে হল। এ মহিলা এখানে এলেন কোত্থেকে?

হঠাৎ ঝাউবনের ভেতর থেকে এক স্মার্ট যুবককে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। তিনি আমাদের দেখে দূর থেকে বললেন, “এই যে ভায়ারা. শুনছেন?”

যাক, মহিলা তা হলে একা নন। আমরা তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম।

যুবক আমাদের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন, “আপনারা কি তারাই নাকি মশাই?”

“কারা?”

“মানে যারা নাকি ওই ভূতের বাড়িতে রাত কাটাতে চান?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“আপনারা কি সত্যিই ও বাড়িতে থাকবেন?”

“তা ছাড়া উপায় কী বলুন? এখানে সমুদ্রের ধারে ওই বাড়িটা ছাড়া আর তো রাত্রিবাসের উপযোগী কিছুই দেখছি না। এখন গ্রীষ্মকাল। ইচ্ছে করলে আমরা এই ঝাউবনে বা বালির চড়াতে রাত কাটাতে পারতাম। তবে ভয়টা তো ভূতের নয়। ধরুন যদি সাপে কামড়ায়। সাপকে ভয় করি। তাই সাহসে ভর করে ওই বাড়িতেই রাত কাটাব আমরা। তা ছাড়া এও একটা অ্যাডভেঞ্চার। ভূতের গল্প অনেক শুনেছি। কিন্তু ভূতকে চাক্ষুষ কখনও দেখিনি। তাই জেদের বশে থাকছি ওই বাড়িতে। ভূত যদি থাকেও, এই সুযোগে তাঁর দেখাটা পেয়ে যাব।”

যুবক উৎসাহিত হয়ে বললেন, "তা হলে ভাই একটা কথা বলব?"

"বলুন।"

"আজ রাত্রে ওই বাড়িতে আমাদেরকেও আপনাদের সঙ্গী করে নেবেন?"

"সে কী! ভয় করবে না আপনাদের?"

"আমরা দু'জনে হলে ভয় করত! কিন্তু আপনারা যখন আছেন তখন ভয় কী?"

আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, "দেখুন যতই সাহসে ভর করে থাকি না কেন, তবু আমরা তিনজন। আপনাদের পেয়ে আমাদেরও বুকে বল এল। আর কিছু না হোক, সারারাত গল্প করেও তো কাটাতে পারব।"

যুবক অদূরে ঝিনুক কুড়োতে ব্যস্ত থাকা মহিলাকে ডাকলেন, "স্বাতী, একবার শুনে যাও।"

মহিলা এক কোঁচড় ঝিনুক নিয়ে এগিয়ে এলেন।

"এঁরাই সেই তিনজন। যাঁরা ওই বাড়িতে রাত্রিবাস করতে যাচ্ছেন। আমি এঁদের রাজি করিয়েছি আমাদের সঙ্গে নিতে।"

মহিলা খুব খুশি হয়ে বললেন, "অজস্র ধন্যবাদ।"

আমি বললাম, "আপনার ভয় করবে না?"

"না ভাই। অত আমার ভূতের ভয় নেই। বিশেষ করে আপনাদের মতো ভাইদের সঙ্গে পেলে আমি এক রাত কেন দশ রাত ও বাড়িতে কাটাতে পারি।"

আমি বললাম, "খুব ভাল হল। আমরা অবশ্য কাল সকালেই কাঁথি চলে যাব। কিন্তু আমরা যে ওই বাড়িতে রাত্রিবাস করতে যাচ্ছি এ-কথা কে বলল আপনাদের?"

"সবাই বলছে। সবাই জেনে গেছে আপনারা আজ ওই বাড়ির অতিথি।"

এমন সময় বিশু এল ছুটতে ছুটতে, "আমি বলেছি গো।"

অদূরে মালীবুড়োকেও দেখা গেল। মালীবুড়ো ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে কাছে এসে বলল, "এই তো, এনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে দেখছি। তা ভালই হয়েছে। দল বেঁধে থাকুন। তবে আমি এখনও বলছি, যা করছেন ঠিক করছেন না।"

সূর্য তখন অস্ত গেল।

মালীবুড়ো বলল, "যান। একান্তই যাবেন যখন তখন এইবেলা চলে যান। আর দেরি করবেন না।"

বিশু হঠাৎ বলল, "বাবা আমি যাব ওদের সঙ্গে?"

মালীবুড়ো লাফিয়ে উঠল, "খবরদার! ওই বাড়িতে কেউ যায়? তুই যদি যাস তো আমার যেতে আপত্তি কী?"

বিমান হঠাৎ ধরে বসল, "আচ্ছা, কেন আপনারা অহেতুক ভয় পেয়ে এত ভীত হচ্ছেন। কবে কী হয়েছে তা কে জানে? আমরা এতজন যখন আছি তখন ভয় কী? আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছেন। তিনি ভয় পাচ্ছেন না, আর আপনি ভয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন? আপনি নিজে এক রাত থেকেই দেখুন না। তা হলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, ভূত আছে কি নেই।"

"কিন্তু বাবু, ওই বাড়ির ভেতর থেকে গানবাজনার আওয়াজ আমি নিজের কানে শুনেছি। একটা কুকুর কী সাংঘাতিক রকমের চিৎকার করে ডেকে ওঠে। রাতের অন্ধকারে ওই বাড়ির ভেতর আলো জ্বলে।"

"সেইজন্যই তো বলছি, আজ রাত্তিরে আমাদের সঙ্গে থেকে আপনি নিজের চোখেই দেখে আসবেন ওখানে কী হয় না হয়।"

মালীবুড়ো একটু ভেবে বলল, "আবার ওই বাড়িতে আপনারা আমাদের ঢোকাবেন? ঠিক আছে, আপনারা যান। আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে রাত্রে শোওয়ার সময় যাব।"

"যাক, পথে এসেছেন দেখছি, ভূত থাকলেও ভূত আপনার কী করবেটা শুনি? গলা টিপে মেরে ফেলবে এই তো? যদি মেরেই ফেলে, তাতেই বা হয়েছেটা কী? বলি, বয়স তো যথেষ্ট হয়েছে। আর কতদিন বাঁচবেন?"

মালীবুড়ো বলল, "যান। তাড়াতাড়ি যান। ফটকটা খোলা রাখবেন। আমরা সময়মতো যাব।"

মালীবুড়োকে বিদায় দিয়ে আমরা পাঁচজনে ঝাউবনের ভেতরে সেই পোড়ো বাড়িতে এসে ঢুকলাম। সঙ্গে টর্চ ছিল। টর্চের আলোয় পথ দেখে দোতলায় উঠে পাশাপাশি দুটো ঘর নিয়ে নিলাম আমরা। বাতি জ্বাললাম।

মহিলা তো ঘর দেখে দারুণ খুশি, "অ্যাঁ! এমন চমৎকার ঘর। খাট বিছানা। রাজবাড়ি একটা। এরা বলে কিনা ভূতের বাড়ি! আমার তো মনে হচ্ছে সারাজীবন এইখানেই থেকে যাই।"

আমি বললাম, "সত্যি! কী সংস্কার বলুন তো মানুষের?"

এর পর আমরা গোটা বাড়িটাতে দাপিয়ে বেড়ালাম প্রায়। তারপর সিঁড়ির দরজা খুলে সবাই মিলে ছাদে উঠলাম। আঃ, কী শান্তি! মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ।

আমি রাতের নীরবতা ভেঙে হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম, "ভূত বাবাজি, আমরা আজ রাত্রে আপনাদের অতিথি। আপনারা কোথায়?"

মহিলা খিলখিল করে হেসে জোরে উত্তর দিলেন, "সাড়া দেব না।"

আমি হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বললাম, "তা বললে কী হয়? বলুন না কোথায়?"

মহিলা হেসে লুটোপুটি খেতে-খেতেই উত্তর দিলেন "আমি এইখানে। আপনাদের সামনে।"

"আপনার নামটা জানাবেন দয়া করে।"

"হ্যাঁ। আমার নাম স্বাতী।"

যুবকও অমনই হাসতে হাসতে বললেন, "আমার নামটাও জেনে নিন। আমার নাম অরুণকুমার।"

এবার আমরা সকলেই হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লাম। আমি বললাম, "যাক, আজ রাত্রে আমরাই তা হলে ভূতের ভূমিকায় অভিনয় করব।"

যুবক অর্থাৎ অরুণকুমার বললেন, "সত্যি, আপনাদের পেয়ে যে কী ভাল লাগছে আমাদের! না হলে আমরা দু'জনে তো হাঁফিয়ে উঠছিলাম।"

স্বাতীদি বললেন, "চলুন। বেশি রাত করে লাভ নেই। খাওয়াদাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। আমাদের টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি লুচি আর মাংস আছে।"

"আমরাও মুড়ি মিষ্টি নিয়ে এসেছি।"

স্বাতীদি ঠোঁট উলটে বললেন, "এ রাম! মুড়ি কে খাবে? মুড়ি আমি খেতে পারি না। তার চেয়ে মিষ্টিগুলো বরং কাজে লাগান। আপনারা বসুন। আমি টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে আসছি।"

আমি বললাম, "না না, স্বাতীদি। একলা যাবেন না। কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান। প্রশান্ত তুই বরং যা।"

"কোনও দরকার নেই। এত ভূতের ভয় করি না আমি। তা বলছিলাম কি, আপনাদের সঙ্গে খাবার জল আছে তো?"

"আছে। আমাদের ঘরে দেওয়ালের হুকে ওয়াটার বটলটা ঝুলিয়ে রেখে এসেছি।"

স্বাতীদি সিঁড়ির দরজার কাছে যেতেই আমি আবার বাধা দিলাম, "শুনুন, একলা যাবেন না কিন্তু।"

স্বাতীদি হেসে বললেন, "আমি একলাই যাব।"

আমি অরুণবাবুকে বললাম, "দাদা ওঁর কথা শুনবেন না। আপনিই বরং ওঁর সঙ্গে যান। বলা যায় না তো, যদি কিছু দেখে ভয়টয় পান।"

অরুণবাবু বললেন, "ঠিক।" বলে স্বাতীদির সঙ্গে গেলেন।

একটু পরেই সবকিছু নিয়ে ওপরে উঠে এলেন ওঁরা। তারপর ছাদে বসে বেশ জুত করে লুচি, মাংস আর রসগোল্লা খেলাম। খেয়ে জলটল খেয়ে ঘড়ি দেখলাম, রাত বারোটা।

স্বাতীদি বললেন, "আর ছাদে নয়। এবার নীচে চলুন। ওঃ, কী আনন্দের দিন আজ। আমার চোখে তো একটুও ঘুম আসছে না। চলুন, এবার আমরাই সারারাত ধরে গান গেয়ে, চেঁচিয়ে, হল্লা করে ভূতের উপদ্রব করি। এমন উপদ্রব করব যে, ভূত বলে যদি কিছু থাকেও, তারাও ভয়ে পালাবে।"

বিমান বলল, "ঠিক কথা।"

আমরা যেই উঠতে যাব অমনই কোথা থেকে একটা কেঁদো কুকুর এসে হাজির হল সেখানে।

স্বাতীদি লাফিয়ে উঠলেন, "ও মা! এ কী! এ কী! এখানে কুকুর এল কোথা থেকে?"

কুকুরটা তখন স্বাতীদির পায়ের কাছে এসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

প্রশান্ত বলল, "এই হচ্ছে তা হলে পোড়ো বাড়ির ভূত। রাত্রিবেলা চেঁচাবে আর লোকে ভাববে ভূতে ডাকছে।"

কুকুরটা এবার স্বাতীদিকে ছেড়ে আমাদের এঁটো পাতাগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর কড়মড় করে মাংসের হাড়গুলো খেতে লাগল চিবিয়ে। আমরা কুকুরটাকে ছাদে রেখেই সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে নেমে এলাম।

নেমে এসেই দেখি আমাদের ঘরের পাশে মালীবুড়ো আর বিশু চুপচাপ বসে আছে।

স্বাতীদি বললেন, "এই তোমরা এখানে কেন? যাও, নীচের ঘরে যাও। এখানে আমরা শোবো, হল্লা করব। সারারাত ঘুমোতে পারবে না তোমরা।"

আমি মালীবুড়োকে বললাম, "হ্যাঁ, স্বাতীদি ঠিকই বলেছেন। তোমরা নীচের ঘরেই যাও। নইলে আমাদের দাপাদাপিতে তোমরা অস্থির হয়ে উঠবে।" তারপর বিশুকে বললাম, "কী রে ব্যাটা, কেমন বুঝছিস?"

বিশু হেসে বলল, "আপনারা শহরের লোক। সাহস আছে আপনাদের।"

"যা, এবার নীচের ঘরে গিয়ে আরাম করে ঘুমোগে যা। ভয় পেলে ডাকিস।"

মালীবুড়ো হঠাৎ বলল, "জলসাঘরের দরজা খুলল কে?"

"আমরা খুলেছি।"

"ওটা এখুনি বন্ধ করে দিন।"

স্বাতীদি বললেন, "থাক না খোলা। আজ রাত্রে আমরাই যদি এখানে গানবাজনা করি?"

মালীবুড়ো স্বাতীদির কথার উত্তর না নিয়ে বলল, "এই ঘর অভিশপ্ত। এ ঘরের দরজা খুলবেন না। কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে চলে যান এখান থেকে।"

আমি বললাম, "না। আজ আর কোনও ঘরই বন্ধ নয়। সব ঘরের দরজাই খুলে দেব আমরা। এই বাড়ির অভিশাপ আজ আমরা কাটাবই।"

"আপনাদের এখানে থাকতে দেওয়াটাই আমার ভুল হয়েছিল। ঠিক আছে, যা ভাল বোঝেন করুন।" বলে মালীবুড়ো বিশুকে নিয়ে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে আমরা কেউ আর শোওয়ার ঘরে না ঢুকে জলসাঘরে ঢুকলাম। বিমান রসিকতা করে বলল, "এই তা হলে জলসাঘর! এই ঘরেই একসময় নাচগানের ফোয়ারা ছুটত? তা যারা সেসব করত তারা কোথায় লুকোলে বাবারা? শোনাও না একটু তোমাদের গানবাজনা?"

স্বাতীদি বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক কথা। এই পোড়ো বাড়িতে, আমরা যাদের অতিথি হয়ে এসেছি তারা কেন আমাদের সঙ্গে এইরকম করছে? যা হোক শোনানো উচিত।"

প্রশান্ত বলল, "যদি অশরীরী কেউ থাকো এই বাড়িতে, তা হলে আমি এক-দুই-তিন বলছি। তিন বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সাড়া দেবে। নইলে জানব এখানে কেউ নেই। সব ভাঁওতা।" বলেই প্রশান্ত হাঁক দিল, "এক-দুই-তিন।"

কিন্তু না। কোনও সাড়াশব্দই কোথাও থেকে এল না।

প্রশান্ত বলল, "তা হলে আমরাই শুরু করি। আজ রাতে জলসাঘর আবার ভরে উঠুক গানে গানে।"

একটা বাংলা সিনেমার গান দিয়ে শুরু হল। প্রথম লাইনটা প্রশান্ত ধরতেই সুরে সুর মিলিয়ে আমি কণ্ঠ দিলাম। তারপর বিমান। বিমানের দেখাদেখি স্বাতীদিও সুরেলা গলায় গান ধরল। অরুণবাবুও চুপ করে রইলেন না। সবক'টা কণ্ঠ একত্রিত হয়ে জলসাঘর ভরিয়ে তুলল একেবারে।

গান শেষ হলে আমরা হো হো করে হেসে লুটিয়ে পড়লাম।

রাত তখন একটা।

প্রশান্ত বলল, "আর কি! এবার শুয়ে পড়া যাক।"

স্বাতীদি অবাক হয়ে বললেন, "ওমা, শোবে কী! শোওয়ার পরে যদি চুপি চুপি ভূতেরা আসে? আজ কোনও শোওয়া-টোয়া নয়। আজ শুধু রাত জেগে ভূতের জন্য অপেক্ষা করা।"

বিমান বলল, "ঠিক। শুলেই গোলমাল। তার চেয়ে আমি বলি কি, স্বাতীদি, আপনি একটা গান ধরুন। খুব ভাল গলা আপনার।"

স্বাতীদি বললেন, "একা একা শুধু গলায় কি গান হয়? বেশ হত যদি একটা হারমোনিয়াম থাকত।"

অরুণবাবু বললেন, "এই তো, ঘরের কোণে একটা হারমোনিয়াম রয়েছে দেখছি।"

স্বাতীদি বললেন, "কবেকার পুরনো। ওতে আওয়াজ বেরোবে?" বলে হারমোনিয়ামটা কাছে টেনে রিডগুলো টিপে দেখতেই সুরে সুরে ঘর ভরে গেল। হঠাৎ বিছে কামড়ালে যেমন হয় ঠিক সেইভাবে লাফিয়ে উঠলেন স্বাতীদি, "এ কী এ কী! আমার সারা গা জ্বলে যাচ্ছে কেন? আমার যেন কীরকম হচ্ছে। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার।"

অরুণবাবু উঠে গিয়ে স্বাতীদিকে ধরলেন, "না না ও কিছু নয়। কী কষ্ট হচ্ছে? আসলে সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছ। রাত জেগে হইহল্লা করছ। একটু শুয়ে থাকো, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু বললেই কি হয়? স্বাতীদির গলা থেকে একটা চাপা আর্তস্বর বেরিয়ে এল, "আ-আ-আঃ।"

সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিভে গেল। গোটা ঘর ভরে গেল অন্ধকারে। বাইরে চাঁপাগাছের ডালে একটা নিশাচর পাখি ডাকল। হঠাৎ ফুলের গন্ধে ভরা একঝলক মিষ্টি বাতাস বয়ে গেল আমাদের শরীরের ওপর দিয়ে।

পরক্ষণেই আলোয় ভরে উঠল গোটা ঘর।

কিন্তু এ কী! এ কী দেখছি আমরা!

দেখলাম জলসাঘরের মাঝখানে শলমা চুমকির পোশাক পরে রাজনর্তকীর সাজে সজ্জিতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বাতীদি। আমাদের দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসছেন। মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠনের আলোর বন্যা বইছে! একপাশে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রাজপোশাক পরে সুরাপাত্র হাতে অরুণকুমার। যেন রুপোলি পর্দার কোনও ছায়াছবির দৃশ্য দেখছি আমরা। স্বাতীদি আমাদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়েই পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে হাতে তাল দিলেন—তা থেই তা তা থেই। অমনই নেপথ্যে এক সুরেলা হারমোনিয়াম দ্রুত লয়ে বেজে উঠল। সেই সুরে সুর মিলিয়ে ওস্তাদি গানের সঙ্গে জলদে উঠল তবলার লহরা। তারপর ত্রিতাল ঠেকার তালে তালে শুরু হল নাচের ঘূর্ণি।

আমরা বিস্মিত, বিমূঢ়, স্তব্ধ।

হঠাৎ সেই নাচগানের মাঝখানে চেঁচিয়ে উঠলেন অরুণকুমার, "এ কী! তুমি! তোমাকে কে এখানে আসতে বলেছে? বন্ধ করো এই গান। নাচ থামাও। বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তুমি ঘরের বউ হয়ে...।"

স্বাতীদি বললেন, "না। শুনতেই হবে তোমাকে। আজ আমি সারারাত ধরে নাচব গাইব। আমাকে নাচতে দাও! আমাকে গাইতে দাও।"

"খবরদার বলছি। আমার কথা অমান্য করার পরিণাম কি তা জানো?"

"জানি। তুমি আমাকে গুলি করে মারবে, এই তো? মারো—মারো আমাকে। দেখব তোমার বন্দুকে কত গুলি আছে! এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই অরুণকুমার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দেওয়ালে আটকানো বন্দুকটা নিয়ে এসেই উঁচিয়ে ধরলেন স্বাতীদির দিকে।

আমরা চিৎকার করে উঠলাম, "আরে আরে! এ কী করছেন? আপনি কি সত্যি সত্যি গুলি করে মারবেন নাকি? অরুণবাবু!"

"সরে যাও। সরে যাও তোমরা। ওকে আমি শেষ করে দেব।"

ততক্ষণে বন্দুকের গুলি ছুটে গেছে।

স্বাতীদির বুক রক্তে ভেসে গেল। স্বাতীদি—আ-আ-আঃ করে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন।

বন্দুকের শব্দ শোনামাত্র ছাদের ওপর একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। হঠাৎ দেখা গেল কুকুরটা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাতীদির ওপর। এ কী করে সম্ভব! এ তো সেই কুকুরটা। যেটাকে আমরা ছাদে রেখে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে নেমে

এসেছি।

আবার গর্জে উঠল বন্দুক।

কুকুরটা আঁ-আঁ-আঁউ করে যন্ত্রণায় ককিয়ে স্থির হয়ে গেল।

অরুণকুমার হঠাৎ স্বাতীদির দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "এ কী! এ কী করলাম আমি। আমি কি সত্যি মেরে ফেললাম তোমাকে? স্বাতী, তুমি কথা বলছ না কেন?"

এইসব চেঁচামেচি আর বন্দুকের শব্দ শুনে মালীবুড়ো ও বিশু ছুটে এসেছে ওপরে। ভয়ে বিবর্ণ মুখে দরজার একপাশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মেঝেয় পড়ে থাকা রক্তাক্ত স্বাতীদির দিকে চেয়ে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেছে যেন।

অরুণকুমার চোখ লাল করে বললেন, "তোরা এখানে কেন। কী চাই তোদের? মজা দেখতে এসেছিস?"

আতঙ্কে থমথম করছে ওদের মুখ। মালীবুড়ো কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "এ কী করলেন দাদাবাবু! আপনি সত্যি সত্যি মেরে ফেললেন বউদিমণিকে?"

"স্টপ ইয়োর ওয়ার্ড। ন্যুইসেন্স। তোদেরকেও আমি গুলি করে মারব! এই বাড়ির একটি প্রাণীকেও জীবিত রাখব না আমি। যেমন করে স্বাতীকে মেরেছি, ঠিক সেইভাবেই তোদেরকেও মারব।"

মালীবুড়ো আর বিশু তখন চোখের পলকে ছুটে পালাল সেখান থেকে।

অরুণকুমার বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া করলেন ওদের, "কোথায় পালাবি বাছাধন?"

আমরা বিস্মিত, বিমূঢ়। কী যে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না তার। তবুও আমরা ছুটলাম ওদের পিছু পিছু। যে করেই হোক এই হত্যালীলা বন্ধ করতেই হবে।

বিমল বলল, "কী হচ্ছে অরুণবাবু? আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি? আপনি কি জানেন খেয়ালের বশে কী কাণ্ড করেছেন আপনি? আমরা সবাই যে একধার থেকে অ্যারেস্ট হয়ে যাব।"

অরুণকুমার তখন বারান্দার কাছে ছুটে গেছেন।

বিশু এক লাফে গেট পার হয়ে গেল। কিন্তু মালীবুড়ো পারল না। যেই না গেটের কাছে আসা অমনই ওপর থেকে শব্দ হল 'গুডুম'। মালীবুড়োর দেহটা ছিটকে পড়ল একটা ম্যাগনোলিয়া গাছের কাছে। কে জানে হয়তো এই গাছটা মালীবুড়োই একদিন যত্ন করে বসিয়েছিল নিজের হাতে।

অরুণকুমার এবার তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন। আমরাও নামলাম ওঁর পিছু পিছু।

অরুণকুমার গেট পেরিয়ে ছুটে চললেন ঝাউবনের দিকে।

আমরাও ছুটছি।

ওই তো বিশু, সেও ছুটছে প্রাণের দায়ে।

ওকে বাঁচাতেই হবে।

অরুণকুমারের বন্দুক আবার গর্জে উঠল।

অসহায় বিশুর কাতর আর্তনাদ শোনা গেল—আ-আ-আ।

অরুণবাবু ছুটে বিশুর কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে একবার দেখলেন ওকে। তারপর ওর বুকে একটা পা রেখে অল্প একটু চাপ দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "শেষ হয়ে গেছে। আর একটিই মাত্র গুলি অবশিষ্ট আছে। সেটা আমি নিজের জন্য রাখলাম।

আপনারা ছেলেমানুষ। তার ওপর আমাদের অতিথি। সেইজন্যই কিছু বললাম না। তবে ভবিষ্যতে এই বাড়িতে আর কখনও রাত্রিবাস করবার চেষ্টা করবেন না। যান চলে যান।"

আমরা অতিকষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলাম। ভোরবেলা গ্রামে পৌঁছে শুনলাম গতকাল আমরা বিশু, মালীবুড়ো, স্বাতীলেখা ও অরুণকুমার নামে যাদের দেখেছি তারা কেউ জীবিত নয়। ১৯৩০ সালের এক ভয়ঙ্কর রাতে কী এক অজ্ঞাত কারণে ওরা নাকি ওইভাবেই মারা গিয়েছিল।



আতঙ্কের রাত

সেদিন সকাল থেকেই মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। পথঘাট জলে ডুবে গিয়েছিল একেবারে। যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অফিস কামাই করে ঘরে বসে ছিলাম! হঠাৎ সন্ধেবেলা অবনী এসে হাজির। ওর চুল উসকোখুসকো। চোখ দুটো লাল। কতদিন দাড়ি কামায়নি। বললাম, "কী ব্যাপার রে?"

অবনী একটি কথাও না বলে আমার ঘরে ঢুকে সোফায় গা এলিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

অবনী আমার বন্ধু। ও একজন প্রেস ফোটোগ্রাফার। বিভিন্ন কাগজে ওর তোলা ফোটো ছাপা হয়। খুব স্মার্ট ও সুদর্শন যুবক। ত্রিবেণীতে গঙ্গার ধারে ওদের নিজেদের বাড়ি। সেখানেই থাকে এবং ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে।

অবনীর ওইরকম চেহারা দেখে বললাম, "তোর কী হয়েছে অবনী? এ কী চেহারা তোর!"

অবনী তার করুণ চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি বোধ হয় বেশিদিন বাঁচব না রে!"

"কেন, হঠাৎ এরকম মনে হওয়ার মানে?"

অবনী বলল, "তুই ভূত বিশ্বাস করিস?"

"না। তবে ভূতের নামে ভয় পাই। কিন্তু চাক্ষুষ দেখিনি বলে বিশ্বাস করি না।"

"বাড়িতে আমি একদম টিকতে পারছি না। আজ কিছুদিন হল আমার ঘরে অদ্ভুত সব কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। আমার এত ভয় করছে যে, মনে হচ্ছে আমি আত্মহত্যা করি।"

ওর কথায় শিউরে উঠলাম আমি। বললাম, "ছিঃ অবনী, ও-কথা মুখেই আনতে নেই। কাপুরুষের মতো আত্মহত্যা করতে যাবি কেন?"

অবনী হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, আমি পাগল হয়ে যাইনি তো?"

আমি বললাম, "মনে হচ্ছে তাই হয়েছিস। যাক তোর ভাই কী করছে?"

"সে মাস দুই হল দুর্গাপুরে চাকরি পেয়ে চলে গেছে।"

"তুই তা হলে বাড়িতে একা?"

"হ্যাঁ। কিন্তু বিশ্বাস কর, আজ কিছুদিন হল ও বাড়িতে আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না। আমার বড় ভয় করছে। ওখানে আমি প্রতি রাতে আর একজনের অস্তিত্ব অনুভব করছি।"

"কে সে!"

"তা জানি না। তবে সে যে অশরীরী তা আমি বুঝতে পারি।"

আমি নিজেই তখন স্টোভে জল গরম করে চা বসালাম। তারপর দু'বন্ধুতে চা খেয়ে একটু আয়েস করে গুছিয়ে বসলাম।

অবনী বলল, "আমি ভাবছি কিছুদিন তোর এখানে থাকব। তোর কোনও অসুবিধে হবে

না তো?"

"না না, অসুবিধে হবে কেন? তবে আমার মনে হয় তোর আমার কাছে থাকার চেয়ে আমারই বরং তোর ওখানে থাকা ভাল।"

"খবরদার। ওখানে কোনও মানুষ থাকতে পারে না। তুইও পারবি না। আমার মতো তুইও তা হলে পাগল হয়ে যাবি। আমি ভাবছি ও বাড়িটা বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে যাব।"

"তোর ভাই আপত্তি করবে না?"

"বোধ হয় না। ওকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। সামনের মাসে ও সোজা তোর এখানে চলে আসবে। তারপর এইখানে বসে আলোচনার পর যা হয় একটা কিছু ঠিক করে নেব।"

"ও বাড়িতে তোরা কতদিন আছিস?"

"ওটা তো আমাদের পৈতৃক বাড়ি। আমার বা আমার ভাইয়ের জন্মই ও বাড়িতে।"

"এর আগে আর কখনও ওরকম অস্তিত্ব অনুভব করেছিস?"

"না, কখনও না। এমনকী দিন পনেরো আগেও না।"

আমি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম। তারপর বললাম, "ঠিক কী কী হয় বল তো?"

অবনী একবার হাতের ঘড়িটা দেখল। তারপর বলল, "তুই যখন নিজেই যেতে চাইছিস তখন আমার মনে হয় আমার কথা না শুনে সবকিছু তোর নিজের চোখেই দেখা বা অনুভব করা ভাল। কেননা আমার সব কথা তুই বিশ্বাস করবি কিনা তা তো জানি না। তবে তুই গেলে আমি খুব খুশি হব। কেননা আমিও দেখতে চাই আমার ঘরে আর একজনের উপস্থিতি সত্ত্বেও ওইসব ঘটে কিনা। যদি যাস তো এখুনি চল। লাস্ট ট্রেনটা পেয়ে যাব তা হলে।"

আমি বললাম, "না। আজ এই দুর্যোগের রাতে নয়। কাল সকালে বরং যাব। তারপর দু-একদিন থেকে আবার তোকে সঙ্গে নিয়েই ফিরে আসব। যতদিন তোর ভাই না আসে ততদিন তুই আমার কাছেই থাকবি। এ অবস্থায় তোকে একা থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না।"

অবনী বলল, "তা হলে খুব ভাল হয় রে! আমার এখন মাথার ঠিক নেই। আমার ভাল-মন্দর ভার এখন তোর হাতেই ছেড়ে দিলাম। তবে এও জেনে রাখিস, আমি আর কোনওদিনই একা থাকতে পারব না। সবসময়ের জন্য আমার একজন সঙ্গী অবশ্যই চাই।"

এরপর আমরা দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে কাটালাম। আলুভাজা আর গরম লুচি খেয়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম দু'জনে। শোওয়ার পরেই ঘুম। ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে।

ঘুম থেকে উঠে অবনী বলল, "ওঃ, কতদিন যে এমন আরামে ঘুমোইনি! আমার তো একদম ইচ্ছে করছে না ওই অভিশপ্ত বাড়িতে ফিরে যেতে।"

আমি বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এসে বললাম, "তোর ওখানে যাওয়ার গাড়ি কখন?"

"সেই বেলা একটায়।"

"সে কী! সারাদিনে আর গাড়ি নেই?"

"না। একটা ছিল সকালে, সেটা এতক্ষণে ছেড়ে গেছে।"

তা যাক। বেলা একটার গাড়িই সই। দুপুরে খেয়েদেয়ে দু'জনে হাওড়া স্টেশনে এলাম। তারপর বারহারোয়া প্যাসেঞ্জারে তিনটের মধ্যেই ত্রিবেণী। সেখান থেকে রিকশায় চেপে গঙ্গার ধারে ওদের বাড়িতে। ছোট্ট দোতলা বাড়ি। অবনীর সঙ্গে আমাকে আসতে দেখে আশপাশের লোকেরা এবং দোকানদারবা চাপা গলায় ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করতে লাগল। আমি তখনকার মতো আড়চোখে সবকিছু দেখে নিলাম। তারপর অবনীদের বাড়িতে গিয়ে দোতলায় ওর শোওয়ার ঘরে ঢুকলাম। ওর ল্যাবরেটরি নীচে। একপাশে খোলা ছাদ। ওর ঘরের ভেতর থেকে গঙ্গা দেখা যায়। ছাদ থেকে শ্মশান।

অবনীর বাড়িতে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে চা-পর্ব শেষ করলাম। তারপর বললাম, "অবনী, আমি একবার আধঘণ্টার জন্য বাইরে যাচ্ছি। তুই একা থাকতে পারবি তো?"

অবনী বলল, "তা পারব। এখন দিনের বেলায় তো কোনও ভয় নেই। যা কিছু উপদ্রব রাত্রে। তুই কিন্তু বেশি দেরি করিস না।"

"না রে বাবা, না। তোকে একা রেখে আমি কখনও বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারি?"

আমি অবনীদের বাড়ি থেকে বেরোতেই পাশের বাড়ির একজন বয়স্কা মহিলা আমাকে ডাকলেন, "বাবা শোনো।"

আমি কাছে গেলে বললেন, "তুমি অবনীর কে হও?"

"আমি ওর বন্ধু হই। কেন বলুন তো?"

"তুমি এসেছ খুব ভালই হয়েছে। হঠাৎ কী যে হল ছেলেটার! মাঝরাত্তির হলেই চিৎকার করবে আর ঘরময় ছুটোছুটি করবে। আমার মনে হচ্ছে কেউ কিছু খাইয়ে দিয়ে মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে ওর। তুমি বাবা ওর ভাইকে একটা খবর দাও। আর পারো তো কোনও মানসিক রোগের ডাক্তার দেখাও।"

"আমি সেইজন্যই এসেছি মা।"

"বেশ করেছ বাবা। বেশ করেছ।"

ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি সেই দোকানগুলোর কাছে এলাম, যেখানে একটু আগেই ওকে দেখে সকলে ফিসফিস করে কীসব বলাবলি করছিল। আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম, "আচ্ছা আপনারা তো অবনীকে চেনেন, আমার বন্ধু হয়। একটু আগে আপনারা ওকে দেখে কীসব যেন ফিসফিস করে বলছিলেন। সেইজন্যই আমি আপনাদের কাছে এসেছি। কী ব্যাপার বলুন তো? আপনারা কি ওর মধ্যে কোনও ভাবান্তর লক্ষ করেছেন? আমি কিন্তু ওকে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ মনে করছি।"

দোকানের লোকেরা বলল, "হ্যাঁ। আমরাও ওকে হঠাৎ এইরকম হয়ে যেতে দেখছি। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন? ও প্রায় রাতেই চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায়।"

এমন সময় ওদের ভেতর থেকে একজন যুবক এগিয়ে এসে বলল, "দাদা, আমি এক রাতের একটা ঘটনার কথা বলব? শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। ভাববেন মিথ্যে কথা বলছি। আমার কথা এরা কেউ বিশ্বাস করে না। হাসে। মনে করে আমি বোধ হয় বানিয়ে বলছি।"

"বেশ তো, শুনিই না কী ব্যাপার?"

"শুনুন তবে। সেদিন রাতে অবনীদা যখন চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায় তখন আমি

আর ওর পাশের বাড়ির বিষ্টুদা ছুটে যাই। কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তাতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।"

"কীরকম!"

অবনীদা নীচের দরজায় খিল দিয়ে ওপরের ঘরের দরজাও বন্ধ করে শোয়। সেদিন অবনীদার চিৎকার শুনে আমি আর বিষ্টুদা ছুটে গিয়ে নীচের দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে থাকি। বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কা দেওয়ার পর দেখলাম দরজার খিলটা কে যেন খুলে দিল। আমরা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ওপরের দরজায় ধাক্কা দিলাম। অবনীদার সাড়া নেই। তারপর হঠাৎ যেন জাদুমন্ত্রবলে ওপরের ঘরের দরজাটাও খুলে গেল। আমরা ভেতরে ঢুকে দেখলাম অবনীদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই, যে বাড়িতে অবনীদা একা থাকে সে বাড়ির বন্ধ খিল আমাদের ধাক্কাধাক্কির পর খুলে দিল কে?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "স্ট্রেঞ্জ!"

যুবকটি বলল, "অথচ আমার বা বিষ্টুদার এই কথা এখানকার কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না।"

আমি বললাম, "দেখুন, আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক, আমি করছি। তাই বলছি, আজ রাত্রে আপনাদের ভেতর থেকে একজনও যদি কেউ আমাদের কাছে থাকেন তা হলে খুব ভাল হয়। আজ রাত্রে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই এখানে কী হয় না হয়।"

কিন্তু না। আমার কথায় রাজি হল না কেউ। সবাই বলল, "না দাদা। ও বাড়িতে রাত্রিবাস কিছুতেই করছি না। বলা যায় না যদি সত্যিই ভৌতিক ব্যাপার কিছু হয় তা হলে কার কোপ কার ঘাড়ে চাপে। তবে হ্যাঁ, যদি সেরকম ভয়াবহ কিছু দেখেন তা হলে চেঁচিয়ে ডাকবেন আমাদের। আমরা একজন নয়, সবাই ছুটে যাব। আর পারেন তো দরজার খিলটা খুলে রাখবেন।"

আমি 'আচ্ছা' বলে চলে এলাম।

আমি যখন ফিরে এলাম তখন দেখি অবনী ছাদের আলসের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি এসে বললাম, "কী রে, একা থাকতে ভয় করেনি তো?"

অবনী ঘাড় নেড়ে বলল, "না। তবে মনে খুব একটা সাহসও পাচ্ছিলাম না। তাই বন্ধ ঘরে না থেকে খোলা ছাদে এসে বসে আছি।"

"বেশ করেছিস। এখন চল দেখি গঙ্গার ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"কোথাও নয়। ওই দেখ, আকাশের অবস্থা! এই নামল বলে!"

"তা হলে চল ঘরে বসে রাতের খাওয়াটা তৈরি করা যাক।"

"কী খাবি বল?"

"স্রেফ ডিমের ঝোল আর গরম ভাত।"

আমরা দু'জনে ঘরে ঢুকে স্টোভ ধরিয়ে ভাত বসালাম। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হল। ভাত হয়ে গেলে ডিমসেদ্ধ বসাচ্ছি তেমন সময় শুরু হল প্রবল বর্ষণ। সে কী প্রচণ্ড বৃষ্টি! গতকালের রেকর্ড বৃষ্টিকেও যেন হার মানায়।

এরই মধ্যে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "অন্যদিন কি এমন সময় উৎপাত আরম্ভ হয়?"

"কোনও ঠিক নেই। কখনও সন্ধের পর থেকেই হয়, কখনও মাঝরাতে। অবশ্য তুই থাকার জন্য যদি না হয় তা হলে আলাদা কথা।"

আমি নিজের মনেই নানারকম কল্পনা করতে লাগলাম, এখানে কী ঘটে না ঘটে তাই নিয়ে। অবনী এখনও পর্যন্ত আমাকে কিছুই বলেনি।

রাত তখন দশটা। এ পর্যন্ত সময়টা বেশ নিরুপদ্রবেই কাটল। আমি আর অবনী একই তক্তাপোশে একই বিছানায় দু'জনে পাশাপাশি শুলাম। শুয়ে গল্প করছি, এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অবনী আমার কাছ ঘেঁষে সরে এসে বলল, "এইবার, এইবার সে আসবে। নিশ্চয়ই আসবে।"

"কে? কে আসবে?"

অবনী চিৎকার করে উঠল, "ওই। ওই তো সে। ওই দ্যাখ।"

আমি শুয়ে-শুয়েই জানলার দিকে তাকালাম। দেখলাম জানলার ঘষা কাচে ফ্রক পরা চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি কিশোরী মেয়ে এলোচুলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কঠিন গলায় বললাম, "কে তুমি!"

মেয়েটি নিরুত্তর।

এমন সময় ফুস করে একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ হল। তারপরই দেখা গেল টেবিলের বাতিটা জ্বলছে। এ ঘরে আমি আর অবনী ছাড়া আর কেউ তো নেই। তা হলে কে জ্বালল এই বাতি?

কে? কে সেই অশরীরী?

ততক্ষণে ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেছে।

আমরা দু'জনেই ভয়ে কাঠ।

চারদিক নিস্তব্ধ। নিঝুম। অবনী যেন নীল হয়ে গেছে।

আমার সারা শরীর ঘেমে উঠল।

এমন সময় দেখতে পেলাম একটা হাত সেই বাতিটা তুলে নিল। নিয়ে দরজার কাছ পর্যন্ত গেল। তারপর কোমল গলার একটি ডাক শোনা গেল, "এসো।"

আমি অবনীকে বললাম, "আয় তো, কোথায় নিয়ে যায় ও দেখি।"

অবনী বলল, "না না। খেপেছিস? ও আমায় রোজ ওইভাবে ডাকে। আমি যাই না।"

"আয়। আয় বলছি।"

"আমার বড় ভয় করছে।"

"ভয় কী? আজ তুই একা নয়। আমি তো আছি সঙ্গে। আয়।"

আমি প্রায় জোর করেই ওর হাত ধরে টেনে তুললাম। তারপর টর্চটা নিয়ে দরজার দিকে এগোলাম। দরজার খিল আপনা থেকেই খুলে দরজাটা দু'হাট হয়ে গেল।

আলো আমাদের পথ দেখিয়ে চলল।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল আলোটা। তারপর নীচের ঘরের দরজার কাছে গেল। যে ঘরে অবনীর ল্যাবরেটরি সেই ঘরের কাছে থামল আলোটা।

ঘরে তালা দেওয়া ছিল। তালাটা আপনিই খুলে গেল।

আমরা দু'জনেই ঘরে ঢুকলাম।

বাতিটা টেবিলের ওপর রেখে হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কারও অস্তিত্বও রইল না সেখানে।

আমি বললাম, "কী হল? কথা কও। কথা কইছ না কেন? বলো তুমি কে?"

অবনী যেন পাথর।

আমারও হাত-পা অবশ হয়ে আসছে।

এমন সময় শুনতে পেলাম সেই কিশোরীর কণ্ঠস্বর, "আমাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছ? আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে বন্দি করে রেখো না। তোমাদের দু'টি পায়ে পড়ি।"

আমি ভয়ে-ভয়েই বললাম, "কে তুমি!"

"আমি শ্যামা।"

"তুমি কোথায়? কে তোমাকে বন্দি করে রেখেছে?"

"আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? এই তো আমি। আমি এখানে।"

কণ্ঠস্বর শুনে ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই কিশোরীর জোৎস্নার মতো হালকা শরীর অন্ধকারে ফুটে উঠল। কী করুণ তার মুখ। সে একটু একটু করে তার ছায়া শরীর নিয়ে অবনীর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ড্রয়ার টেনে একটা খাম বের করে টেবিলের ওপর রাখল। রেখেই আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

আমি টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে খামটা খুলতেই তার ভেতরে এই কিশোরীর একটি ফুল সাইজের ফোটো দেখতে পেলাম। ফোটোর দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ দেখলাম ফোটোর ছবির মুখটা কীরকম যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

উঃ, কী বীভৎস দৃশ্য! আরও দেখলাম ছবির গলার ওপর একটা মোটা শক্ত দড়ির দাগ ফুটে উঠছে ক্রমশ। এক সময় ফোটোর ভেতর থেকে মেয়েটি চিৎকার করে বলে উঠল, "এখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? আমার কষ্ট হচ্ছে না বুঝি? আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না। তোমরা এখুনি এটাকে নষ্ট করে দাও। ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে আগুনে পুড়িয়ে দাও।"

আমি বললাম, "তা হলেই কি তোমার মুক্তি হবে?"

"হ্যাঁ। চিরতরে মুক্তি পাব আমি। আমি যে আমার অস্তিত্ব পৃথিবীতে কোথাও এতটুকুও রেখে যেতে চাই না।"

"কিন্তু কেন চাও না?"

"সে তোমাদের জানবার দরকার নেই। শুধু জেনে রেখো, যাদের ওপর অভিমান করে আমি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছি, তাদেরই দেওয়ালে ছবি হয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।"

আমি সঙ্গে-সঙ্গে ছবিটি ছিঁড়ে দেশলাই জ্বেলে পুড়িয়ে ফেললাম।

অবনীকে বললাম, "এই ফোটো তোর তোলা?"

"হ্যাঁ। বছর দুয়েক আগে তোলা। চুঁচুড়ার হরিবাবুর মেয়ের ছবি ওটা। ওর জন্মদিনে তুলেছিলাম। কিছুদিন আগে হরিবাবু কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার হাত দুটি ধরে মেয়ের ছবিটি চাইলেন। জানালেন, গত মাসে সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নিয়ে মেয়েটিকে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী খুব বকাবকি করেন। তারপরেই বিপর্যয়। মেয়েটি হঠাৎ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।"

"কিন্তু বছর দুই আগে যে ছবি তোলা হয়েছিল সে ছবি হরিবাবু এতদিন বাদে নিতে এলেন কেন?"

"বছর দুই আগে ছবিটা আমি তুলেছিলাম ঠিকই, তবে ছবি তোলার পর থেকে হরিবাবু টাকা দেওয়ার ভয়ে আমার সঙ্গে আর দেখা করেননি। আমিও ফোটোর নেগেটিভ ওয়াশ

করে রেখে দিয়েছিলাম। এখন মেয়ের স্মৃতিরক্ষা করবার জন্য হরিবাবু ডবল চার্জ দিয়ে ছবি নিতে এসেছেন। সম্পূর্ণ টাকা দিয়েও গেছেন। কিন্তু মুশকিল হল হরিবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেগেটিভটা কোথাও আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর নেগেটিভ পেলাম। কিন্তু নেগেটিভ থেকে এই ফোটো তৈরি করতে গিয়েই যত বিপত্তি। বারবার নেগেটিভের ভেতর থেকে, ফোটোর ভেতর থেকে মেয়েটি আমায় শাসাতে থাকে। ভয় দেখায়। সেজন্য নীচের ঘরে ঢোকাই আজকাল আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম।"

"সেই নেগেটিভটা আছে?"

"আছে।"

"দেখি।"

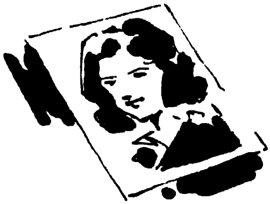
অবনী নেগেটিভটা আমার হাতে দিতেই আমি সেটাকেও অগ্নিদগ্ধ করলাম। তারপর ধীরে ধীরে টর্চের আলোয় পথ দেখে দরজা বন্ধ করে ওপরে এলাম।

সারারাত ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে অনেক গল্প করলাম দু'জনে। বৃষ্টির বেগও কমল। ভোরবেলা চা করে খেলাম। ভোরের আগে কারেন্টও এসে গেল।

অবনীকে বললাম, "আজ একবার সময়মতো হরিবাবুকে টাকাটা তুই ফেরত দিয়ে আসবি। কেমন? বলবি, নেগেটিভটা হারিয়ে গেছে।"

অবনী বলল, "নিশ্চয়ই।"

এর পরও অবনীর বাড়িতে আমি দিনদশেক ছিলাম। কিন্তু না। সে রাতের পর থেকে আর কোনও উপদ্রবই ও-বাড়িতে হয়নি। এখনও না।



পীরবাবার রাত

আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল রেলের চাকরি দিয়ে। বি. আর. আই. কে. জি. পি'র (ব্রিজ ইনস্পেক্টর, খড়্গপুর) আন্ডারে একটি ছোট পোস্টে চাকরি পেয়েছিলাম। আমাদের কর্মস্থল ছিল শালিমার। তবে মাঝেমধ্যে খড়্গপুর টাটানগর সিনি গিধনি ভদ্রকেও কাজকর্ম নিয়ে যেতে হত। কিন্তু সে যাওয়া নাম কা ওয়াস্তে। গেলুম, প্রচণ্ড গতিতে কাজ করলুম এবং ফিরে এলুম। ঘোরা, বেড়ানো কিছুই হত না। তাই একবার আমরা বন্ধুরা মিলে ঠিক করলাম কিছু না হোক এক রাত খড়্গপুরে সোমসাহেবের বাংলোয় গিয়ে কাটিয়ে আসব।

সাহেব প্রতি শনি-রবিবার কলকাতার বাড়িতে চলে আসতেন। আমরা সাহেবের অনুমতি নিয়ে এক রাত তাঁরই বাংলোতে থাকবার ব্যবস্থা করলাম। সঙ্গী ছিলাম চারজন। হিরু, আমি, রবি এবং মুন্না। তখন পৌষ মাস। কনকন করছে ঠাণ্ডা। আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ ট্রেনে চেপে খড়্গপুরের দিকে রওনা হলাম।

সন্ধের আগেই খড়্গপুরে পৌঁছলাম আমরা।

স্টেশন থেকে নেমে হাঁটাপথে আমরা যখন সোমসাহেবের বাংলোর দিকে যাচ্ছি তখন হঠাৎ বিনোদের সঙ্গে দেখা। বিনোদ আর আপ্পারাও ছিল সোমসাহেবের ট্রলিম্যান। এরা দু'জনেই আমাদের পূর্ব পরিচিত।

আমাদের দেখেই বিনোদ বলল, "আরে, কী ব্যাপার! আপনারা?"

আমরা ভেবেছিলাম বিনোদ বোধ হয় আমাদের খাতির করে নিয়ে যাবে বলে আসছে। তার জায়গায় এইরকম প্রশ্নে চমকে উঠলাম। বললাম, "কেন, তুমি জানো না? আমরা তো আজ রাত্রে সাহেবের বাংলোয় থাকব।"

"সাহেবের বাংলোয়? মাথাখারাপ নাকি? সাহেব আজ পর্যন্ত নিজের ছেলেকেই এখানে আসতে দেননি।"

"কিন্তু সাহেবের সঙ্গে তো কথা হয়ে গেছে। উনি অনুমতি দিয়েছেন।"

"ও। তা কই সেরকম কিছু তো উনি বলেননি আমাদের।"

"হয়তো বলতে ভুলে গেছেন।"

বিনোদ একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলল, "তা হলে তো মুশকিল হল।"

"মুশকিল কীসের? সাহেব চাবি দিয়ে যাননি?"

"না না, তা নয়। ডুপ্লিকেট চাবি তো আমার কাছে থাকে। কিন্তু আপনাদের অসুবিধে হয়ে যাবে খুব। ওখানে কি আপনারা থাকতে পারবেন?"

হিরু বলল, "কেন, কী ব্যাপার! থাকতে পারব না কেন?"

"সাহেব আজ ছুটির পর বাড়ি যাবেন বলে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু একটু আগেই স্টেশন থেকে ফিরে এসেছেন তিনি। সিনিতে ব্লক। জি. এম. আসবেন। তাই ভাবছি সাহেবের সঙ্গে ওই বাংলোয় আপনারা কী করে থাকবেন?"

আমরা চারজনেই লাফিয়ে উঠলাম শুনে, "অসম্ভব।"

কেননা সোমসাহেব অত্যন্ত ভারিক্কি এবং বদমেজাজি লোক। ওঁর স্ত্রী পুত্র পরিজনরাও বাঘের মতো ভয় করে সোমসাহেবকে। আর আমরা, যারা তাঁর অধীনে অনেক ধাপ নিচুতে কাজ করি আমাদের কাছে তো তিনি এক মূর্তিমান বিভীষিকা। বিশেষ করে আমাদেব সঙ্গে সাহেবের ফেস টু ফেস কথাও হয়নি। আমাদের সুপারভাইজার বলে-কয়ে রাজি করিয়েছিলেন সাহেবকে। এখন কোন সাহসে আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব? এবং গেলেও লাভ কি হবে? আশ্রয় তো পাবই না। উলটে হাজার রকম কাজের ফিরিস্তি চেয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন।

আমি বললাম, "না। যে লোকের চোখের দিকে তাকাতে সাহস হয় না, তার সঙ্গে একত্রে এক রাত এক আশ্রয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমরা অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছি। এক রাত একটু আনন্দ করে কাটাতে। কোথায় একটু হইহল্লা করব, এ ওর পেছনে লাগব, গলা ছেড়ে গান গাইব, কিন্তু এখানে আশ্রয় পেলেও সেসব তো হবেই না, উলটে চোরের মতো মুখ বুজে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে।"

বিনোদ বলল, "আমিও তাই বলি, আপনারা বরং অন্য কোথাও চলে যান।"

মুন্না বলল, "অন্য কোথায় যাব বলুন?"

"হয় হোটেলে উঠুন, নয়তো এখুনি বম্বে এক্সপ্রেস আসবার সময় হয়ে গেছে, ওই গাড়িতে চেপে আপনারা সোজা ঝাড়গ্রামে চলে যান। ঝাড়গ্রাম এর চেয়ে অনেক ভাল জায়গা। খুব ভাল লাগবে আপনাদের। ঘুরে বেড়িয়ে শান্তি পাবেন।"

বিনোদের কথায় আমাদের মন কিন্তু সায় দিল না। আমরা যখন কী করব, কী না করব ভাবছি তেমন সময় সাহেবের আর এক ট্রলিম্যান আপ্পারাও এসে হাজির, "এই যে! আপনারা সব এসে গেছেন দেখছি। কতক্ষণ এসেছেন?"

"সবে আসছি। কিন্তু তুমি কী করে জানলে আমাদের আসবার কথা?"

"সাহেবের মুখে এখনই শুনলাম। সাহেব বললেন, আমি সকালে বলতে ভুলে গেছি। ছোঁড়াগুলো এখুনি হয়তো হাজির হবে। ওদের আজ এখানে আসবার কথা। তা আমি যখন এখানে ফিরে এসেছি তখন ও চারটেতে তো এখানে থাকতে পারবে না। তার চেয়ে ওদের ইঁদায় ছেড়ে দিয়ে আয়।"

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। 'ইঁদায় ছেড়ে দিয়ে আয়' কী রে বাবা!

আপ্পারাও বলল, "চলুন আপনাদের ইঁদায় ছেড়ে দিয়ে আসি। ওখানে সাহেবের বোনের বাড়িতে আপনাদের নেমন্তন্ন। সাহেব ফোনে বলে দিয়েছেন ওঁদের।"

ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে ঠেকল আমাদের কাছে। সাহেবের বোনের বাড়িতে নেমন্তন্ন? যাদের কখনও চোখেই দেখিনি তাদের বাড়িতে কোন সুবাদে নেমন্তন্ন খেতে যাব?

বিনোদ বলল, "না না লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। সাহেব এমনিতে বদমেজাজি লোক হলেও সাহেবের মন কিন্তু ভাল। এখানে যখন থাকা হবে না, তখন ইঁদায় আপনাদের যেতেই হবে। কিন্তু ওখানে থাকতে পেলেও খাবেনটা কী? কোনও হোটেল তো নেই। সেইজন্যই ওই ব্যবস্থা। তবে ইঁদায় কি আপনারা থাকতে পারবেন?"

আমি এবার অধৈর্য হয়ে বলাম, "আচ্ছা সেই থেকে যে তোমরা ইঁদা ইঁদা করছ, ইঁদাটা কী?"

"ওমা! সে কী! ইঁদা জানেন না?"
"না। জানলে জিজ্ঞেস করি?"
হিরু বলল, "কোনও বাংলো জাতীয় কিছু নিশ্চয়?"
"উঁহুঁ। বাংলো হতে যাবে কেন? ইঁদা হচ্ছে এখানকার একটা জায়গার নাম। ভাল নাম ইন্দা। এর কাছেই পীরবাবা।"
"তা হলে তাই যাওয়া যাক।"
বিনোদ বলল, "তা তো যাবেন, কিন্তু—।" বলেই বলল, "আচ্ছা আসুন তো আগে। তারপর দেখা যাবে। এখন চলুন ওই দোকানটায় বসে একটু চা খাওয়া যাক।"
আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম সেখানে একটি চায়ের দোকান ছিল। বিনোদ আর আপ্পারাও আমাদের সেই দোকানে বসিয়ে চা-বিস্কুটের অর্ডার দিল।
বিনোদ বলল, "আসলে ইঁদায় যেখানে সাহেব আপনাদের পাঠাচ্ছেন সেখানে রাত্রিবাস করবার কথা আমি অন্তত আপনাদের বলতে পারব না।"
"সে কী! কেন?"
আপ্পারাও বিনোদকে বলল, "ওই বাড়িতেই যে সাহেব ওদের পাঠাচ্ছেন তার কি মানে? আগে বাড়িটা দেখা হোক। সাহেবের বোনের বাড়িতেও তো থাকতে দিতে পারেন।"
বিনোদ বলল, "না না। অত সস্তা নয়। ওরা সেই লোক নাকি? ওদেরই বলে থাকতে জায়গা কুলোয় না, আবার অন্য লোককে থাকতে দেবে। আর নেমন্তন্নর কথা বলছ? সে তো সাহেবের অনুরোধে। সাহেব নিশ্চয়ই ফোনে বলে দিয়েছেন যা খরচা হয় দিয়ে দেবেন।"
আমরা সব শুনে চা খেতে খেতে বললাম, "আপ্পাদা, আমাদের আর খড়্গপুর বেড়িয়ে কাজ নেই। আমরা পরের ট্রেনেই কাটছি। তুমি গিয়ে বরং সাহেবকে বোলো যে, আমরা আসিনি।"
বিনোদ বলল, "না না। সেটা ঠিক হবে না। অনেকক্ষণ ধরে আমরা এখানে বসে কথাবার্তা বলছি। যদি কেউ দেখে থাকে বা সাহেবের কানে ওঠে, তা হলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে। মিথ্যে কথা বলার জন্য আমাদের বকাবকি করবেন সাহেব। তা ছাড়া ওখানে আপনাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ওসব যদি নষ্ট হয় তা হলে না এসে কথার খেলাপ করার জন্য আপনারাও কি রেহাই পাবেন?"
সত্যি বলতে কি আমাদের সব আনন্দই তখন মরে গেছে। চা খেয়ে আমরা বিনোদ আর আপ্পারাওকে অনুসরণ করলাম। রাতের অন্ধকারে আমরা লাইন পেরিয়ে গোলবাজার হয়ে পীরবাবা ঘুরে ইঁদায় পৌঁছলাম।
ইঁদায় সাহেবের বোনের বাড়িতে আমাদের পৌঁছে দিয়ে বিনোদ, আপ্পারাও দু'জনেই বিদায় নিল।
সাহেবের বোন, ভগ্নিপতি দু'জনেই যথেষ্ট সমাদর করে বাড়ির বৈঠকখানায় বসালেন আমাদের। তারপর এ-কথা সে-কথার পর বললেন, "দেখো বাবারা, সাহেব তোমাদের এখানে তো পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে এই যে, আমাদের তো ভাড়াবাড়ি। নিজেদের থাকতে কুলোয় না। তোমরাও আবার একজন-দু'জন নও, চার-চারজন। কী করে থাকতে দিই বলো তো? তবে মাস ছয়েক হল কাছাকাছি আমরা একটা বাড়ি তৈরি করেছি। কিন্তু বাবা, ওই বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করে এক রাতও থাকতে পারিনি আমরা। সে এমনই উপদ্রবের বাড়ি যে, সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসতে পথ পাইনি। তোমাদের থাকার জন্য

সেই বাড়িটা আমরা ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু বাবা, তোমরা কি থাকতে পারবে সেখানে?"

আমি বললাম, "সাহেব জানেন, ওটা ভূতের বাড়ি?"

"তা আর জানে না? সবই জানে।"

"তা হলে উনি জেনেশুনে ওই বাড়িতে আমাদের থাকতে পাঠাচ্ছেন কেন?"

"সে-কথা তোমাদের সাহেবকেই জিজ্ঞেস কোরো। তবে বাবা, সাহেবকে তোমরা তো ভাল করেই চেনো? ও আবার ওসব ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না। আমরা যেই না বলেছি ওই ভূতের বাড়িতে ছেলেগুলো থাকবে কী করে, অমনই আমাদের একটা তেড়ে ধমক। বলল, ভূতের নিকুচি করেছে। আসলে তোমরা নিজেরাই ভূত। তাই নিজের বাড়ি ফেলে রেখে ভাড়াবাড়িতে বাস করছ।"

রবি বলল, "তা হলে ও বাড়িটা আপনারা বিক্রি করে দেননি কেন?"

"কে কিনবে? সবাই তো জেনে গেছে ও বাড়ির ব্যাপার।"

আমি বললাম, "আমরা চারজন আছি। পারব না একটা রাত ওখানে কাটাতে? কাল সকালেই আমরা ঘর ছেড়ে দেব। তারপর সারাদিন ধরে খড়্গপুরটা ঘুরে দেখে বিকেলের গাড়িতে চলে যাব কলকাতায়।"

"থাকতে পারলে তো ভালই। তবে কিনা যদি ভয় পাও তাই আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। পরে যেন বোলো না বাবা, আমরা তোমাদের বিপদে ফেলব বলে ওই ঘরে পাঠিয়েছি।"

আমরা তখন সবাই একমত হয়ে বললাম, "ঠিক আছে। একটা রাত বই তো নয়, আর চারজন যখন আছি তখন থেকেই দেখি না এক রাত। হয়তো একটু ভয়ডর পাব। তাই বলে সত্যি-সত্যিই ভূত এসে তো গলা টিপে মেরে ফেলবে না আমাদের!"

"দেখো বাবা। কী কুক্ষণেই যে জমিটা কিনেছিলুম, কত শান্তি স্বস্ত্যয়ন করালাম। কত কী করলাম, কিছুতেই কিছু হল না।"

"তা না হয় হল। বাড়ির ভেতরে হয়টা কী?"

"সে-কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না বাবা। যদি থাকো এক রাত তো বুঝবে।"

হিরু আর মুন্না এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সব শুনে বলল, "হল ভাল। কোথায় এলাম একটু আনন্দ করতে, তার জায়গায় ভূতের বাড়িতে থেকে পেত্নের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে? কী ঝকমারি করেই ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম আজ!"

"সবই কপাল।"

যাই হোক! আমবা সে রাতে সাহেবের বোনের বাড়িতে ভাজাভুজি ফুলকপির তরকারি লুচি আর ডিমের ডালনা খেয়ে নতুন বাড়িতে শুতে গেলাম। বাড়িটা ঠিক ইঁদায় নয়। পীরবাবায়।

সাহেবের ভগ্নিপতি নিজে গিয়ে আমাদের ঘরের চাবি খুলে ঢুকিয়ে দিয়ে এলেন। চমৎকার বাড়ি। নতুন। একতলা। ঘরে খাট বিছানা মশারি সবকিছুই আছে। জল কল ও বাথরুমের ব্যবস্থাও ভাল। এই বাড়িতে এসেই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমরা। হোক ভূতের বাড়ি, তবু বাড়ি তো! শান্তিতে থাকা যাবে। এই বাড়ি এবং ঘর যেন আমাদের সুখের স্বর্গ বলে মনে হল।

আমরা দরজায় খিল দিয়ে বিছানায় বসে বেশ মনের আনন্দে হইহুল্লোড় আরম্ভ করে দিলাম। মুন্না যতরকম হিন্দি সিনেমা দেখেছিল তার সব গান এক এক করে গাইতে লাগল।

প্রচণ্ড শীতের জন্য জানলা দরজা বন্ধই ছিল সব। এমন সময় মনে হল কে যেন বাইরে থেকে টকটক শব্দ করল জানলায়।

আমরা হট্টগোল থামিয়ে জানলা খুলেই দেখি এক বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোকে স্মিত হাসছেন আমাদের দিকে চেয়ে।

"কাকে চাই?"

"কাকে আবার? আপনাদেরকেই। কতক্ষণ এসেছেন আপনারা?"

"এই কিছুক্ষণ। কিন্তু আপনি কে?"

এবার আর আপনি নয়। 'তুমি'তে নেমে এলেন বৃদ্ধ, "ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখো তো আমার মুখের দিকে, আমাকে চিনতে পারো কিনা? আমি তায়জু সারেং।"

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম, "আরে, তায়জুদা! আসুন আসুন ভেতরে আসুন। আপনি যা দাড়ি রেখেছেন তাতে তো চেনাই যাচ্ছে না আপনাকে।" বলে দরজা খুলে দিলাম।

তায়জুদা আমাদের সিনিয়ার স্টাফ ছিলেন। বছর দুই হল রিটায়ার করেছেন। আমাদের আমন্ত্রণে ঘরের ভেতরে এসে বিছানায় বসে বললেন, "তারপর হঠাৎ কী মনে করে এখানে এসেছ তোমরা?"

"আমরা খড়্গপুর বেড়াতে এসেছিলাম তায়জুদা। কোথাও জায়গা না পেয়ে আজকের রাতটুকুর মতো এই বাড়িতে উঠেছি। কাল সকালেই চলে যাব। কিন্তু আপনি এখানে কেন?"

"আমার বাড়ি তো এখানেই। পীরবাবায়। আজ একটা বিশেষ কাজে লাইনের ওপারে গিয়েছিলাম। এমন সময় সোমসাহেবের সঙ্গে দেখা। ওঁর মুখেই তোমাদের আসার কথা শুনলাম। তোমরা সব কীভাবে আছো না আছো তা একবার দেখেও আসতে বললেন। তবে বাবা এই বাড়িতে তোমরা এক রাত কী করে কাটাবে তা ভেবে পাচ্ছি না! এ বড় দোষান্ত জায়গা। কবরখানার ওপর বাড়ি তো! ভীষণ উপদ্রব হয় এখানে। আমি সাহেবকে বললুম, এ আপনি ঠিক করেননি স্যার। আপনি জেনেশুনে ওদেরকে ওখানে পাঠালেন কী বলে? তা উনি তো এসব মানেন না। তাই বললেন, আরে ছেড়ে দাও তো। চার-চারটে ছোঁড়া রয়েছে। এক রাতের ব্যাপার। কে কী করবে ওদের? তবু বাবা আমি বুড়োমানুষ। সাহেব এসব না মানলেও আমি তো মানি। তাই বলছিলুম কি, তোমরা এখানে না থেকে বরং আমার বাড়িতে চলে এসো।"

আমি বললাম, "তায়জুদা, বাড়ি যখন আপনার কাছেই তখন আপনি নিজেই যদি এক রাত আমাদের কাছে থেকে যান, তা হলে খুব একটা খারাপ হয় কি? আপনার বাড়ি যখন এখানেই, তখন অসুবিধেরও কিছু নেই। আমরাও আপনাকে পেয়ে বর্তে যাই। না হলে এই শীতের রাতে এমন একটা সুন্দর আস্তানা ছেড়ে কোথাও যেতে মন চাইছে না আমাদের।"

তায়জুদা বললেন, "তোমরা তো বললে ভাল। আমি নিজে যেখানে তোমাদের থাকতে মানা করছি সেখানে আমি কী করে থাকি?"

"তা জানি না। যেভাবেই হোক, আপনি এখানে থেকে যান। প্লিজ।"

"তা হলে তো বাড়িতে একটু খবর পাঠাতে হয়।" বলে জানলার পাল্লাটা খুলেই এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখে কাকে যেন চেঁচিয়ে ডাকলেন, "কামাল! এই কামাল!"

একটি অল্প বয়সের ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এই ভূতের বাড়ির ভেতর থেকে রাত্তিরবেলা তায়জুদাকে তার নাম ধরে ডাকতে দেখেই ভূত দেখার মতো ভয় পেয়ে তেড়ে

দৌড় লাগাল সে।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

আমরা উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অবাক।

"এ কী! স্যার আপনি?"

দেখি না সোমসাহেব নিজেই এসে হাজির হয়েছেন এই রাতদুপুরে। যা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। বললেন, "এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো তোমাদের? তবে আগেই বলে রাখছি কারও কথায় কান দিয়ো না। ভূতপ্রেত কিছুই নেই এখানে। সব বাজে কথা। আসলে এখানে একটা পুরনো কবরখানা ছিল। এখন সেটা আর ব্যবহার করা হয় না। তার একটা অংশ বিক্রি হওয়ার সময় আমার বোন ভগ্নিপতি খুব জলের দামে কিনে নেয়। তারপর বেশ মনের মতো করে এই বাড়িটাকে তৈরি করে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই স্থানীয় অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মনে একটু ক্ষোভ দেখা দেয়। সেইজন্য ওদেরই ভেতর থেকে কিছু লোক নানাভাবে ভয়টয় দেখায়, যাতে এখানে কোনও লোক রাত্রিবাস করতে না পারে। আর এই তায়জুটা হচ্ছে একটা পাক্কা শয়তান। এই হচ্ছে ওদের দলের লিডার। এই সবাইকে উসকিয়ে ডেকে ডুকে আনে।"

তায়জুদা ফিক ফিক করে হেসে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, "হেঁ হেঁ। কী যে বলেন স্যার। আমি এই বুড়ো বয়সে...। আমার কি আর কোনও কাজ নেই? কেন মিছিমিছি আমার নামে বদনাম দিচ্ছেন?"

"থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না। তুমি কী চিজ তা আমি জানি। ওইজন্যই এদের খবরাখবর নেওয়ার জন্য তোমাকে পাঠালাম। একটু নজরে রেখো এদের। এক রাত থাকবে। যেন ভয়টয় দেখিয়ো না।"

আমি বললাম, "স্যার! তায়জুদাকে আমরা আজকের রাতটুকুর মতো এখানে থাকবার জন্য বলছি।"

"না। তোমরা নিজেরাই থাকো। পরের বাড়িতে বাইরের লোক কখনও থাকতে দিয়ো না। বাড়ি তো আমার নয়। কী ভাবতে কী ভাববে ওরা শেষকালে! তা ছাড়া রাতদুপুরে এই বুড়ো ভাম যখন নাক ডাকাতে শুরু করবে তখন ঘুমের বারোটা তো বাজবেই তোমাদের, উপরন্তু ওকেই হয়তো ভূত ভেবে ভয়ে কাঠ হয়ে যাবে।"

তায়জুদা বললেন, "না না। ঠিক আছে। আমি যাই। কোনও ভয় নেই। সাবধানে থেকো সব। একটা রাত বই তো নয়!" এই বলে চলে গেলেন তায়জুদা।

সাহেবও চলে গেলেন।

আমরাও আর বিলম্ব না করে চারজনেই শুয়ে পড়লাম একত্রে। ভূতের বাড়ি তো! তাই অন্ধকার না করে আলো জ্বেলেই শুলাম। আমরা শোওয়ার পর সবে একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছে এমন সময় হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের এক পবিত্রাহি চিৎকারে ঘোর ছুটে গেল আমাদের। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম চারজনেই। কোথা থেকে আসছে শব্দটা? মনে হচ্ছে বাথরুমের ভেতর থেকে। ছুটে গিয়ে বাথরুমের দরজা খুললাম। দেখলাম কোথায় কী। কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকারটা যেন আরও বেড়ে গেল। সে কী দারুণ কান্না। একটানা চিৎকার যাকে বলে। আমরা কানে হাতচাপা দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ কান্নার পরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল রেশটা।

এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন ডাকতে লাগল। "হাসান! হাসান রে! এ হাসান।"

আমরা ছুটে গিয়ে জানলা খুললাম। কিন্তু কই? কোথায় কে? কেউ কোথাও নেই তো।

এদিকে ঘরের কোণ থেকেও একটা চাপা আর্তনাদ কানে এল। কে যেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, "হায় আল্লা! কী কষ্ট! উঃ, মরে গেলাম।"

ঘরের মধ্যে আমরা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও প্রাণী নেই। অথচ ঘরের কোণ থেকে ওইভাবে কার আর্তস্বর ভেসে আসছে? এক সময় দেখলাম ঘরের কোণের মেঝেটা কীরকম ঢিবির মতো উঁচু হয়ে উঠল। আর সেইসঙ্গে—ওরে আমার হাতে খুব লাগছে রে। ও বাবা গো! আমার হাতের ওপর দিয়ে কে দেওয়াল তুলেছে। আমি হাত নাড়তে পারছি না।

ওপাশের দেওয়ালের গা থেকেও ওই একই রকম চাপা কান্না শোনা যেতে লাগল— "ওগো, আমার বুকে ইট গেঁথেছে কে? ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা এগুলো ভেঙে দাও। এই দেখো আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।"

এই প্রচণ্ড শীতেও আমাদের সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটছে তখন। কী যে করব কিছু ঠিক করতে পারছি না। চারদিক থেকে কান্নার স্বর ভেসে আসছে। করুণ ক্রন্দনে ভরে উঠছে গোটা ঘর।

আমরা পালাব বলে দরজা খুলে বাইরে বেরোতে গিয়েই দেখি দালানে সিঁড়ির কাছে একটা কফিন কে যেন শুইয়ে রেখে গেছে। কিন্তু কে রাখল? দরজা তো ভেতর থেকেই বন্ধ।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

মুন্না ছুটে গিয়ে খিল খুলতেই দেখা গেল তায়জুদাকে।

আমাদের অবস্থা দেখেই তায়জুদা বললেন, "ভয় নেই। আমি এসে গেছি। তোমাদের আগেই বলেছিলাম এখানে রাত্রিবাস করা যায় না। এ অত্যন্ত খারাপ জায়গা। তবুও তোমরা যেমন শুনলে না তেমনই ফল বোঝো।"

আমরা বললাম, "তায়জুদা, ওই দেখুন একটা কফিন। কে এসে রেখে গেছে ওখানে।"

সেদিকে তাকিয়েই রেগে উঠলেন তায়জুদা, "কে! কে এটাকে নিয়ে এসেছে এখানে?"

"তা জানি না।"

"এটা তো ও ঘরের মেঝেয় পোঁতা ছিল।"

"তায়জুদা! কী বলছেন আপনি?"

"ঠিকই বলছি। দেখবে এসো।"

আমরা তায়জুদার সঙ্গে পাশের ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সত্যি-সত্যিই সেখানে সিমেন্টের মেঝে খুঁড়ে কে যেন বের করে এনেছে কফিনটাকে।

তায়জুদা ছুটে গিয়ে কফিনের ঢাকা খুলে ভেতরটা দেখে নিয়েই বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক আছে। চলো ওটাকে ও ঘরে আবার পুঁতে রেখে আসি।"

ততক্ষণে আমরা আর আমাদের মধ্যে নেই। কেননা তায়জুদা কফিনের ঢাকা খুলতেই দেখলাম তায়জুদার মৃতদেহটা কফিনে শোওয়ানো আছে। অবাক কাণ্ড! তা হলে আমাদের সামনে এই যে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন ইনি তবে কে?

এমন সময় হঠাৎ সোমসাহেব এসে পড়লেন তাই রক্ষে!

সোমসাহেব বললেন, "আবার তায়জুদ্দিনটা এইসব আরম্ভ করে দিয়েছে? ওর বদমায়েশি দেখছি এখনও গেল না! থাক। চলে এসো তোমরা। দারুণ ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে। আমার ওইখানেই চলো। এই নাও চাবি। আমি সিনি যাচ্ছি। ওখানে ব্লক আছে। তোমাদের এখানে পাঠানোই আমার ভুল হয়েছিল।"

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সোমসাহেবকে অনুসরণ করলাম। স্টেশনের কাছাকাছি এসে সোমসাহেব অন্ধকারে হেঁটেই ইয়ার্ডের দিকে চলে গেলেন।

আমরা সোমসাহেবের বাংলোয় যখন এসে পৌঁছলাম তখন শেষ রাত। সেখানে গিয়েই এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম। আজ বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন সোমসাহেব।



দুর্যোগের রাত

১৯৬২ সালের কথা।

আমার বয়স তখন একুশ বছর। রেলে চাকবি পেয়ে মেদিনীপুরে আছি।

তখন বৈশাখের শেষ। প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছি সকলে। তার ওপর ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে কুলি-খালাসির কাজ। মেদিনীপুর শহরের প্রান্তে কাঁসাই নদীর তীরে বাঁধের ওপর আমাদের তাঁবু পড়েছে। ব্রিজে স্ক্র্যাপিং হচ্ছে তখন। সারাটা দিন রোদে কাজ করতে করতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছি। হঠাৎ বিকেলের দিকে আকাশ কালো করে একটা মেঘ এল।

আমাদের সঙ্গে ছিল গুণধর মেট। বলল, "ওরে বাবা! এ যে ঈশানে মেঘ, বৃষ্টি একটু হবেই।"

আমি বললাম, "হোক না! হলে তো বাঁচি। সারাটা দিন যা গেল, একটু যদি বৃষ্টি হয় তো স্বস্তি পাই।"

আমাদের সঙ্গে যারা কাজ করছিল কাজের শেষে তাদের অনেকেই যে যার বাড়ি চলে গেল।

রইল শুধু গুণধর ও গোষ্ঠদা।

গোষ্ঠদা কার্পেন্টার। ব্রিজের কাজ তো. রেলের স্লিপারের কাঠে বিঁধ করতে, কাঠ ছাঁট করতে কার্পেন্টার লাগে। সবসময়ই প্রয়োজন এদের। তা সেই গোষ্ঠদা ও গুণধর দু'জনেই বাজারের থলি হাতে চলে গেল বাজার করতে।

নদীর ধারে নির্জন স্থানে তাঁবুর মধ্যে রইলাম আমি একা। কিছুতেই থাকতে চাইনি আমি। কেননা একে দুর্যোগের পূর্বাভাস, তার ওপরে ওই ভয়ঙ্কর নির্জনতা। অথচ উপায়ও নেই। একজন অন্তত পাহারায় না থাকলে সর্বস্ব চুরি হয়ে যাবে। তাঁবু পাহারা দেওয়ার জন্য চৌকিদার একজন থাকে, তবে সে লোকটা আজ দু'দিন হল অনুপস্থিত।

চৌকিদারের নাম জগাইদা। বড় ভালমানুষ। বয়স হয়েছে। আমাকে বলে, "এসব কাজ তোমাদের নয়। এর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। এ কাজ ছেড়ে কোনও অফিস টফিসে যাতে ঢুকতে পারো সেই ধান্দাই লাগাও দেখি।"

জগাইদা তো বলেই খালাস। কিন্তু অফিসের চাকরি আমাকে দেবে কে? তাই শুনেই যাই জগাইদার কথা। আর শতকষ্ট সহ্য করেও চাকরিটা বজায় রাখি। হাজার হলেও রেলের চাকরি তো!

যাই হোক, সবাই চলে গেলে একা আমি মনমরা হয়ে বসে রইলাম।

হঠাৎ আমার শরীরের ওপর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। বুঝলাম বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও।

চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে।

তবুও কোনওরকমে আলোটা জ্বাললাম।

হঠাৎ ঝড় উঠল। প্রথমে গোঁ গোঁ করে একটা শব্দ। তারপরই কড়কড় করে বজ্রপাত। আলোর চাবুক একটা দিক থেকে দিগন্তে ছিটকে গেল।

আমার যেন ডাক ছেড়ে কান্না এল তখন। সত্যি বলতে কি, এই ভয়ঙ্কর নির্জনে আমার তখন ভূতের ভয় করতে লাগল খুব। যত রাগ হল আমার গুণধর ও গোষ্ঠদার ওপর। আমাকে এইভাবে একা রেখে ওদের চলে যাওয়াটা কি উচিত হল? আসলে বাজার করতে যাওয়াটা ওদের অছিলা। ওরা গেল নেশা করতে। বাজার হয়তো করবে। কিন্তু আজ তা না করলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। এখন আমি একা এখানে কী করি? এই নির্জনে ভূতের ভয়, সাপের ভয়, সবকিছুই পেয়ে বসল আমাকে।

এই দুঃসময়ে মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। এমনকী এও ঠিক করলাম, এই চাকরি আর নয়! কাল সকাল হলেই পালাব। গার্ডেনরিচের কর্তাদের বলব শালিমারে পোস্টিং দেন তো ভাল, না হলে ইস্তফা।

আমার এইসব চিন্তাভাবনার মধ্যেই দেখি না টর্চ হাতে কে যেন একজন দ্রুত আমার দিকে ধেয়ে আসছে। শুধু আসছে নয়, আমার নাম ধরেও ডাকছে।

আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি না জগাইদা।

জগাইদা রক্তচক্ষুতে বললেন, "শয়তান দুটো কোথায় রে?"

বললাম, "ওরা তো বাজারে গেছে।"

"বাজারে গেছে? এই নির্জনে তোকে একা রেখে? তার ওপর এই দুর্যোগ। আমি না থাকলেই দেখি ওদের সাহস বেড়ে যায় খুব।"

"কিন্তু জগাইদা! তুমি এই দু'দিন কোথায় ছিলে?"

"আর বলিস না ভাই। গিয়েছিলুম একটু মেয়ের বাড়ি। তা সে কী বিপদ—। যাক সে কথা। আমি যখন এসে গেছি তখন তোর আর কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু এইখানে এক মুহূর্তও থাকিস না আর।"

"কেন জগাইদা? এই অন্ধকারে যাব কোথায় আমি?"

"চল, তোকে আমার পরিচিত একজনদের বাড়িতে রেখে আসি। এই পরিস্থিতিতে মাঠের মাঝখানে কি পড়ে থাকা যায়? তা ছাড়া আকাশের যা অবস্থা তাতে ঝড় এখনই উঠল বলে! একটু পরে তাঁবু টাঁবু কোথায় থাকবে তা কে জানে?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই দারুণ একটা ঘূর্ণিঝড় হঠাৎই ধুলোবালি উড়িয়ে চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল। তারপরই দেখি বাঁধের ওপর আমরা দু'জন। কিন্তু তাঁবু উধাও।

এরপর নামল বৃষ্টি।

জগাইদা ভিজে-ভিজেই আমাকে নিয়ে এলেন এক গোয়ালার বাড়িতে।

এসে হাঁকডাক করতেই বাড়ির লোকজন বেরিয়ে এল। জগাইদার বিশেষ পরিচিত এঁরা।

জগাইদা বললেন, "আজ রাতটুকুর মতো এই ছেলেটাকে তোমাদের বাড়িতে একটু আশ্রয় দাও দিকিনি। ভদ্রলোকের ছেলে। ওইরকম ফাঁকা জায়গায় এই দুর্যোগে থাকতে পারে কখনও?"

আমি তো আশ্রয় পেলাম। কিন্তু জগাইদা?

বললাম, "জগাইদা, তুমি কোথায় যাবে? তাঁবুর তো চিহ্ন নেই। তার ওপর এইরকম ঘন ঘন বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে। শিলাবৃষ্টিও হতে পারে।"

জগাইদা বললেন, "হোক। আমি যে চৌকিদার। এইটাই তো আমার ডিউটি ভায়া। না

হলে রেলের অত দামি দামি যন্ত্রপাতি, একটু চোখের আড়াল হলে ওব একটিও অবশিষ্ট থাকবে না আর।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু ওই দুর্যোগে তুমি থাকবে কী করে?"

"আমার জন্য চিন্তা করিস না। আমরা হচ্ছি জল-কাদার মানুষ। এসব আমাদের গা সওয়া।"

আমি সে রাতে ওই গোয়ালার বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে সত্যিই বেঁচে গেলাম। ওদের বাড়িতে পোস্তর তরকারি, মৌরলা মাছের টক আর পেটভরে ভাত খেয়ে আরামে শুলাম বটে কিন্তু জগাইদার চিন্তায় আমার ঘুম হল না। কেননা জগাইদা চলে যাওয়ার পর দুর্যোগ আরও প্রবল রূপ ধারণ করল। ঘন ঘন বাজ পড়ার শব্দে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল আমার।

ভোরবেলা সবে একটু ঘুমিয়ে পড়েছি এমন সময় গুণধর ও গোষ্ঠদার ডাকে ঘুম ভাঙল।

দুর্যোগ কাটলেও অন্ধকার তখনও কাটেনি। একেবারেই নিশিভোর যাকে বলে।

গুণধর বলল, "শোন, আমরা স্টেশন ধারে যাচ্ছি জগাইদাকে দেখতে। তুই সকাল না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাক। বেলায় একবারে শ্মশানে চলে যাবি।"

চমকে উঠলাম আমি, "সে কী! কেন?"

"মেয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে জগাইদা সাপের কামড়ে মারা গেছে। একেবারে জাত কেউটেয় কেটেছে জগাইদাকে। বুঝলি, দারুণ বিষ তার।"

আমার সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল।

ওদের কথা যদি সত্যিই হয় তা হলে কাল সন্ধেবেলা কে আমাকে এই বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল?

আমি সকাল হতেই গোয়ালার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে আমাদের সেই কর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন সেখানে অনেক লোকজন। আমাদের কুলি-খালাসিরাও আছে।

সবাই বলল, "আমরা তোমার কথাই ভাবছিলাম গো। কী দুর্যোগই না গেল কাল। তিন-তিনজন সহকর্মীকে হারালাম। জগাইদা তো মেয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে সাপের কামড়ে মরল। গুণধর আর গোষ্ঠ মরল ফাঁকা মাঠে বজ্রাঘাতে।"

"কখন?"

"কাল সন্ধেবেলা, নেশা করতে গিয়ে।"

আমার তো হাত-পা তখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

এমনও নাকি হয়? আমি আর এক মুহূর্ত সেখানে না দাঁড়িয়ে স্টেশনের পথ ধরলাম। সেই শেষ।



বোড়ালের সেই রাত

তিরিশ বছর আগেকার কথা। চব্বিশ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রামে আমাদের এক বন্ধু ছিল। তার নাম কমলেশ। কী একটা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা তিন বন্ধু গিয়েছিলাম কমলেশদের বাড়িতে। অজয়, সুশান্ত এবং আমি।

এখনকার বোড়াল গ্রামকে দেখে তখনকার সেই গ্রামের কথা কিন্তু কল্পনাও করতে পারবে না কেউ। সেই প্রবীণ মানুষদের যদি কেউ এখনও বেঁচে থাকেন, তা হলে তিনিই বলবেন, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। এই গ্রামের গাছপালা তখন এত ঘন ছিল যে, বাইরে থেকে দেখে এটাকে তখন কোনও গ্রাম নয়, একটা দুর্ভেদ্য জঙ্গল বলেই মনে হত।

যাই হোক, ওখানে গিয়ে বিকেলের দিকে গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াবার সময় হঠাৎ গ্রামের প্রান্তে একটি ভাঙা বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কী চমৎকার বাড়ি! কোনও রাজা-মহারাজার ছিল বোধ হয়। কিন্তু এখন তার এমনই হতশ্রী চেহারা যে, দেখলে দুঃখ হয়। বসবাসের অযোগ্য তো বটেই, বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, এত জায়গা থাকতে এই গ্রামের ভেতর কবে কোন মান্ধাতার আমলে কে যে এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন তা কে জানে? সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার এই যে, বাড়িটি পরিত্যক্ত এবং বসবাসের অযোগ্য হলেও এর কাঠামো এমন মজবুত যে, একে সারালে আবার এ তার পূর্ব রূপ ফিরে পাবে। ছাদের আলসের কার্নিস এখনও অক্ষত। অর্থাৎ, ভাঙা বাড়ি কিন্তু ধ্বংসস্তূপ নয়। পরিত্যক্ত বাড়ি, তবু ফেলে দেওয়ার নয়।

বাড়িটার দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে থেকে পায়ে-পায়ে সেদিকে এগোতেই বাধা দিল কমলেশ। হাত ধরে বলল, "আর না বন্ধু। আর এগিয়ো না।"

"কেন?"

"বাড়িটার একটু বদনাম আছে।"

"সে তো সব বাড়িরই থাকে। যেখানে যত পোড়ো বাড়ি আছে সবেরই বদনাম। তাই বলে এমন চমৎকার বাড়িটাকে একবার ভেতরে ঢুকে দেখা যাবে না?"

"কেউ ঢোকে না ও-বাড়িতে।"

"কেন, ভূতের ভয়ে? ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকলে ভূতে গলা টিপে মারবে?"

"ঠিক তাই। ভূতে এসে গলা টিপে মারবে কিনা জানি না, তবে ভূতের বাড়ি ওটা।"

"ভূতের বাড়ি!" আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম।

এর পর যা হয়ে থাকে সচরাচর, এক্ষেত্রেও তাই হল। অর্থাৎ কিনা আমরা নানারকম ঠাট্টা, তামাশা, বিদ্রূপ, এইসব করতে লাগলাম কমলেশকে।

কমলেশ একটুও উত্তেজিত হল না। বরং হেসে বলল, "দ্যাখ ভাই, আমরা গ্রামে থাকি। তোরা তো আমাদের মানুষের মর্যাদা দিস না। ভাবিস কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কিছু দু' পেয়ে জীব বুঝি ওগুলো। কিন্তু জেনে রাখ, যা বলছি তা মিথ্যে নয়। সাহস থাকলে পরীক্ষা করে

দেখিস। অবশ্য পরীক্ষা না করাটাই ভাল। কারণ তোদের মতো গোঁয়ার-গোবিন্দ যে দু-একজন পরীক্ষা করতে গেছে তারা এমন শিক্ষা পেয়েছে যে, আর এমুখো হয়নি।"

অজয় বলল, "তাই নাকি! তা হলে তো পরীক্ষা করতেই হচ্ছে। অবশ্য তোর কথা যে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি তা নয়, তবে কি জানিস, যেখানেই যাই, যে-গ্রামেই যাই, পোড়ো বাড়ি দেখলেই শুনি ভূতের উপদ্রবের কথা। মাঠের মাঝখানে বেলগাছ থাকলেই শুনি সে-গাছে নাকি ব্রহ্মদৈত্য আছে। আর মাছভর্তি পুকুর দেখলেই শুনতে পাই, এর পাড়ে রাতদুপুরে ভূত ঘোরে। যারা মাছ ধরে তাদের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে মাছ চায়। কাজেই এই ব্যাপারগুলোতে আর আমাদের আস্থা নেই। তাই ভাবছি, তোদের দেশের এই পোড়ো বাড়িতে এক রাত কাটিয়ে ভূত জিনিসটা আসলে কী, তা একবার দেখে যাই।"

কমলেশ বলল, "না। তোদের মতো অবিশ্বাসী ছেলেদের এদিকে নিয়ে আসাটাই ভুল হয়েছে।"

আমি বললাম, "খুব রেগেছিস মনে হচ্ছে?"

"রাগের কী আছে?"

সুশান্ত বলল, "বেশ তো, আমরা কোনও পরীক্ষা চাই না। শুধু গোঁয়ার্তুমি করে এক রাত এই বাড়িতে থাকতে এসে উচিত শিক্ষা পেয়েছে এমন একজনের সঙ্গেই অন্তত আমাদের পরিচয় করিয়ে দে।"

কমলেশ এবারে আমতা-আমতা করতে লাগল।

সুশান্ত বলল, "তার মানে এমন কারও নামও তোদের জানা নেই, যে-লোকটা প্রত্যক্ষদর্শী, যে কিছু একটা বলতে পারে। অথচ অতবড় বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি আখ্যা দিয়ে চোর-ডাকাতের ঘাঁটি করে রেখেছিস তোরা।"

আমি বললাম, "আজ রাত্রেই এর রহস্য উন্মোচন করতে চাই আমরা।"

কমলেশ বলল, "দোহাই, আজ নয়। একটা কাজের বাড়িতে এসেছিস, খেয়েদেয়ে আনন্দ করে যা। পরে যখন হোক, যেদিন হোক, আসবি। কথা দিচ্ছি, আমি নিজে সাহায্য করব তোদের।"

"বেশ, তাই হবে। নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চারের মনোভাব নিয়েই আর একবার এখানে আসব আমরা। তখন যা হয় হবে।"

বেলা গড়িয়ে আসছে তখন। আমরা আর ওই ভুতুড়ে বাড়ির দিকে না এগিয়ে অন্য পথ ধরলাম।

মাসখানেক পরে আবার একদিন কমলেশের সঙ্গে ওদের গ্রামের বাড়িতে এসে হাজির হলাম আমরা। ওর বাড়ির লোকেরা তো দারুণ আপত্তি করলেন আমাদের মতলব শুনে। সবাই অনেক করে বোঝালেন এই কাজের ঝুঁকি না নিতে। কিন্তু আমরা কারও কথাই কানে তুললাম না। যথারীতি ওদের বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বেলাবেলি তিন বন্ধুতে এসে হাজির হলাম সেই পোড়ো বাড়িতে। এল না শুধু কমলেশ। সে আগেই বলেছে, "দ্যাখ ভাই, আমি ওসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে নেই। ও বাড়ির ঘটনার কথা আমার অজানা নয়। কাজেই জেনেশুনে বিষপান আমি করব না। তবে তোরা যেতে চাইছিস, যা। কেউ যদি নিজের থেকে মরতে চায়, তা হলে কার কী ক্ষমতা যে, তাকে বাঁচাতে পারে?"

এই কথামতোই আমরা এলাম। ঠিক হল, এক রাত এই পোড়ো বাড়িতে থেকে পরদিন

সকালে ফিরব। তবে আমাদের এই থাকাথাকিতে কোনও বাজিটাজির ব্যাপার ছিল না। শর্ত ছিল সততার। অর্থাৎ, আমরা অলৌকিক কিছু দেখলে সেটাকে অস্বীকার করব না। আবার সত্যিসত্যিই যদি রোমহর্ষক ঘটনার সম্মুখীন হই, তা হলেও রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতে লজ্জাবোধ করব না। আসলে আমাদের এই থাকাথাকির ব্যাপারটা ঠিক চ্যালেঞ্জের ব্যাপার নয়। স্রেফ সত্য যাচাই এবং কৌতূহল মেটানোর ব্যাপার।

আমাদের আগ্রহ দেখে স্থানীয় লোকরাও অনেকে বারণ করলেন। সবাই বললেন, "কী দরকার ভাই, সুখে থাকতে ভূতে কিলোবার? ভূত না থাকুক, গুণ্ডা-বদমাশ তো আছে? অযথা গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে কেন বেঘোরে মরবেন? তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। এই বাড়িতে সত্যিই ভূতের উপদ্রব না হলে মাঠের মাঝখানে বাড়িটা কখনও এমনই পড়ে থাকে?"

আমরা কিন্তু কারও কথাতেই কর্ণপাত করলাম না। যে যা বলল, তা কানখাড়া করে শুনে গেলাম। তাদের কথার গুরুত্ব দিয়ে ফিরে এলাম না। দিব্যি সেই পোড়ো বাড়ির ভেতর ঝিঁঝির ডাক শুনে, মশার কামড় খেয়ে রাতজাগা শুরু করলাম। মাঝে-মাঝে ভয় যে করছিল না, তা নয়। ভয় ছিল সাপের। হাজার হলেও বহুদিনের পোড়ো বাড়ি। তবু আমরা সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম। অর্থাৎ, বিকেলবেলা বাড়িতে ঢুকেই কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দিয়েছিলাম চারদিকে। মুরগির মাংস, রুটি আর সন্দেশ ছিল রাতের খাদ্য-তালিকায়। আর ছিল চা তৈরির সরঞ্জাম। তখন গ্রামেঘরে এখনকার মতো এত ব্যাপকভাবে স্টোভের প্রচলন ছিল না। তাই প্রচুর শুকনো নারকোল পাতা এনে রেখেছিলাম।

আমরা চা খাচ্ছি। গল্প করছি আর ঘড়ি দেখছি—কখন সন্ধে হয়, কখন ভূত আসে। দেখতে-দেখতে সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক। আমরা অধীর আগ্রহে ভূতের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

রাত বারোটা। কোনও উপদ্রব নেই। ভয় নেই। ভূতেরা সাধারণত যা করে, অর্থাৎ গায়ের ওপর গরম নিশ্বাস ফেলা, খ্যাল-খ্যাল করে হাসা, হারিকেনের আলো নিভিয়ে দেওয়া, গায়ে ঘাস ছুড়ে মারা, কিছুই করল না। এমনকী হঠাৎ কোনও আর্তনাদ বা মড়াকান্নাও শুরু করল না কেউ। শুধু ভূত কেন, একটা শেয়াল-কুকুর পর্যন্ত ধারেকাছে এল না।

রাত তখন একটা। তখনও কারও কোনও অস্তিত্ব অনুভব করলাম না। ইতিমধ্যে দু' রাউন্ড চা-পর্ব শেষ হয়েছে আমাদের। সময় কাটাবার জন্য এবং একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আবার আমরা নারকোল পাতা জ্বালিয়ে চা তৈরি করে খাচ্ছি এমন সময় কোথা থেকে হঠাৎ আধপাগলা একজন লোক এসে হাজির হল সেখানে। ওর হাতে একটি কলাইয়ের মগ। সেটা এগিয়ে বলল, "আমাকে একটু চা দেবেন দাদাবাবু?"

আমি বললাম, "কে বাবা তুমি?"

লোকটি ফিক করে হেসে বলল, "আমি ভূত।"

"ভূত!"

"তবে আর বলছি কী? যাকে দেখবে বলে তোমরা এসেছ, আমিই সেই। কেমন দেখছ?"

"ভালই। তা বাবা ভূতই যদি তুমি হবে তো এইরকম ছিরি কেন তোমার? হাতের জায়গায় পা থাকবে। পায়ের জায়গায় হাত থাকবে। মুখটা হবে উলটোমুখো। গায়ে কোনও

মাংস থাকবে না। নয়তো অর্ধেক শরীর দেখা যাবে, অর্ধেক অদৃশ্য থাকবে। তবে তো?"

লোকটি হেসে অস্থির হয়ে বলল, "তবেই তোমরা ভূত দেখেছ। ও ভূত এখানে নেই বুঝলে? ও ভূত থাকে গল্পের বইতে। যাক, এখন আমাকে এক কাপ চা দাও দিকিনি।"

আমাদের চা তখন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই থেকেই একটু দিলাম ওকে।

লোকটি বেশ আয়েস করে চা খেতে খেতে বলল, "মেজাজ এসে গেল। কতদিন যে এমন চা খাইনি। ভাগ্যিস তোমরা এসেছিলে।"

"আর একটু দেব?"

"নাঃ, থাক। যাচ্ছিলুম এই পথ দিয়ে, আলো জ্বলছে দেখে ঢুকে পড়লুম।"

"কিন্তু এত রাতে তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?"

"হাই দ্যাখো, ভূতেরা তো রাতবিরেতেই যায়-আসে গো। তা ছাড়া তাদের তো নির্দিষ্ট কোনও ঠিকানা থাকে না। তাদের কাজই হল ঘোরা।" বলে মগটি হাতে নিয়ে উঠে গেল লোকটি।

অজয় বলল, "এ কী! তুমি চলে যাচ্ছ?"

"যাব না তো কি বসে থাকব? আমার এখন অনেক কাজ।"

"বেশ মজার লোক তো তুমি। যেই গরম চা পেটে পড়ল অমনই কেটে পড়ছ? একটু বোসো। গল্পসল্প করি।"

"না রে ভাই, বসবার সময় নেই।"

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছ পর্যন্ত গেল।

অজয় বলল, "শোনো।"

লোকটি বলল, "আঃ! যাওয়ার সময় পিছু ডাকো কেন?"

সুশান্ত বলল, "আরে শোনোই না, একটা কথা বলি।"

লোকটি ফিরে এসে বলল, "নাও, কী বলবে বলো।"

"আমরা তো এ বাড়িতে এসেছি ভূত দেখতে। তা তুমি যখন বলছ তুমিই ভূত, তখন যাওয়ার আগে তোমার ভূতের খেলাটা একবার দেখিয়ে যাও না বাবা।"

লোকটি হেসে বলল, "কী ছেলেমানুষি করছ তোমরা রাতদুপুরে? যাও, ঘরের ছেলে ঘরে যাও। ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ভাল করে ঘুম দাও দিকিনি।" বলেই কোনওদিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেল লোকটি।

আমরা টর্চের আলোয় অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করলাম, লোকটি অন্ধকারে বাইরে গিয়েই হঠাৎ মিলিয়ে যায় কিনা। কিন্তু না। সে দিব্যি খোশমেজাজে, কখনও বা নাচতে-নাচতে দূরের গ্রামের দিকে চলে গেল।

রাত দুটো। পাশের একটি বাদামগাছের ডাল থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল শ্-স্-স্-স। তারপর হঠাৎ প্যাঁচাটা দারুণ ভয় পেয়ে চিৎকার করতে-করতে আমাদের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে ডানা ঝাপটে বারবার পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। তারপর আমাদের তাড়া খেয়ে আরও একপাক ঘুরে উড়ে গেল অন্ধকারে।

রাত তিনটে। আমরা আর-একবার চা খেলাম।

ভোর পাঁচটা। সবে আলো ফুটি-ফুটি করছে। গাছের ডালে একটি-দুটি করে পাখি ডাকছে। কিন্তু কই? না এল কোনও ভূত, না কোনও জন্তু-জানোয়ার। আমরা নিজেরাই এবার দারুণ বিরক্তিতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলাম, "শুধু-শুধু এই গেঁয়ো

ভূতগুলোর কথা শুনে রাতের ঘুম নষ্ট করে ভূত দেখতে না এলেই হত! কী দেখলাম? কিছুই তো না। মাঝখান থেকে মশার কামড় খেলাম। ঘুম হল না। শরীরও খারাপ হল। যত্তসব।"

দেখতে-দেখতে ভোর হল। আমরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে পোড়ো বাড়ির বাইরে চলে এলাম। বেশ কিছুটা পথ আসবার পর দেখলাম কমলেশ এবং গ্রামের দু-চারজন লোক আমাদের অবস্থা দেখবার জন্য এইদিকে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসে মুখোমুখি হতেই অবাক বিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। এমনভাবে তাকাল, যেন আমাদের দেখেইনি কোনওদিন। ভয়, বিস্ময়, কী না ছিল ওদের চোখে? যেন আমরাই ভূত। তাই ভয়ে ভয়ে আমাদের ভূত দেখছে।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, "রাত্রে আপনারা ভয়টয় পাননি তো?"

"না।"

"তেনাদের কোনও উপদ্রব হয়নি?"

"না।"

"কিছু দেখেননি আপনারা?"

"হ্যাঁ, দেখেছি আমরা। একটা ঘোড়ার মাথা আর হাতির মুণ্ডু।"

"তা তো দেখবেনই বাবু। হাজার হলেও রাজারাজড়ার বাড়ি। হাতি-ঘোড়া কত কী ছেল।"

আর-একজন বলল, "আরে বুঝছ না কত্তা। বাবুরা আমাদের বিদ্রূপ করছেন।"

আমি রেগে বললাম, "করবই তো! শুধু শুধু তোমাদের বুজরুকিতে উত্তেজিত হয়ে এই যে একটা পোড়ো বাড়িতে ফালতু একটা রাত কাটালাম, এর খেসারত কে দেবে? এইভাবে মানুষকে ধাপ্পা দেওয়ার কোনও মানে হয়?"

আর-একজন বলল, "ধাপ্পা দেব কেন? যা আমরা বরাবর শুনে আসছি, তাই বলেছি। তা ছাড়া আমরা তো আপনাদের পায়ে ধরে সাধতে যাইনি ওই বাড়িতে রাত কাটাবার জন্য। বরং আপনাদের ভালর জন্য আমরা বারবার বারণই করেছিলাম। আপনারা তো শুনলেন না। আমরা লোকের মুখের শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে কেউ ঢুকি না ও বাড়িতে।"

আমি বললাম, "বেশ। এবার আমরা ওই বাড়িতে এক রাত থেকে তো প্রমাণ করে দিলাম যে, তোমাদের শোনা কথার কাহিনীগুলো কত ভুল। এবার থেকে নির্ভয়ে যাবে ও বাড়িতে। ভূত তোমাদের ভয়ও দেখাবে না, মেরে ফেলবে না, খেয়েও নেবে না।"

কমলেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সবই তো হল। কিন্তু একটি রাতের ভুলের মাশুল যে তোদের কী কঠিন মূল্যে দিতে হল তা কি তোরা এখনও বুঝতে পারিসনি?"

"কীরকম!"

"তোরা একবার খুব ভাল করে নিজেদের চেহারাগুলোর দিকে তাকিয়ে দ্যাখ তো।"

কমলেশের কথা শুনে আমরা সবাই সবাইয়ের দিকে তাকালাম। সত্যিই তো! এ কী চেহারা হয়েছে আমাদের? আমাদের বন্ধুদের মধ্যে অজয় ছিল অত্যন্ত রূপবান। কিন্তু তার সেই চাঁপাফুলের পাপড়ির মতো গায়ের রং হঠাৎ এত কালো হয়ে গেল কী করে? ওর বাঁশির মতো লম্বা নাকটা যেন টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বেঁকে গেছে। তা ছাড়া ওর দু'কানে মাকড়ি, হাতে বালা কোত্থেকে এল? যেন অরণ্যবাসী এক ভিল যুবক। আর সুশান্ত? এই এক রাতে ওর মাথার চুলগুলো সব পেকে গেছে। ঠিক যেন আশি বছরের বুড়ো। গায়ের

চামড়াতেও কোঁচ পড়েছে। সামনের সারির কয়েকটা দাঁত নেই। না, না। এ হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই কোনও ইন্দ্রজালের ব্যাপার। এই যদি ওদের অবস্থা হয় তা হলে আমার অবস্থা কী হয়েছে? সামনে একটা আয়না থাকলে অবশ্যই নিজেকে দেখতাম। কিন্তু এ কী! আমার হাতে এত রক্ত এল কী করে? ঠিক মনে হচ্ছে আমি যেন কাউকে খুন করে এসেছি। তা ছাড়া আমার সেই জামা-প্যান্ট, জুতো কিছুই তো নেই। তার বদলে এ কী! ময়লা চিরকুট ভুটানিদের মতো পোশাক। পায়ে ছেঁড়া নাগরার জুতো। যেন এইমাত্র কোনও চা-বাগান থেকে বেরিয়ে এসেছি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার কোমরে একটা রং-চটা কলাইয়ের মগ ময়লা দড়ি দিয়ে বাঁধা। যে-মগটায় কাল রাতের সেই অদ্ভুত লোকটা চা খেয়ে সেটা হাতে নিয়েই চলে গিয়েছিল। এও কি সম্ভব?



রাতের অতিথি

সেকালে যখন ট্রেন ছিল না, বাস ছিল না, তখন লোকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই দলবদ্ধ হয়ে পায়ে হেঁটে দূর দেশে যাত্রা করত। পথে চোর ডাকাতের নির্যাতনও ভোগ করত অনেকে। কেউ কেউ প্রাণ হারাত। তাই লোকে যতটা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেই পথ চলত।

এইরকম একটি দল চলেছে তীর্থযাত্রায়। উদ্দেশ্য, কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করে মথুরা হয়ে বৃন্দাবন যাবে।

এই দলটিতে গোলক নামে এক তরুণ ছিল। তার বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে। সে অবশ্য সেখানে যাবে না। তার গন্তব্যস্থল হল গয়া। গয়ায় গিয়ে গদাধরের পাদপদ্মে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে ফিরে আসবে সে।

এই দলের সঙ্গে যেতে যেতে গোলক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। সঙ্গের লোকেরা ওকে অসুস্থ অবস্থাতেই ফেলে রেখে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, আমরা পাশের গ্রামে তোমার জন্য কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আশা করি এর মধ্যে তুমি আমাদের ধরে ফেলবে। গোলক "আচ্ছা" বলে একটি গাছতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়ল। ওর অসুস্থতার কারণ অবশ্য অন্য কিছুই নয়, শুধু পথশ্রমে এবং রোদে ঘুরে ভীষণ গা-মাথা ঘুরছিল । চোখে-মুখে জাল পড়ে আসছিল। দলটির সঙ্গে পায়ে হেঁটে এগোনোর মতো সমস্ত শক্তিই হারিয়ে ফেলেছিল সে।

যাই হোক, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে গাছতলায় শুয়ে পড়তেই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল গোলক। ঘুম যখন ভাঙল তখন শরীরও সুস্থ হয়েছে। গোলক চোখ মেলে দেখল চারদিকে শুধু বনজঙ্গল আর ঘন অন্ধকার।

এই অন্ধকারেতে তো সারাটা রাত গাছতলায় পড়ে থাকা যায় না। তাই একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এগোল সে। খানিক যাওয়ার পর এক জায়গায় একটু আলো দেখতে পেয়ে আশান্বিত হল। আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে সে দেখল এক বর্ধিষ্ণু চাষি পরিবারের বাড়ি সেটা। বাড়ির সামনে মাটির দাওয়ায় বসে এক বৃদ্ধ তামাক সেবন করছিলেন।

গোলক গিয়ে বিনীতভাবে তাঁকে বলল, "মহাশয়ের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। রাখতে পারি কি?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক হুঁকো থেকে মুখ তুলে বললেন, "কে আপনি?"

"আমি একজন পথিক। দলছুট হয়ে একা পড়ে গেছি। আপনি আমাকে এক রাতের জন্য আপনার বাড়িতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা কবে দিতে পারেন?"

বৃদ্ধ দাওয়া থেকে নেমে এসে গোলকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু মহাশয়ের পরিচয়?"

গোলক বলল, "দেখুন, আপনি আমার বাবার বয়সি লোক। এখন থেকে আপনি আমাকে 'আপনি আজ্ঞে' করবেন না। আমার পরিচয় আপনাকে দিচ্ছি। আমার নাম গোলকবিহারী

ভট্টাচার্য। বাড়ি মেমারি। যাচ্ছি গয়াধামে আমার বাবা এবং অন্যান্যদেব পিণ্ডদান করতে। আজকের রাতটুকু শুধু আপনার বাড়িতে আমি থাকতে চাই।"

বৃদ্ধ খুবই খুশি হলেন গোলকের কথায়। বললেন, "নিশ্চয় ভায়া। অমন একটি সৎকর্মে যাচ্ছ যখন, তখন আমার এখানে আহার আশ্রয় কিছুরই অভাব হবে না। আজ রাত্রে এখানে থেকে কাল ভোর ভোর রওনা দিয়ো। গয়া এখান থেকে খুব বেশি দূর নয়। গয়া যাওয়ার সোজা পথটা কাল ভোরে আমি দেখিয়ে দেব। এটা সীমান্তের গ্রাম। বিহার-বাংলা বর্ডার।" এই বলে বৃদ্ধ গোলককে পরম সমাদরে ভেতর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

বেশ অবস্থা সম্পন্ন চাষি পরিবার। ঘর গেবস্থালি জমজম করছে। মেয়েরা রান্নাঘরে রান্না করছে। ছেলেরা দাওয়ায় বসে সুর করে পদ্য পড়ছে।

বৃদ্ধ গোলককে নিজের শোওয়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর শুরু করলেন নানারকমের গালগল্প। এ দেশে নীলকর সাহেবরা কীরকম অত্যাচার করেছে, ইংরেজদের এ দেশ থেকে কেন তাড়ানো হবে না, সেইসব আলোচনা করতে লাগলেন। এরই ফাঁকে এক সময় বললেন, "আমি অনেকদিন ধরে ঠিক তোমারই মতন একজনের প্রতীক্ষা করছিলাম, যে গয়ায় পিণ্ডি দিতে যাবে। গয়ায় যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা। কত বনজঙ্গল নদীনালা পার হয়ে আসতে হবে। পাহাড় পর্বত ডিঙোতে হবে। তা ভায়া আমার একটা উপকার করবে তুমি?"

"বলুন কী উপকার? যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয় তা হলে নিশ্চয়ই করব।"

"তোমার সাধ্যের মধ্যেই হবে। তুমি তো গয়ায় যাচ্ছ, তা বলছিলাম কি, আমি তোমায় কয়েকটা নাম দেব। সেই নামে নামে তুমি একটি করে পিণ্ডি দিয়ে আসবে? এটা যদি তুমি করতে পারো তা হলে তোমার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকব।"

গোলক বলল, "এ আর এমন কী কথা? নিশ্চয়ই দেব। আমি যে শুধু আমার বংশের লোকেদের জন্যই পিণ্ডদান করতে যাচ্ছি তা তো নয়, আমার চেনাজানা বহু লোকের নাম গোত্র লিখে নিয়ে যাচ্ছি। এক এক করে সবাইকেই পিণ্ড দেব।"

"তোমার ভাল হোক। তবে তুমি কিন্তু আমার অনুরোধটাও রক্ষা করবার চেষ্টা কোরো। কেমন?"

"এ-কথা আপনাকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হবে না। আপনি এখনই একটা কাগজে কার কার নামে পিণ্ডদান হবে তা লিখে দিন।"

বৃদ্ধ তো আনন্দের আতিশয্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর গলায় বলতে লাগলেন, "শোনো শোনো, তোমাদের সবাইকেই বলছি। আমাদের বাড়িতে আজ যিনি অতিথি হয়ে এসেছেন তাঁর যেন কোনওরকম অসুবিধা না হয় এখানে। খুব ভাল করে এঁর পরিচর্যা এবং খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করো। ইনি গয়ায় যাচ্ছেন পিণ্ডি দিতে। আমাকে কথা দিয়েছেন আমি যে যে নাম লিখে দেব উনি সেই সেই নামেও একটি করে পিণ্ডি দিয়ে আসবেন।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িসুদ্ধু লোক সবাই দরজার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে গোলককে দেখতে লাগল।

অতগুলো মানুষের জোড়া জোড়া চোখের সামনে খুবই অস্বস্তি হতে লাগল গোলকের।

বৃদ্ধ সেটা বুঝতে পেরে ধমকধামক দিয়ে তাড়ালেন সবাইকে। বললেন, "এ কী অসভ্যতা

করছ তোমরা! উনি তো কথা দিয়েছেন আমাকে। অমন হুমড়ি খেয়ে পড়বার কী আছে? যাও, যে যার কাজে যাও।" বলে সবাইকে হটিয়ে আবার খোসগল্পে মেতে উঠলেন দু'জনে।

গোলক বলল, "কই, নামগুলো লিখে দিন?"

"দেব ভায়া। দেব বলেই তো কতদিন ধরে হা পিত্যেশ করে বসে আছি। আগে খাওয়া দাওয়া হোক। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে সবকিছু করা যাবে।"

এমন সময় একগলা ঘোমটা দিয়ে সম্ভবত বৃদ্ধের পুত্রবধূ দোরগোড়ায় এসে বলল, "ওনার ঠাঁই হয়ে গেছে বাবা। আসতে বলুন।"

বৃদ্ধ বললেন, "হয়েছে? কোথায় দিলে, দালানে?"

"হ্যাঁ।"

বৃদ্ধ গোলককে দালানে এনে বসালেন।

সত্যিকারের ভদ্র পরিবার হলে যা হয়। সকলের সে কী সুমধুর আতিথেয়তা। ভাত ডাল ভাজা মাছের কালিয়া, কোনও কিছুই বাদ নেই। এর ওপর একজন বড় একটি বগি থালায় মস্ত একটি মাছের মুড়ো এনে পাতের কাছে রাখল।

মুড়োর বহর দেখে গোলকের চোখ কপালে উঠে গেল।

বৃদ্ধ বললেন, "এ আমার পুকুরের মাছ ভায়া, আমার বড় ছেলে ধরেছে।"

গোলক বলল, "কিন্তু এতসব আয়োজন আমি খেতে পারব কেন?"

"খুব পারবে। বেশ ভাল করে পেটভরে খাও। কবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ! কবে পৌঁছবে তার ঠিক কি?"

গোলক মাথা হেঁট করে খেয়ে যেতে লাগল।

বৃদ্ধ সেই অবসরে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। অনেক ভেবেচিন্তে একটা নামের তালিকাও তৈরি করে ফেললেন।

তারপর খাওয়াদাওয়ার পর গোলক যখন বিছানায় শুতে এল, বৃদ্ধ তখন তালিকাটি দেখালেন গোলককে। মোট বারোজনের নাম আছে তাতে। এর মধ্যে একটি নাম কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি। বৃদ্ধ বললেন, " তুমি তো পিণ্ডি দেবে, তবে ভায়া হুঁশ রেখো এই নামটি যেন কোনওরকমে বাদ না পড়ে। কেমন?"

গোলক বলল, "না না। বাদ পড়বে কেন? কোনও নামই বাদ পড়বে না।"

কাগজটি যথাস্থানে রেখে গোলক শুয়ে পড়ল। বৃদ্ধও একপাশে শুলেন।

মাটির ঘর। খড়ের চালা। সারাদিনের হাঁটার পরিশ্রমে ক্লান্ত গোলক পরিতৃপ্ত আহারের ফলে শোওয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল বৃদ্ধের ডাকে।

তখন শেষ রাত।

বৃদ্ধ ডাকলেন, "ভায়া! ভায়া হে। এবার উঠে পড়ো। রাত শেষ হয়ে আসছে। অনেক দূরের পথ যেতে হবে তোমাকে।"

গোলক উঠে পড়ল।

তারপর মুখহাত ধুয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

বৃদ্ধ বললেন, "তা হলে ভায়া, যা বললাম, মনে আছে তো? এই নামটা যেন কোনও রকমে বাদ না পড়ে। তবে তোমাকে দিয়েও আমি এমনি কাজ করাব না। তুমি পিণ্ডি দিয়ে ফিরে এলে তোমাকে আমি যা দেব তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু ভায়া একটি

কথা, ওই কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি যেন বাদ না যায়।"

গোলক বলল, "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?"

"করো।"

"আমি তো আপনাকে বারবার বলছি কোনও নামই বাদ পড়বে না। তা সত্ত্বেও আপনি বিশেষভাবে ওই নামটির ওপরই জোর দিচ্ছেন কেন?"

বৃদ্ধ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ওটা আমার নাম।"

গোলকের চোখ তখন কপালে উঠে গেছে, "তার মানে?"

"তা হলে তোমাকে সত্যি কথাটাই খুলে বলি। এই যে তুমি এখানে এসে যাদের দেখলে এরা সবাই আমার পরিজন। কিন্তু এরা সবাই মৃত। এমনকী আমিও। কলেরার মড়কে সেবার গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়ায় আমরা সবাই মরে ভূত হয়ে গেছি, কাজেই তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ তুমি গদাধরের পাদপদ্মে আমাদের নামে একটা করে পিণ্ডি দিয়ে এসো। তা হলে আমরা সবাই উদ্ধার হয়ে যাব।"

গোলক ভয়ে ভয়ে বলল, "আমি তা হলে রওনা হই এবার?"

"হ্যাঁ। চলো তোমাকে একটা সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিই।" এই বলে বৃদ্ধ বাড়ির বাইরে নিয়ে এলেন গোলককে, এসে বললেন, "আর হ্যাঁ। ওই যে ওখানে বেলগাছটা দেখছ, ওই বেলগাছের নীচে আমাদের পিতৃপুরুষের দশ ঘড়া সোনার মোহর পোঁতা আছে। বাড়ি যাওয়ার সময় ওই মোহরগুলো তুমি নিয়ে যেয়ো। তবে একটা কথা। যদি দেখো এই বেলগাছটা শেকড়সুদ্ধু উপড়ে পড়েছে তবেই জানবে আমরা উদ্ধার হয়েছি। এবং ওই মোহরে তুমি হাত দেবে। নচেৎ যদি দিনমানে আসো আমার জন্য সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কেমন?"

গোলক বলল, "আচ্ছা।" বলে বৃদ্ধের নির্দেশিত পথে রওনা হল।

বৃদ্ধ বললেন, "এমনিতে গয়া এখান থেকে সাতদিনের পথ। তবে আমার প্রভাবে তুমি এই পথে গেলে কাল সকালেই পৌঁছে যাবে।"

গোলক সেই পথেই অগ্রসর হল।

যথানিয়মে গয়ায় গিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে সকলকেই পিণ্ডদান করল গোলক। বিশেষ করে বৃদ্ধের অনুরোধে তাঁর পিণ্ডটাই ভাল করে দিল। তারপর মোহরের লোভে আবার এসে উপস্থিত হল সেই স্থানে।

তখন ভর্তি দুপুরবেলা।

রাতের অন্ধকারে বৃদ্ধের যে বাড়িটি সে দেখেছিল সেই বাড়িটি এখন দেখল ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু এ কী! বেলগাছ ওপড়ায়নি কেন? তা হলে কি ওরা উদ্ধার হয়নি? যাই হোক, বৃদ্ধের কথামতো গোলক সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল।

সন্ধের পরই বৃদ্ধের আবছা শরীর ফুটে উঠল সেই ভাঙা বাড়ির ভেতর থেকে। বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে বললেন, "তোমাকে ধন্যবাদ ভায়া। আমার বংশের সবাই উদ্ধার হয়ে গেছে, একমাত্র আমি ছাড়া।"

গোলক বলল, "কেন? আপনার পিণ্ড তো আমি বেশ যত্ন করে খুব ভালভাবে দিয়েছি।"

"তা দিয়েছ। তবে কি জানো, আমি অত্যন্ত খুঁতখুঁতে লোক। আমার পিণ্ডিটার ওপর একটা চুল পড়েছিল। তাই আমি সেটা খেতে পারিনি। তোমাকে আমার জন্য আর একবার কষ্ট করে যেতে হবে লক্ষ্মী ভায়া আমার।"

গোলক বলল, "বেশ, যাব।"

বৃদ্ধ বললেন, "তা হলে আর দেরি না করে তুমি এখনই চলে যাও। সোজা পথটা তোমাকে আমি বাতলে দিচ্ছি।"

বৃদ্ধের নির্দেশমতো পথ ধরে সেই রাত্রেই আবার গয়ায় ফিরে এল গোলক। এবং রাতটা ধর্মশালায় কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার বেশ ভাল করে পিণ্ডি দিল বৃদ্ধের নামে।

তারপর আবার ফিরে এল সেই গ্রামে।

কিন্তু এ কী! বেলগাছ তো ওপড়ায়নি। যেমনকার গাছ তেমনই আছে।

গোলকের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তবু সে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল বৃদ্ধের বাড়িতে।

সন্ধে উত্তীর্ণ হতেই বৃদ্ধের আবির্ভাব হল। একটু যেন কুণ্ঠার সঙ্গেই বৃদ্ধ বললেন, "না ভায়া। আমি আর উদ্ধার হলাম না।"

"কেন? আমার কি আবার ত্রুটি হল?"

"না। এবারে হল কি, অন্যান্য কিছু ভূত যারা আমার বন্ধুবান্ধবের মতো এবং স্থানান্তরে ছিল, তারা কীভাবে যেন খবর পেয়ে এসে হাজির হল আমার কাছে। তারা কিছুতেই আমাকে ছাড়ল না। সবাই এসে হাতেপায়ে ধরতে লাগল। বলল, আমি উদ্ধার হয়ে গেলে ওরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়বে। তাই ওদের মুখ চেয়ে তুমি যখন পিণ্ডি দিচ্ছিলে আমি তখন মুখে বটপাতা চাপা দিয়ে বসে ছিলাম।"

"যাঃ। তা হলে?"

"তা হলে আর কি হবে? আমি যেমনকার তেমনই রইলাম। তবে হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে বেইমানি করব না। ওই বেলগাছের গোড়ায় দশ ঘড়া মোহর পোঁতা আছে। ওসবই তুমি নিয়ে যাও।"

"তা নয় হয় নেব। কিন্তু দশ ঘড়া মোহর আমি বইব কী করে?"

"সে ভাবনা আমার।" বলেই বৃদ্ধ তিনবার হাতে তালি দিলেন, তালি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছিরি চেহারার কিছু ভূত এসে হাজির হল সেখানে।

বৃদ্ধ বললেন, "ওই বেলগাছের নীচে দশ ঘড়া মোহর আছে, বার করো।"

ভূতের তাই করল।

"ওগুলো নিয়ে তোমাদের বর্ধমান জেলায় মেমারি গ্রামে যেতে হবে।"

"ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"যথা আজ্ঞা। উনিও তা হলে আমাদের সঙ্গেই আসুন না কেন?"

বৃদ্ধ বললেন, "খুবই ভাল হয় তা হলে। তবে একটা কথা, উনি কিন্তু আমার অতিথি এবং আমার বিশেষ উপকার করেছেন। ওঁর যেন কোনওরকম অসুবিধে না হয়। সেদিকে কিন্তু নজর রেখো।"

ভূতেরা বলল, "সে আমরা জানি। ও বিষয়ে কিছু বলে দিতে হবে না আপনাকে। ওঁকে আমরা রাজার মর্যাদায় নিয়ে যাব।

বৃদ্ধের কথামতো ভূতেদের সাহায্যে গোলক দশ ঘড়া মোহর নিয়ে ঘরে ফিরল। সে এবং তার বাড়ির লোকেরা খুব চাপা বলে মোহরের কথা কেউ জানতে পারল না। অল্পদিনের মধ্যেই গোলক মস্ত বড়লোক হয়ে উঠল।

রাত্রির যাত্রী

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। এক শীতের রাতে রাজীব আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হল। খেয়েদেয়ে তখন শুতে যাচ্ছি। এমন সময় রাজীব এল। রাজীব আমার পুরনো বন্ধু। ব্যান্ডেলে থাকে। বললাম, "কী ব্যাপার, এমন সময় তুই হঠাৎ?"

রাজীব হেসে বলল, "বলছি বলছি। এখন কী খেতে দিবি তাই বল। দারুণ খিদে পেয়েছে।"

"কী খাবি বল? লুচি আর আলুভাজা খা বরং।"

"ওরে বাবা। লুচি খেলে আমার অম্বল হয়। তুই ভাতের ব্যবস্থা কর।"

"তা হলে স্টোভে ভাত বসিয়ে দিই। আর ডিমের ঝোল।"

"অত ঝঞ্ঝাটের দরকার কী? ভাতের মধ্যে ডিম দিয়ে দে। ঘি থাকে তো আরও ভাল। গরম ভাতে ঘি মেখে ডিমসেদ্ধ দিয়ে চমৎকার খাওয়া হবে।" এই বলে জামাপ্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি আর সোয়েটার পরে আমার তক্তাপোশের বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে গা এলিয়ে দিল। তারপর বলল, "তুই তো দেশ-দেশান্তরে ঘুরিস। পাটনায় গেছিস কখনও?"

"না। কেন বল তো?"

"একটা অদ্ভুতুড়ে চিঠি এসেছে। আমাকে কালই পাটনা যেতে হবে। তুই যাবি ভাই আমার সঙ্গে? আমি তো কখনও বাইরে বেরোইনি। ছেলেবেলায় মা-বাবার সঙ্গে একবার দেওঘর গিয়েছিলাম।"

বললাম, "যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু আজকাল যা ট্রেনের অবস্থা তাতে বিনা রিজার্ভেশনে ট্রেনে ওঠাই তো মুশকিল।"

"সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। আমার ছোট জামাইবাবু রেলের বুকিং ক্লার্ক। পাঞ্জাব মেলের দুটো বার্থের কথা তাকে বলে রেখেছি। এখন তুই যদি যাস তো ভাল হয়। না হলে আমাকে একাই যেতে হবে।"

"কেন, কী ব্যাপার! হঠাৎ পাটনায় যাবি কেন? কী এমন চিঠি এল তোর?"

"এই দেখ।" বলে উঠে গিয়ে হ্যাঙারে ঝোলানো ওর জামার পকেট থেকে একটা চিঠি এনে আমাকে দেখাল। 'অন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সার্ভিস' ছাপ দেওয়া একটা খাম। আমি সেটা হাতে নিয়ে তার ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে পড়লাম। তারপর বেশ খুশির সঙ্গেই বললাম, "এ তো রেডিয়ো অফিস থেকে এসেছে। তুই রেডিয়োতে ভজন গাইবি বলে আবেদন করেছিলি, তাই ওরা তোকে ভয়েস টেস্টের জন্য ডেকেছে। কাল বাদে পরশু তোর টেস্ট। তার মানে কাল রাত্রে পাঞ্জাব মেলে যেতে পারলে পরশু ভোরে নামা। তারপর দুপুর দুটোয় পরীক্ষা দিয়ে সন্ধের সময় ট্রেনে চাপলে সকাল হলেই হাওড়ায়। মাত্র দু'-তিনদিনের মামলা।"

"হ্যাঁ। মামলাটা দু'-তিনদিনের। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমি কলকাতা সেন্টার

থাকতে পাটনায় ভয়েস টেস্ট দিতে যাব কেন? আর তার চেয়েও বড় কথা, রেডিয়োয় গান গাইবার জন্য আমি কোনও সময়েই কোনও আবেদন করিনি।"

"তবে তো কথাই নেই। চিঠিটা ছিঁড়ে কুচিয়ে ফেলে দিয়ে দু'দিন এখানে বিশ্রাম নিয়ে গল্পেরই বই পড়। সিনেমা দেখ। এইসব কর।"

"তাই করতাম। কিন্তু এইবার দ্যাখ। এই চিঠিটা পড়।" বলে আর একটা চিঠি আমার হাতে দিয়ে রাজীব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

সে চিঠিটা এইরকম: "ভাই রাজীব, আমি অভিজিৎ, তোকে এই চিঠি লিখছি। তোর হয়তো আমার কথা মনে নেই। কিন্তু আমি তোকে ভুলিনি এখনও। স্কুলে লাস্ট বেঞ্চে বসে তুই গুনগুন করে গান গাইতিস, আর আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। একদিন এই গান গাওয়া নিয়ে চঞ্চলবাবু স্যার তোকে কী মার মেরেছিলেন মনে আছে তো? যাই হোক, আমি এখানে দরিয়াপুরে একটা পুরনো বাড়ি কিনেছি। এলাকাটা মুসলমানপ্রধান। সেটা কোনও ব্যাপার নয়। তোর বকলমে আমি এখানকার রেডিয়ো সেন্টারে একটা আবেদনপত্র পেশ করেছি। তুই আয়। আমার জানাশোনা লোক আছে। তোর হয়ে যাবে। এখানে দু'-চারটে কল পাওয়ার পর কলকাতা সেন্টারে তোর একটা ট্রান্সফারের ব্যবস্থা আমি করে দেব। শুনলুম এখনও বিয়ে করিসনি তুই। গর্দভ কোথাকার! যদি পারিস তো জহরটাকেও সঙ্গে আনিস। ওটাও তো তোর মতো। টো টো করে চারদিকে শুধু ঘুরে বেড়ায়।"

চিঠিটা পড়ে আমি যারপরনাই অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, "কী আশ্চর্য! এ তো আমারও নাম লিখেছে দেখছি। কিন্তু তুই আমি তো এক স্কুলে পড়তাম না। তবে এক কোচিং-এ পড়েছি। অভিজিৎ কে? ও নামে কাউকে কখনও চিনতাম বলেও তো মনে পড়ছে না।"

"আমারও কিছু মনে পড়ছে না। কে অভিজিৎ? অথচ চিঠিটা এমনভাবে লেখা, যেন সে আমাদের দু'জনেরই অত্যন্ত পরিচিত।"

"কেউ আমাদের ব্ল্যাকমেল করছে না তো?"

"তাতে লাভ? আমরা তো টাকার থলি নিয়ে সেখানে যাচ্ছি না। আমাদের ব্ল্যাকমেল করে কী করবে?"

"আমি বলি কি সাড়াশব্দ না করে চেপে যা ব্যাপারটা।"

"দেখ ভাই, গান আমি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। কাজেই গাইতে পারব না। তানপুরা টানপুরা কিছুই আর নেই। তবুও বিশ্বাস কর, এই আমন্ত্রণে আমার রক্তে দোলা লেগেছে। দেখিই না একবার পরীক্ষাটা দিয়ে। যদি উতরে যাই? অবশ্য অভিজিতের ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। তবু ওর সঙ্গে দেখা করি। হয়তো কখনও না কখনও পরিচয় ছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ও আমার ঠিকানা জানল কী করে? ব্যান্ডেলে আমরা নতুন গেছি বাড়ি তৈরি করে। এ ঠিকানা তো ওর জানবার কথা নয়।"

"আমি তবুও বলছি, ও আশা ছাড়। বরং কোথাও বেড়াতে যেতে চাস তো চল ঘুরে আসি দু-চারদিন।"

"তা হলে আমাকে একাই যেতে হচ্ছে।"

"আঃ হা। তুই ভুল বুঝছিস আমাকে। আমি কি সেই কথাই বলছি? শুধু তাই নয়, তুই ভেবে দেখ, রেডিয়ো একটা সরকারি সংস্থা। অ্যাপ্লিকেশনে তোর নিজের সই নেই। অন্যে তোর হয়ে সই করেছে। অথচ তুই ওই জাল আবেদনপত্রের ডাকে পরীক্ষা দিতে যাবি। এটা

কি একটা দু'-নম্বরি ব্যাপার নয়? ধরা পড়লে কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।"

"হয় হবে। তবু যাব। এবং দেখব অভিজিৎটা কে?"

"চল তবে।"

"আমি মুখে ওকে বারণ করলেও কৌতূহল আমারও বড় কম ছিল না! সে রাতটা দু'বন্ধুতে গল্পগুজবে কাটিয়ে পরদিন সকালে রিজার্ভেশনেব জন্য গেলাম। টিকিটের অবশ্য অসুবিধে হল না। ওর ছোট জামাইবাবুর সৌজন্যে ফাইভ আপে দুটো বার্থ পেয়ে গেলাম। সঙ্গে টাকাকড়িও নিলাম বেশি করে। ঠিক হল পাটনার কাজ শেষ হলে রাজগির কিংবা বেনারসে গিয়ে কাটিয়ে আসব কয়েকটা দিন। এখন অঘ্রানের শেষ। এই কনকনে শীতে বিহার ইউ. পি.র দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে বেড়াতে মন্দ লাগবে না!

সে কী দারুণ আনন্দ! পরদিন রাতের গাড়িতে পাটনা কোচের থ্রি-টায়ারে শুয়ে হোটেলের কষা মাংস আর তন্দুরি রুটি খেতে খেতে মনে হল, যেন বদ্ধ খাঁচা থেকে মুক্ত হওয়া পাখির মতো ডানা মেলে উড়ছি। প্রচণ্ড শীতের দাপটটাকে ঢাকতে সারা গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ট্রেনের দোলায় দুলতে দুলতে কখনও জেগে, কখনও ঘুমিয়ে এক অপূর্ব নিশিযাপন করতে লাগলাম।

শেষ রাত্রে ট্রেন পাটনা জংশনে এল। আমরা কনকনে শীতের মধ্যে ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের ওভারব্রিজ পার হয়ে ওপারে গেলাম। তারপর গেটে টিকিট জমা দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিংরুমে গিয়ে দাঁড়ালাম। চারদিকে লোকজন। কোথাও পা রাখার জায়গা নেই। এই দারুণ শীতে কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে মেঝেতেই শুয়ে আছে সব।

আমবা অযথা এদিক-সেদিক পায়চারি করতে লাগলাম। বসবার জায়গা না পেয়ে স্টেশনের বাইরে এসে স্টেশনের কাছে একটা চায়ের দোকানে চায়ের অর্ডার দিলাম। বাইরে তারা-ঝলমলে শেষরাতের আকাশ। আলোকমালায় সজ্জিত পাটনা শহর। সত্যি বলতে কি সেই প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে এই নতুন পরিবেশে এইরকম একটি মুহূর্তে গাঢ় দুধের তৈরি গরম চা ভাঁড়ে করে খেতে যে কী আরাম পেয়েছিলাম, তা বলে বোঝাতে পারব না।

আমরা যখন চা খাচ্ছি তখন হর্ন বাজিয়ে একটা সাইকেল রিকশা এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল, "আইয়ে বাবু রাজেন্দ্রনগর?"

আমরা বললাম, "রাজেন্দ্রনগর নয়। দরিয়াপুর।"

"চলিয়ে।"

চা খাওয়া শেষ করে দাম মিটিয়ে বললাম, "যাব। কিন্তু এত অন্ধকারে নয়। ভোরবেলা যাব।"

"এখন গেলে কি হোবে? সামান্য দুটো টাকার লোভে আপনাদের অন্য কোথাউ লিয়ে গিয়ে কি খুন করিয়ে ফেলব?"

"না না। তা বলছি না। মানে নতুন আসছি তো! এখন গেলে ঠিকানা খুঁজে বাড়ি চিনতে অসুবিধে হবে।"

"কুছু ওসুবিধা হোবে না আপনাদের। অভিজিৎবাবুর কাছে যাঁরা আসেন তাঁদের কোনও ওসুবিধা হামি করে না।"

আমরা দু'জনেই চমকে উঠলাম। বললাম, "তুমি কী করে জানলে আমরা অভিজিৎবাবুর কাছে যাচ্ছি?"

"উনি হামাকে বোলে রেখেছিলেন দু'জন বাঙালি ছোকরা হামার বাড়িতে আসবে। তাদের কোনও ওসুবিধা যাতে না হয় সেইভাবে এখানে লিয়ে আসতে।"

"কিন্তু আমরা যে এই গাড়িতেই আসব তোমার অভিজিৎবাবু তা জানলেন কী করে?"

"অভিজিৎবাবুর কাছে যাঁরা আসেন তাঁরা রাতের গাড়িতেই আসেন বাবু।"

"অ। তা আমরাই যে সেই লোক তুমি জানলে কী করে?"

"হামি যখন রাজেন্দ্রনগর বোললাম আপনারা তখন দরিয়াপুর বোললেন। তাতেই বুঝলাম, আপনারা তারাই।"

আমরা দু'জনে পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে চোখে চোখে সম্মতি জানিয়ে রিকশায় উঠে বসলাম।

আলোকোজ্জ্বল পাটনা শহরের বুকে রাত্রির যাত্রী আমরা প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে রিকশায় চলেছি। রিকশা সমানে ভেঁপু বাজিয়ে দ্রুতগতিতে এ-পথ সে-পথ করে দরিয়াপুরের দিকে এগিয়ে চলল। এইভাবে অনেকটা পথ যাওয়ার পর বড় রাস্তা ছেড়ে বস্তি অঞ্চলের গলিতে ঢুকল রিকশা। এতক্ষণ তবু পথেঘাটে দু'-একজন মানুষ বা কোনও না কোনও যানবাহন নজরে পড়ছিল। দোকানপাট বন্ধ থাকলেও রোড লাইটে পথঘাট উজ্জ্বল ছিল। এখন এই গলির নরকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। এ-গলি সে-গলি করে কোথায় যে নিয়ে চলল সে, তা কে জানে? তারপর একটা বাড়ির সামনে এসে অনবরত ভেঁপু বাজাতে লাগল।

আমরা বললান, "এই বাড়ি নাকি?"

"হ্যাঁ। এই বাড়ি। ইয়ে মকান অভিজিৎবাবুকা।"

আমরা তখন দরজায় কড়া নেড়ে ডাকতে লাগলাম, "অভিজিৎ। অভিজিৎ।"

দু-একবার ডাকার পরই ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল। "হ্যাঁ। এক মিনিট দাঁড়া।"

আমরা দরজা খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল, রিকশাটা নেই। তাই তো! গেল কোথায়? ভাড়াও তো দেওয়া হয়নি। চেয়ে দেখলাম রিকশাটা গলির বাঁকে হারিয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় দরজা খুলে গেল। কেউ একজন হাসিমুখে বলল, "ভেতরে আয়।"

আমরা অভিজিৎকে চিনতে পারলাম না। বুঝলাম কোথাও একটা ভুল হচ্ছে হয়তো। অভিজিৎকে না চেনার কারণও আছে অবশ্য। ওর সারা গায়ে কম্বল মুড়ি দেওয়া ছিল। মাথায় ছিল মাঙ্কি ক্যাপ। শুধু ওর চোখ দুটি বোঝা যাচ্ছিল।

যাই হোক, অভিজিতের পেছন পেছন আমরা ঘরে ঢুকে সোফায় বসলাম। ঘরের দেওয়ালে অনেক আঁকা ছবি টাঙানো আছে। অভিজিৎ হেসে বলল, "ওগুলো আমারই আঁকা।"

আমি বললাম, "তোমার চিঠি পেয়েই আমরা চলে এসেছি। কারণ রেডিয়ো প্রোগ্রামের তারিখ আজই। অথচ আশ্চর্য দেখো, তোমার কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি এখনও চিনতে অসুবিধে হচ্ছে তোমাকে।"

"চা না কফি?"

রাজীব বলল, "এই তো চা খেয়ে এলাম। তবে যা দারুণ ঠাণ্ডা, তাতে এবার একটু কফি হলে মন্দ হয় না।"

অভিজিৎ উঠে গেল। তারপর আমাদের দু'জনের জন্য দু' কাপ কফি নিয়ে চলে এল।

সঙ্গে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট। আশ্চর্য! কফিও কি আমাদের জন্য তৈরি ছিল?

অভিজিৎ বলল, "খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিস না? মুখটা ঠিক মনে করতে পারছিস না। ভাবছিস কে না কে নকশা করছে হয়তো।"

আমি বললাম, "ঠিক তাই।"

অভিজিৎ বলল, "আজকে এই ট্রেনে এসেই ভাল করেছিস তোরা। না হলে পরে এলে দেখা হত না। হঠাৎ একটা দরকারি কাজ পড়ে যাওয়ায় একটু পরেই আমাকে দানাপুর চলে যেতে হবে। সেজন্য অবশ্য তোদের থাকার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি চাবি দিয়ে যাব। তোরা বাইরে যাওয়ার সময় মেন গেটে তালা দিয়ে চলে যাস। অনেক হোটেল আছে এখানে। যেখানে হোক খেয়ে নিয়ে ঠিক দুটোর সময় রেডিয়ো স্টেশনে চলে যাবি। তবে ভাই একটা কথা। আমার ওপর রাগ করে কাজ মিটে গেলে চলে যাস না যেন। আমি সন্ধের সময় ফিরব। তারপর তিন বন্ধুতে রান্না-খাওয়া করে হইহল্লায় কাটিয়ে দেব সারাটি রাত।"

রাজীব কফি খেতে খেতে বলল, "তা তো বুঝলাম। কিন্তু ভাই একটা কথা। এখানকার অ্যাপ্লিকেশনে যে সিগনেচার করা আছে তার সঙ্গে তো আমার সই মিলবে না। এতে কোনও অসুবিধে হবে না তো?"

"না না। কোনও অসুবিধে হবে না। ওখানে গিয়ে ঝা'জির খোঁজ করবি। ঝা'জি সব জানে। তাকে বলবি আমি পাঠিয়েছি তোকে। আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না।"

আমাদের কফি খাওয়া যখন শেষ হল তখন একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। অভিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কিছু মনে করিস না ভাই, আমি চলি। আর আমার থাকার উপায় নেই। আমি ওদিক দিয়ে দরজায় শিকল এঁটে চলে যাচ্ছি। তোরা বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যাস। এই নে তালাচাবি।"

আমরা হাত পেতে তালাচাবি নিলাম।

"একটা দিন একটু মানিয়ে নে। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমাকে যেতে হচ্ছে।" বলে ভেতরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল অভিজিৎ।

আমরা দু'জনে চুপচাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর বাইরে বেরিয়ে দেখলাম জল কল খাটা পায়খানা সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে। আমরা দাঁত মেজে মুখহাত ধুয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে মেন গেটে তালা দিয়ে বাইরে এলাম। সবে সকাল ছ'টা। ভয়েস টেস্ট দুপুর দুটোয়। যার আতিথ্যে এলাম সে-ই যখন নেই তখন মিছিমিছি এখানে বসে থেকে সময় নষ্ট করে লাভ কী? তার চেয়ে পাটনা শহরটা একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখে নিই। পাটনা তো আমাদের কাছে পাটনা নয়। পাটলিপুত্র। মগধের রাজধানী। সেই চোখ নিয়ে দেখতে হবে। দু' টাকা ঘণ্টা হিসাবে একটা রিকশা ভাড়া করে গোটা শহরটা আমরা প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। অনেক ঘোরাঘুরির পর মহেন্দ্রুনগরে এসে আমরা রিকশা ছাড়লাম। এখানে এসে অনেকক্ষণ ধরে দোতলার বারান্দায় বসে গঙ্গার সৌন্দর্য দেখলাম। তারপর একটা হোটেলে খেয়ে ঠিক দুটোর সময় এসে হাজির হলাম পাটনা বেতার কেন্দ্রে।

আমরা অফিসঘরে গিয়ে কাগজ জমা দিতেই ওখানকার ইনচার্জ একবার তাকিয়ে দেখলেন আমাদের দিকে! তারপর হেসে বললেন, "কে পাঠিয়েছে আপনাদের, অভিজিৎবাবু?"

আশ্চর্য তো! লোকটা জানল কী করে! বললাম, "হ্যাঁ, অভিজিৎবাবু আমাদের পাঠিয়েছেন। তবে আপনাদের চিঠি পেয়েই আমরা এসেছি। আপনি কি ঝা'জি?"

"জি হ্যাঁ। কোথা থেকে আসছেন আপনারা?"

"এখন অভিজিৎবাবুর বাড়ি থেকে আসছি।"

"হুঁ। তা বলুন, আমি কী করতে পারি আপনাদের জন্য?"

"কী আর করবেন? আমার বন্ধু রাজীব পাটনা বেতার কেন্দ্র থেকে গান গাইবে। ওর ভয়েসটা টেস্ট করে ছেড়ে দিন।"

"আপনারা কলকাতায় কোথায় থাকেন?"

"আজ্ঞে ঠিক কলকাতায় নয়। আমি থাকি হাওড়ায়। আর আমার এই বন্ধুটি থাকেন ব্যান্ডেলে।"

ঝা'জি বললেন, "কিন্তু যে চিঠি আপনারা এনেছেন সেই চিঠির ওপর ভরসা করে কি আমি আপনার বন্ধুর ভয়েস টেস্ট করতে পারি?"

"কেন পারেন না? এ তো আপনাদেরই দেওয়া চিঠি।"

"স্বীকার করলাম। কিন্তু এতে রাজীববাবুর নাম কোথায়? এ তো অন্য নাম দেখছি।"

"তার মানে? আমরা দু'জনেই চিঠিটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখলাম তাতে পরিষ্কার লেখা আছে আমার নাম। বললাম—কী ব্যাপার! আমার নাম কেন? আমি তো গানই গাইতে পারি না। তা ছাড়া আমি কোনও আবেদনও করিনি।"

"আবেদন তো উনিও করেননি। ওঁর হয়ে অভিজিৎবাবু করেছিলেন।"

"সে যেই করুক। এই চিঠি যখন হাতে পেয়েছিলাম আমরা, তখনও কিন্তু রাজীবের নামই লেখা ছিল এতে।"

"তা হলে কি বলতে চান আমি কোনও কারসাজি করেছি এতে?"

"না না সে কী কথা।" বলে বললাম, "আচ্ছা খামটা একবার দেখি?"

"ঝা'জি আমাদের খাম দিলে তাতেও আমার নাম এবং বাড়ির ঠিকানা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কী আশ্চর্য! এই ঠিকানায় চিঠি এলে সে চিঠি তো আমি পেতাম। ব্যান্ডেলে বসে রাজীব পাবে কেন? এই শীতেও আমাদের কপালে ঘাম দেখা দিল।

ঝা'জি কঠিন গলায় বললেন, "গভর্নমেন্টকে চিট করতে আসার জন্য আমি আপনাদের দু'জনকেই পুলিশে দেব।"

আমরা সভয়ে বললাম, "ঝা'জি, প্লিজ। আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা জোচ্চোর নই। আসলে আমরা বোকা বনে গেছি। কেউ আমাদের বিপদে ফেলবে বলে এই টোপ ফেলে এ কাজ করেছে।"

ঝা'জি হেসে বললেন, "যাক, আপনাদের অবস্থা দেখে খুব হাসি পাচ্ছে আমার। তবু আপনাদের জন্য মায়াও হচ্ছে। ঠিক আছে। রাজীববাবু, আপনি এক কাজ করুন, ব্যাক ডেটে একটা অ্যাপ্লিকেশন করুন। তারপর দেখছি আপনার ভয়েসটা টেস্ট করে আপনার জন্য কিছু করতে পারি কিনা।"

রাজীব তাই করল।

ঝা'জি ওকে নিয়ে গেলেন স্টুডিয়োর ভেতরে। তারপর প্রায় আধঘণ্টাটাক বাদে যখন ফিরে এলেন তখন রাজীবের মুখ বেশ প্রসন্ন।

ঝা'জি বললেন, "আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে আপনি অভিজিৎবাবুর ঠিকানাটাই দিয়েছেন তো?"

রাজীব বলল, "হ্যাঁ।"

"ঠিক করেছেন। কেননা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসে পাটনায় অডিশন দেওয়া বা প্রোগ্রাম পাওয়া যায় না। তবে আপনার কেসটা আলাদা। আপনি ফর্মের পেছনে আপনার ব্যান্ডেলের ঠিকানাটা লিখে দিন। পাশ করলে বা প্রোগ্রাম পেলে চিঠি দেব। মনে হচ্ছে আপনার হয়ে যাবে। আপনার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। তবু আমি তো ফাইনাল অথরিটি নই। ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে গিয়ে বেশ পুরোদমে সঙ্গীতচর্চা চালিয়ে যান। যদি পাশ করে যান তা হলে খুব শিগগিরই গাইতে আসতে হবে।"

আমরা বললাম, "প্রোগ্রাম পেলে কতদিন বাদে পাওয়া যাবে।"

"তা মাসতিনেকের মধ্যে।"

আমরা নমস্কার জানিয়ে উঠতেই ঝা'জি বললেন, "কোথায় যাবেন এখন?"

"এখন আর যাব কোথায়? অভিজিতের ওখানেই যাব।"

ঝা'জি বললেন, "আপনারা দেখছি রীতিমতো সম্মোহিত হয়েছেন। আচ্ছা, আপনাদের কি একবারের জন্যও মনে হল না যে, এই নামে আপনাদের কোনও বন্ধু নেই।"

অমাবস্যার মতো অন্ধকার হয়ে গেল আমাদের মুখ। ঝা'জি এ-কথা জানলেন কী করে? সত্যিই তো, এ নামে তো আমাদের কোনও বন্ধু নেই। আমরা কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

"তার আগে বলুন আপনারা এসেছেন কখন? কোন গাড়িতে?"

"পাঞ্জাব মেলে। ভোরবেলায়।"

"ওর বাড়িতে গিয়েছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খুব বরাতজোর যে, ভোরবেলা গেছেন। না হলে রাত্রে গিয়ে ওর সঙ্গে সারারাত থাকলে পাগল হয়ে যেতেন।"

"সে কী!"

আরে মশাই, অভিজিৎ বলে কেউ ওখানে থাকে না । তবে একসময় থাকত। আমার বিশেষ বন্ধুলোক ছিল। আজ থেকে প্রায় সাত-আট বছর আগে ওই বাড়িটা কেনার পরই ও এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকের হাতে খুন হয়। আসলে যে বাড়িটা ও কিনেছিল সেটা ছিল মুসলমানদের বাড়ি। ভাল করে কাগজপত্র খতিয়ে না দেখে কেনার ফলে অন্য এক শরিক এসে ওকে খুন করে। তারপর থেকে প্রায়ই দেখা যায় ছ'মাস এক বছর অন্তর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেছে বেছে বাঙালি ছেলেমেয়েদের এইভাবে উড়ো চিঠি দিয়ে ও এখানে ডেকে আনছে। এবং ওর অলৌকিকত্বর নিদর্শন হিসেবে প্রতিবারই দেখা যাচ্ছে পরীক্ষার্থী তার কাগজ জমা দেওয়ার পর কাগজে হয় অন্য নাম-ঠিকানা ফুটে উঠেছে, নয়তো কাগজ একদম সাদা হয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে আমরা তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি ভাই। এমনিতে অভিজিৎ খুবই ভাল ছেলে ছিল । গানবাজনা করত। ছবি আঁকত। তা যাক, আপনারা যেন ভুলেও ও বাড়িতে রাত কাটাতে যাবেন না। সোজা স্টেশনে গিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।"

আমরা কালবিলম্ব না করে স্টেশনে চলে এলাম, এবং বেশি টাকা দিয়ে সিক্স ডাউনের পাটনা কোচে দুটো স্লিপার বার্থ রিজার্ভ করে সে রাতেই পালিয়ে এলাম। ঝা'জি অবশ্য কথা রেখেছিলেন। কিছুদিন পরেই ভদ্রতা করে সরকারিভাবে চিঠি দিয়ে রাজীবকে পাটনা বেতার কেন্দ্রের ভয়েস টেস্টে উত্তীর্ণ হতে না পারার কথাটা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

রাতদুপুরে

যখনকার কথা বলছি তখন বাঁকড়া, শলপ প্রভৃতি জায়গাগুলো অজ পাড়াগাঁ ছিল। আর চারদিক ছিল বনজঙ্গলে ভর্তি। মার্টিন কোম্পানির রেলগাড়ি তখন লোকের উঠোনের ওপর দিয়ে, পুঁইমাচার পাশ দিয়ে ছাগলের মতো মুখ নেড়ে নেড়ে যেত। সেই সময় একবার কলেরাব মহামারী দেখা দেয় ওই অঞ্চলে।

আমার মামা তখন শখেব দলে যাত্রা করত। আর মাঝে মাঝে মড়া পোড়াতে যেত। সেদিন সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। শলপের এক বুড়ি মারা গেছে মহামারীতে। বুড়ি খুব গরিব। তার ওপর কেউ কোথাও নেই তার। কাজেই সারাদিন পড়ে থাকা সত্ত্বেও সৎকাব হয়নি। খবর পেয়ে মামা এবং আরও তিন সঙ্গী মিলে বুড়ির গতি করতে চলল।

সন্ধের পর খবর পেয়ে তারপর তোড়জোড় করে মড়া নিয়ে আসতে রাত্রি হয়ে গেল অনেক।

পথে কোনও জনপ্রাণী নেই। মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক ও সেইসঙ্গে কুকুরের ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর শোনা যাচ্ছে। ঝিমঝিম করে বৃষ্টিও পড়ছে ক্রমাগত।

বাঁশতলার শ্মশান অনেক দূরের পথ। শববাহকেরা মাঝে মাঝে হরিধ্বনি দিয়ে মড়া নিয়ে আসতে লাগল।

মামা ছিল সামনের দিকে। আসতে আসতে হঠাৎ মনে হল কে যেন মুঠো করে চেপে ধরল মামার ডান হাতের কব্জিটাকে। হিমশীতল বরফের মতো সেই হাত। হাতটা ক্রমশ আরও জোরে চেপে ধরতে লাগল কব্জিটাকে। মামা বাঁ হাতে করে অনেক চেষ্টা করতে লাগল সেই হাতটাকে ছাড়াবার। কিন্তু না, সব চেষ্টাই বিফল হল।

এদিকে শববাহকেরা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল খুব। আমার মামার নাম চণ্ডী ব্যানার্জি। একজন বলল, "এবার মড়াটাকে নামিয়ে কোথাও একটু বসা যাক। কী বলো চণ্ডীদা? বড্ড হাঁফিয়ে পড়েছি।"

অন্যান্য সঙ্গীরাও বলল, "হ্যাঁ, সেই ভাল। অনেকক্ষণ হাঁটছি। পা ভেরিয়ে পড়েছে এবার।"

মামা দেখল, এই অবস্থায় যদি সত্যি-সত্যিই মড়া নামাতে হয় তা হলে বিপদের আর শেষ থাকবে না। কেননা যে কোনও উপায়েই হোক মৃতের হাত কব্জিটাকে টিপে ধরে আছে এবং সে হাত যখন ছাড়ানো যাচ্ছে না তখন মড়া নামানোর পর সেই দৃশ্য দেখলেই সঙ্গীরা ভয়ে পালাবে। এবং ব্যাপারটা যদি ভৌতিক, মানে দানো পাওয়া গোছের কিছু হয়, তা হলে মামারও আর নিস্তার থাকবে না। এই রাতে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে। তাই বুদ্ধি করে মামা বলল, "তোদের কি মাথাখারাপ হয়েছে? এই ঝিমঝিমে বৃষ্টিতে মড়া নিয়ে রাখবি কোথায়?"

"যে কোনও একটা গাছতলায়।"

"না। রাত্রিবেলা মড়া যেখানে-সেখানে নামাতে নেই।"

শববাহকেরা চলতে লাগল।

এদিকে হাতের মুঠোও ক্রমশ এমনই কঠিনতর হতে লাগল যে, মামার চোখ ফেটে জল আসতে লাগল তখন।

শববাহকেরা আবার বলল, "চণ্ডীদা, আর পারছি না।"

মামা বলল, "পারতেই হবে। কদমতলার মোড় পর্যন্ত যেতেই হবে যেমন করে হোক। এই তো শানপুরের কালীতলা পেরিয়ে এলুম, আব একটু চ'।"

"না। এখানেই নামাও। মড়াটা বড্ড ভারী হয়ে উঠেছে। তাই পা চলছে না আর।"

মামা ধমক দিয়ে বলল, "এত অধৈর্য তো এলি কেন? একে কলেরার মড়া, সারাদিন পড়ে আছে। তার ওপর শনিবার। সঙ্গে কোনও মোচা বা গোবর দেওয়া নেই। যেখানে-সেখানে মড়া নামিয়ে মরবি নাকি?"

এর পর আর কথা চলে না। অকাট্য যুক্তি। মামার কথা মেনে নিয়ে সবাই জোরে জোরে হরিবোল দিয়ে চলতে লাগল।

দেখতে দেখতে কদমতলা এসে গেল। রাতও শেষ হয়ে এসেছে তখন। কদমতলার মোড়ে একটা মিষ্টির দোকান ছিল। তারা তখন ঘুম থেকে উঠে যে যার কাজে লেগে পড়েছে।

শববাহকেরা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।

মামা বলল, "এখুনি নামাস না। আগে একটা লোহা-টোহা কিছু দেওয়া হোক। তারপর মড়া নামিয়ে চা-টা খেয়ে আবার যাব।" বলে দোকানের ছোকরা চাকরটাকে ডাক দিল, "গনশা! এই গনশা—।"

মামার গলা পেয়ে গনশা বেরিয়ে এল, "কে? চণ্ডীদা?"

"হ্যাঁ। শিগগির একবার আলোটা নিয়ে আয় তো ভাই।"

গনশা লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এল।

গনশা আসতেই মামা বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে ইঙ্গিতে ডান হাতটা দেখিয়ে দিল।

দ্যাখামাত্রই গনশাও বুঝে নিল ব্যাপারটা। বলল, "একটু দাঁড়াও। মড়া নামিও না। এক মিনিট।" বলেই ছুটে ভেতরে গিয়ে কুডুলটা নিয়ে এসে বুড়ির হাতের ওপর বসিয়ে দিল এক কোপ।

মৃতের কঠিন হাত আলগা হয়ে খসে পড়ল। যেই না পড়া অমনই কেঁধোরা ভয়ে কাঁধের মড়া খাটিয়াসুদ্ধু ছুড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়ল দোকানের ভেতর। মামাও তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

তারপর তো সে মড়া নিয়ে আর কেউ পোড়াতে যেতে রাজি হয় না। অবশেষে সবাই অনেক করে বোঝাতে পরদিন সকালে আরও দু-একজনকে সঙ্গে করে বুড়িকে নিয়ে চলল দাহ করতে। তবে আমার মামা কিন্তু সেই থেকে আর কখনও মড়া পোড়াতে যায়নি। মড়া পোড়ানোর নামে মামার সেই আতঙ্কটা এখনও রয়ে গেছে।

রোমহর্ষক

১৩৪০ সালের কথা।

তখন বর্ষাকাল। সেদিন আবার সকাল থেকেই দুর্যোগ। পানপুর গ্রামের ধনা পণ্ডিত হঠাৎ সর্পাঘাতে মারা গেল। ধনা পণ্ডিত নাম হলেও আসলে সে ছিল চাঁড়াল পাড়ার বাসিন্দে। তখনকার দিনে সর্পাঘাতে কোনও লোক মারা গেলে তাকে না পুড়িয়ে নদী অথবা খালের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত। ধনা পণ্ডিতের বেলাতেও সেইরকমের তোড়জোড় হতে লাগল। বড় বড় কয়েকটা কলাগাছ কেটে তারই মাঞ্জাসে ধনা পণ্ডিতকে দড়ি দিয়ে বেঁধে শুইয়ে দেওয়া হল। তারপর সন্ধের একটু আগে প্রবল বর্ষণে ভিজতে ভিজতে সকলে মিলে ধনা পণ্ডিতকে গ্রামের প্রান্তে কানা নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এল।

ধনা পণ্ডিতের বাড়ির অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। স্ত্রী এবং দুটি ছোট মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না ধনার। ধনার বউ সারারাত ধরে কান্নাকাটি করতে লাগল।

এর ঠিক দু'দিন বাদে হঠাৎ দুপুরবেলা হইহই করে উঠল গ্রামের লোক। কী ব্যাপার? না, ধনা পণ্ডিত ফিরে এসেছে। তবে জীবিত অবস্থায় নয়, মৃতই। যারা খবব দিল তাদের মুখে এই কথা শুনে সবাই ছুটল নদীর ধারে। গিয়ে দেখল সেই কলার মাঞ্জাস আবার ফিরে এসেছে এবং মাঞ্জাসে ধনা পণ্ডিত মৃত ও একই রকম অবস্থায় শুয়ে আছে একভাবে। সত্যিই চমকপ্রদ ব্যাপাব। এই তিনদিনে ধনা পণ্ডিতের চেহারার এতটুকু বিকৃতি ঘটেনি।

ধনার বউ তো ধনাকে দেখে আবার আছাড়-কাছাড় করে কান্নাকাটি শুরু করল।

ধনার বউ বলল, "ও নিশ্চয়ই মরেনি। সাপের বিষে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তোমরা ভাল রোজা বদ্যি ডাকো। ঘরে নিয়ে চলো কর্তাকে।"

কিন্তু ঘরে নিয়ে চলো বললেই তো নিয়ে যাওয়া যায় না। গ্রামে ঘরে শুভ অশুভর বিচার একটা আছে।

অবশেষে অনেক ভাবনাচিন্তার পর সকলে ঠিক করল, গ্রামের বাইরে শ্মশানের ধারে একটা চালাঘর আছে। সেই চালাঘরে ধনাকে নিয়ে গিয়ে রাখা হবে এবং সকলে মিলে পালা করে দিবারাত্র জেগে পাহারা দেবে ধনাকে। এবং সেই ফাঁকে ভিন গাঁ থেকে কিছু রোজা বদ্যি নিয়ে এসেও দেখাবে। এই যুক্তি করে সবাই মিলে ধরাধরি করে ধনাকে শ্মশানের চালাঘরে নিয়ে এসে বাখল।

ধনার বউ বলল, "কর্তাকে অমন করে বেঁধে রাখবার দরকার নেই। বাঁধনটা খুলে দাও।"

তাই করা হল।

ধনার বউ বলল, "একটু গরম দুধ খাইয়ে দিলে হত না?"

এ ব্যাপারে অবশ্য আপত্তি করল অনেকেই। বলল, "মরা মানুষকে আবার কে কবে দুধ খাওয়ায়? আর দুধ খাইয়ে লাভই বা কী? মৃতের মুখে ঢাললেও সে দুধ তার পেটে যাবে কেন?"

ধনার বউ বলল, "তবু দেখিই না! যদি ভেতরে প্রাণ থাকে? যদি খায়!"

এইসব করতে করতেই সন্ধে গড়িয়ে গেল। একটা চিমনি লণ্ঠন জ্বেলে গ্রামের জনাচারেক যুবক সেই রাত্রিটা ধনাকে পাহারা দিয়ে জেগে থাকতে রাজি হল।

পাশের গ্রাম থেকে বড় একজন সাপের রোজাও এল। এসে বলল, "না বাপু, এ মরেই গেছে। একে বাঁচানো আমার কর্ম নয়। যাও, আবার একে ভাসিয়ে দিয়ে এসো।"

এর পর একজন কবিরাজ এলেন। বললেন, "নাঃ। তিনদিন আগেই মরেছে মানুষটা। কিন্তু কেন যে পচন ধরেনি তা তো ভেবে পাচ্ছি না।"

যাই হোক, সন্ধের পর ধনার বউ একবাটি গরম দুধ নিয়ে এল। সঙ্গে নিয়ে এল ছোট মেয়ের দুধ খাওয়াবার ঝিনুকটা। এ ছাড়া খাওয়াবেই বা কী করে? ধনা তো চুমুক দিয়ে খেতে পারবে না। ধনার বউ তবু জেদ করেই ঝিনুকভর্তি দুধ নিয়ে ধনার মুখে গুঁজে দিল।

আশ্চর্য ব্যাপার! যেন কোনও এক জাদুমন্ত্রবলে সেই দুধ শুষে নিতে লাগল ধনা। সে দুধ শেষ হতেই আবার দুধ এল। ফের এল। খবর রটে গেল গ্রামময়। তখন মানুষের পুকুর ভরা মাছ ছিল। মরাই ভরা ধান ছিল। গোয়াল ভরা গোরু ছিল। কাজেই দুধের অভাব ছিল না। প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই দু-এক ঘটি করে দুধ আসতে লাগল ধনার জন্য। গ্রামের লোকেরাও ঘরের কাজ ফেলে রেখে সবাই এসে সেই রাতদুপুরে জড়ো হল শ্মশানে ধনার দুধ খাওয়া দেখতে। সর্বসাকুল্যে হিসেব কষে দেখা গেল প্রায় সের তিরিশ দুধ খাওয়ানো হয়েছে ধনাকে। অথচ পেটে হাত দিয়ে দেখা গেল যেমনকার পেট তেমনই পড়ে আছে।

এ একটা রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকে একবাক্যে বলল, নিশ্চয়ই কোনও দানোতে ভর করেছে ধনাকে। অতএব আর নয়! এবার ওকে চিতার আগুনে পুড়িয়ে দাও।

এই কথা শুনেই ধনার বউ তো কেঁদে ককিয়ে উঠল। সকলের পা জড়িয়ে ধরে বলল, "না গো না। আমার কর্তা ঠিক বেঁচে উঠবে। ওর কিছু হয়নি। দোহাই তোমাদের, ওকে বেঁচে ওঠবার একটু সময় দাও। তা ছাড়া ও তো কারও ক্ষতি করেনি। না হয় ওর দুধ খাওয়ার পরিমাণটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। হাজার হলেও তিনদিনের খিদে।"

গ্রামের লোক সকলে না হলেও অনেকেই বলল, "তা অবশ্য ঠিক। আর গ্রামের ভেতরেও যখন নেই তখন দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কী হয়।"

এই বলে সবাই ফিরে এল।

রইল শুধু চারজন।

রাত্রি তখন কত তা কে জানে?

বর্ষাকাল। আকাশ এক সময় মেঘে ঢেকে গেল এবং শুরু হল প্রবল বর্ষণ। সেইসঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাসে সবকিছু যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ঘরের ভেতরে যে চিমনি লণ্ঠনটা ছিল সেটাও একসময় নিভে গেল ধুপ করে।

ওদিকে গ্রামের ভেতর থেকে তখন প্রচণ্ড এক কোলাহল ভেসে আসতে লাগল। সেই কোলাহলের শব্দ শুনে এরা চারজনেই তখন পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কী হল কে জানে? যা বর্ষার দাপট! বান এল? না ঝড়ে কারও চালা উড়িয়ে নিয়ে গেল? কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলেই বা এত হট্টগোলের কী আছে? আর বানই যদি আসবে তা হলে তো বানের জল এতক্ষণে এখানেও গড়িয়ে আসত।

একজন বলল, "মনে হচ্ছে গ্রামে কোনও বিপদ ঘটেছে।"

আর একজন বলল, "ডাকাত ফাকাত পড়েনি তো?"

"না। না। এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগে ডাকাতি? তা ছাড়া আমাদের এই গ্রাম হচ্ছে গরিব দুঃখীর গ্রাম। এ গ্রামে ডাকাত পড়তে যাবে কেন?"

"তা হলে কী করা যায়?"

"কিছু তো ভেবে পাচ্ছি না রে ভাই। এ যা দুর্যোগ, এই দুর্যোগে কেউ যে একজন গিয়ে একটু খোঁজখবর নিয়ে আসব তাও তো সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে এইরকম অবস্থায় পাহারাদারি ফেলে রেখে যাওয়াটাও ঠিক নয়।"

এরা যখন এইসব আলোচনা করছে ওদিকের কোলাহল তখন আরও তীব্র রূপ ধারণ করেছে।

অবশেষে ঠিক হল ওদের ভেতর থেকে দু'জন বসে এখানে পাহারা দেবে এবং দু'জনে গিয়ে খবর নিয়ে আসবে ব্যাপারটা কী এবং কীসের এত গোলমাল।

এমন সময় হঠাৎ সশব্দে একটা বাজ পড়ে বিদ্যুৎ চমকাল। আর বিদ্যুৎ চমকাতেই সেই আলোয় যে দৃশ্য ওরা দেখতে পেল তাতে চারজনেই লাফিয়ে উঠল একসঙ্গে। দেখল শূন্য মাঞ্জাসটাই শুধু পড়ে আছে সেখানে কিন্তু মৃতদেহের অস্তিত্বও নেই।

যেই না দেখা অমনই তো বাবা রে মা রে করে দৌড় দিল সব একসঙ্গে। কিন্তু এই জলে ঝড়ে কি কাদার রাস্তায় ছোটা যায়? তবুও প্রাণপণে ছুটল সব গ্রামের দিকে।

তখন শেষ রাত।

গ্রামসুদ্ধু লোক তখন লাঠি সড়কি কাস্তে কুড়ুল নিয়ে ছুটোছুটি করছে চারদিকে। কী ব্যাপার? মাঝরাত্তিরে হঠাৎ নাকি ধনা পণ্ডিত এসে লাথি মেরে ঘরের দরজা ভেঙে ওর বউয়ের কাছ থেকে ছোট মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে চলে গেছে।

সেইজন্যই এত ছোটাছুটি ও খোঁজ খোঁজ রব। কিন্তু সারা গ্রাম তোলপাড় করেও কোথাও মেয়েটির বা ধনা পণ্ডিতের কোনও হদিসই পাওয়া গেল না।

এরা চারজনও তখন ধনা পণ্ডিতের অন্তর্ধান রহস্যটা বলল সকলকে।

শুনে সবাই খুব বকাবকি করল ওদের। বলল, "কোথায় ছিলে তোমরা, ঘুমোচ্ছিলে নাকি? চোখের সামনে থেকে মৃতদেহটা উঠে এল আর তোমরা কেউ দেখতে পেলে না? যদি তোমাদেরকেই মেরে ফেলত? আমরা তো ভেবেছিলাম তোমাদের চারজনকে শেষ করেই ও এখানে এসেছে। তাই শ্মশানের দিকে তোমাদের খোঁজ নিতেও কেউ যাইনি।"

এইভাবেই ভোর হল। এবং দুর্যোগও একটু কমল। সকলে তখন অনেক খোঁজাখুঁজির পর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে শ্মশানের সেই চালাঘরের দিকেই চলল। গত রাত্রের ব্যাপারে সকলেই খুব আতঙ্কিত। কেননা ধনা পণ্ডিতকে কোনওরকমে খুঁজে বের করতে না পারলে সমূহ বিপদ।

তাই সবাই চালাঘরের কাছে এসেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। দেখল চালাঘরের ভেতর কলার মাঞ্জাসে কর্দমাক্ত ধনা পণ্ডিত আগের মতোই শুয়ে আছে। আগের মতোই সে মৃত। তবে তার সারা দেহে চাপ চাপ রক্তের দাগ। গালের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। উঃ, কী বীভৎস সেই দৃশ্য! ও রক্ত যে কার, তা বুঝতে পারল সকলেই। কিন্তু আর তো কোনও উপায় নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। তবুও ধনাকে যে পাওয়া গেছে এই রক্ষে! গ্রামবাসীরা আর একটুও দেরি না করে ধনা পণ্ডিতের দেহটা চিতার আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে ফেলল।

পৈশাচিক

আজকাল ভূতের গল্প কেউ লেখেন না। তার কারণ এই বিজ্ঞানের যুগে ভূতে বিশ্বাস করেন না কেউ। যদিও বা কেউ লেখেন তো গল্পের শেষে এমন করে দেন যে আসলে ভূত বলে যেন কিছুই নেই, মানুষ মনের ভ্রমে অথবা উলটোপালটা কিছু দেখে অযথা ভয় পেয়ে ভূতের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেয়।

আমার এ গল্পটি কিন্তু সেরকম নয়। কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক ঘটনাটি ঘটেছিল। আমার মায়ের যিনি বড়মামা তিনি সেকালের একজন নামকরা ডাক্তার ছিলেন। গল্পটা তাঁর মুখেই শুনেছিলাম। তিনি এখন বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর বলে যাওয়া গল্পটি আজও বেঁচে আছে আমার কাছে। তিনি গল্পটি যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেভাবেই বলছি তোমাদের:

আমি তখন শিবানীপুরে থাকি। ডাক্তারি পাশ করে কলকাতায় না গিয়ে গ্রামের মানুষের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করেছি। ভগবানের কৃপায় আমার হাতযশও খুব হয়েছিল তখন। আর বন গাঁয়ে শিয়াল রাজার মতো ওই অঞ্চলে ডাক্তার বলতে তো আমিই ছিলাম।

তখনকার গ্রামও ছিল গ্রামের মতো গ্রাম।

একেবারে অজ গাঁ যাকে বলে ঠিক তাই। গ্রাম তখন এমনই ছিল যে, এখনকার গ্রামের ছেলেরাও তখনকার সেই গ্রামকে কল্পনা করতে পারবে না।

যাই হোক. সেই সময় আমার গ্রামের প্রায় পনেরো মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে কল এল আমার। কলেরার কেস। না যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। তাই যা যা সঙ্গে নেওয়ার নিয়ে, আমার একটা ঘোড়া ছিল সেই ঘোড়ায় চেপে রোগী দেখতে চললাম।

সন্ধের মুখে বেরিয়েছি। তাই যেতে-যেতেই রাত হয়ে গেল। কাজেই রোগী দেখার পর ওই গ্রামেই সে রাত্রে রয়ে গেলাম। রোগীর বাড়ির লোকেরা দুধ মুড়ি মণ্ডা ও মর্তমান কলা যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়াল। পেটভরে তৃপ্তি করে খেয়েদেয়ে শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। গাঢ় গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে গেলাম আমি।

রাত তখন কত তা জানি না।

হঠাৎ একটা ডুকরে ওঠা কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তারপরই শুনতে পেলাম একটা অস্পষ্ট কোলাহল। বুকটা ধড়াস করে উঠল। রোগী কি মরে গেল নাকি? কিন্তু যা ওষুধ দিয়েছি তাতে মরবার তো কথা নয়! বিশেষ করে রোগীর শারীরিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল।

কান্না শুনে তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি একটা অল্পবয়সী বউ উঠোনে শুয়ে আছাড় কাছাড় করে কাঁদছে। আর চেঁচাচ্ছে, "ওগো আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল গো! আমার বাপুনকে খেয়ে ফেললে। আমি কোনওরকমে আমার খোকাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। তোমরা বলে দাও

আমি এখন কী করব গো!"

বউটির কান্না দেখে বা তার কথা শুনে ভাবলাম হয়তো গো-বাঘ বা অন্য কিছুতে তার বাপুনকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আশেপাশের লোকেদের মুখে যা শুনলাম তাতে তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। এও আবার হয় নাকি?

বউটির স্বামী কলকাতায় কাজ করে। প্রতি শনিবার সে বাড়ি আসে। রবিবার বাড়িতে থেকে সোমবার ভোরে সে চলে যায়। আজ শনিবার। লোকটি যথানিয়মেই রাত্রিবেলা এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা তার। চোখ দুটো লাল। মাথার চুল উসকোখুসকো।

বউটি স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, "কী ব্যাপার! তোমার শরীর খারাপ নাকি?"

লোকটি কোনওরকমে শুধু হুঁ বলে। আর কিছু না। রাতের খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত করে না। বিছানা করে দিলে গুম হয়ে শুয়ে থাকে চুপচাপ।

বউটি আর কী করে! মনমরা হয়ে কিছুই বুঝতে না পেরে সামান্য দুটি মুড়ি চিবিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে শুয়ে পড়ে ছেলে দুটিকে নিয়ে। একটি ছেলে তিন বছরের। অপরটি ছ'মাসের।

বউটি শুয়ে থাকে। কিন্তু নানান চিন্তায় তার ঘুম আর আসে না। হঠাৎ একসময় চপাং চপাং শব্দে চমকে উঠে আড়চোখে তাকিয়েই শিউরে ওঠে সে। দেখে তার স্বামী মশারির বাইরে বসে কী যেন খাচ্ছে! দেখেই তো বুক শুকিয়ে গেল বউটির। পাশে হাত বাড়িয়ে দেখল কোলের ছেলেটি নেই। কচি ছেলে রাতবিরেতে কান্নাকাটি করলে দুধ খাওয়াবার জন্য কাঁথা পালটাবার জন্য ছোট্ট চিমনি লণ্ঠনটা অল্প করে জ্বেলে রেখেই শুত সে। তাতেই দেখল ওর স্বামী মশারির বাইরে বসে সেই শিশুটিকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

বউটির মনে হল সে একবার চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। কিন্তু তা সে করল না। আবার অন্য ছেলেটিকে নিয়ে চুপিচুপি পালাবার মতো সাহসও হল না তার। কেননা পালাতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। তাই করল কি, ইচ্ছে করেই ঘুমন্ত ছেলেটার গায়ে জোরে একটা চিমটি কেটে দিল।

যেই না দেওয়া, অমনই শুরু হয়ে গেল ম্যাজিক।

ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আর ওর স্বামী তাড়াতাড়ি মশারির ভেতরে ঢুকে আধ খাওয়া শিশুটিকে যথাস্থানে শুইয়ে দিয়ে যেন কিছুই জানে না এমনভাবে শুয়ে পড়ল।

বউটি দেখেও দেখল না। যেন ছেলের কান্নায় এইমাত্র ঘুম ভেঙে গেল এমন ভান করে ঢিপ ঢিপ করে ঘা কতক বসিয়ে দিল ছেলেটির পিঠে।

স্বামী বলল, "কী হল? রাতদুপুরে শুধু শুধু মারছ কেন ওকে?"

বউটি যেন খুবই বিরক্ত হয়েছে এমনভাবে বলল, "না। মারব না। পাপ কোথাকার! প্রত্যেকদিন রাত্রি হলেই ওনাকে মাঠে বসাতে নিয়ে যেতে হবে। ভাল লাগে?"

"তা নিয়ে যাও। নাহলে ছেলেমানুষ বিছানা নষ্ট করে ফেলবে তো।"

বউটি এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল।

ছেলের নড়া ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে তুলে ঘরের বাইরে এসেই শিকল তুলে দিল দরজায়। দিয়ে এখানে এসে আছাড়-কাছাড় করতে লাগল।

সব শুনে তো আমার মাথাটাই খারাপ হওয়ার জোগাড়। আমি বেশ বুঝতে পারলাম বউটির স্বামী হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গিয়ে এই কীর্তি করে ফেলেছে। তাই গ্রামের অন্যান্য

লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম গোটা বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে গ্রামের লোকেরা এবং অগ্নিসংযোগও করেছে। খড়ের চালায় একবার আগুন লাগলে সে আগুন থামায় কে? ঘরের ভেতরে বউটির উন্মত্ত স্বামী তখন লাথির পর লাথি মেরে চলেছে আর দরজা খুলে দেওয়ার জন্য চিৎকার করছে।

আমি যেতে যেতেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আমি প্রত্যেককে ভর্ৎসনা করলাম এই অগ্নিসংযোগের ব্যাপারে। সবাইকেই বললাম, "একটা পাগলকে তোমরা এইভাবে পুড়িয়ে মারলে কেন? লোকটাকে বাইরে বের করে বেঁধে রাখতে পারতে।"

কিন্তু কাকে কী বোঝাব! গ্রামসুদ্ধু লোকের প্রত্যেকেরই ধারণা লোকটা মোটেই উন্মাদ নয়। এমনকী আসল লোকই নয়। এটা একটা পৈশাচিক ব্যাপার। পিশাচরা নাকি মাঝে মধ্যে এইরকম নকল মানুষের রূপ ধরে আসে।

যাই হোক, রাত্রি প্রভাত হলে আমি কয়েকজন লোককে পাঠালাম কলকাতায়। তাদের ভুল ভাঙাবার জন্য। কিন্তু তারা সন্ধের পর কলকাতা থেকে ফিরে এসে যা বলল তা শুনে আমার গায়ের লোমসুদ্ধু খাড়া হয়ে উঠল। তারা বলল, লোকটি দিন দুই আগে কলকাতাতেই গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে। মৃতদেহ মর্গে আছে। এখন ওর বউ ছেলেকে নিয়ে গেলেই লাশ ফেরত দেবে ওরা। দেহটা কলকাতাতেই দাহ করা হবে।



পুরনো বাড়ি

এও কিন্তু সত্যি ঘটনা। আমার জ্যাঠামণির মুখ থেকে শুনেছিলাম। তিনি ঠিক যেভাবে গল্পটা আমাকে বলেছিলেন, আমিও সেইভাবেই তোমাদের বলছি:

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

আমার বয়স তখন কুড়ি-বাইশ। সবে একটা ভারী অসুখ থেকে উঠেছি। ডাক্তার বললেন চেঞ্জে যেতে। একে অসুখে ভুগে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে, তার ওপর শরীর সারানোর জন্য বাইরেও যেতে হবে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে কাছেপিঠে দেওঘরেই যাওয়া ঠিক করলাম।

ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমে এক চায়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে বিলাসী টাউনে একটা বাড়ির সন্ধান পেলাম। বাঙালির বাড়ি। পাওয়ামাত্রই টাঙ্গা ভাড়া করে এসে হাজির হলাম সেই বাড়িতে। বাড়িটা পুরনো। তা হোক। চারদিক বেশ ফাঁকা।

টাঙ্গাওলা বাড়ির কাছে টাঙ্গা থামিয়ে বলল, "আপনি এখানে প্রথম আসছেন নাকি বাবু?"

"হ্যাঁ।"

"এরকম জায়গায় আপনি থাকতে পারবেন? এ খুব খারাপ জায়গা কিন্তু।"

বিলাসী টাউন নামে টাউন হলেও তখন একেবারে ফাঁকা ও বুনো জায়গা ছিল। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করত। বললাম, "খুব পারব। তা ছাড়া বাইরে বেরোলে অত ভয় করলে চলে?"

টাঙ্গাওলা বলল, "আমার সন্ধানে একটা ভাল ঘর ছিল। একেবারে মন্দিরের পাশে। যাবেন বাবু সেখানে?"

আমি মালপত্তর নামাতে নামাতে বললাম, "না, থাক। এখানটা বেশ নির্জন। আমার পক্ষে এই জায়গাই ভাল।" এই বলে টাঙ্গাওলাকে বিদায় দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, কী জানি, টাঙ্গাওলার কথা শুনে আর কোথাও গিয়ে যদি কোনও পাণ্ডা গুণ্ডার হাতে পড়ি?

মালপত্তর বাড়ির রোয়াকে রেখে দরজায় কড়া নাড়তেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, "কাকে চাই?"

"আপনার এখানে কোনও ঘর খালি আছে? এক মাস থাকব।"

ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, "পুরো বাড়িটাই খালি আছে। আমি ওপরে থাকি, আপনি নীচে থাকবেন। এক মাসের জন্য কিন্তু দশ টাকা ভাড়া দিতে হবে। পারবেন তো?"

আমি কোনও কথা না বলে দশটা টাকাই বের করে দিলাম।

বাড়িটা ছোট। নীচে দুটি ঘর। রান্নাঘর। ওপরে একটি ঘর। ছাদ ও বারান্দা। বাড়ির

বাইরে পাতকো, পায়খানা। চারদিকে গাছপালা, বন। মাঝেমধ্যে দু-একটা ঘরবাড়ি। দূরে পাহাড়ের রেখা।

যাই হোক, ভদ্রলোক টাকা দশটি অগ্রিম নিয়ে ঘর পরিষ্কার করে একটি ক্যাম্পখাট পেতে দিয়ে গেলেন। আমি তাইতেই বিছানা পেতে ফেললাম। তারপর ঘরে তালা দিয়ে দোকান-বাজার করে আনলাম। সঙ্গে স্টোভ ছিল। রান্না করে খেয়েদেয়ে দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটালাম। বিকেলে মন্দির ঘুরে কিছুটা ভাল ঘি, প্যাঁড়া ও চমচম কিনে ঘরে ফিরে এলাম। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। কার্তিকের শেষ, অল্প অল্প শীতও পড়েছে তখন। ঘরে এসে তালা খুলেই অবাক! দেখলাম ঘরের ভেতর হারিকেনটা কে যেন জ্বেলে রেখে গেছে। পেরেকে দড়ি বেঁধে তাইতে আমার জামাকাপড় সব সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে। আমি তো ভেবেই পেলাম না এরকমটা কী করে হল? কেননা, চাবি রইল আমার কাছে অথচ ঘরের কাজ করল কে? বাড়ির মালিকের নাম গজেনবাবু। আমি তাঁকে ডাকলাম। দু-তিনবার ডেকেও যখন কোনও সাড়া পেলাম না, তখন টর্চ জ্বেলে ওপরে উঠেই দেখি, ঘরে তালা দিয়ে একজন মধ্যবয়সী মহিলা নেমে আসছেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "গজেনবাবু আছেন?"

মহিলা আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে কিছু না বলেই নেমে গেলেন।

মনে মনে খুব রাগ হল আমার। আচ্ছা অভদ্র তো! মেজাজটাও খিঁচড়ে গেল। কেননা, এ ঘরে যখন আর কোনও দরজা নেই, তখন নিশ্চয়ই ডুপ্লিকেট চাবি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে অবশ্য আমার উপকারই হয়েছে। তবুও এ জিনিস কখনওই বরদাস্ত করা যায় না।

আমি সে-রাতে দু-চারটে পরোটা তৈরি করে প্যাঁড়া, চমচম খেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ে ঘুমোতে গেলাম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে।

ঘুম থেকে উঠেই গজেনবাবুকে বাইরে কুয়োতলায় দাঁতন করতে দেখলাম। আমিও তাড়াতাড়ি দাঁত মাজার সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

গজেনবাবু একগাল হেসে বললেন, "কী ভায়া, রাতে ঘুম হয়েছিল তো?"

আমি হেসে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" তারপর গতকালের কথাটা বললাম।

শুনে গজেনবাবু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "টাকাকড়ি সবসময় নিজের কাছে রাখবেন। সন্ধের পর জানলা দরজা বন্ধ করে দেবেন। কেউ কড়া নাড়লে দরজা খুলবেন না। এসব জায়গা ভাল জায়গা নয়। তা ছাড়া রাত্রে আমি এখানে থাকি না। ওধারে আমার আর একটা বাড়ি আছে, সেইখানে থাকি।"

"তা না হয় হল, কিন্তু আমার ঘরে আলোটা জ্বালল কে? আপনার স্ত্রী?"

"আমার স্ত্রী? তিনি তো অনেকদিন গত হয়েছেন।"

"তা হলে ওই মহিলা কে?"

গজেনবাবু হেসে বললেন, "আপনি ভুল দেখেছেন। এখানে কোনও মহিলা থাকেন না।"

এমন সময় হঠাৎ একটা ছাগলকে হ্যাট হ্যাট করে তাড়া দিতে দিতে আমার প্রশ্নটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে কেটে পড়লেন গজেনবাবু।

এর পর সারাদিনে যতবারই গজেনবাবুর সঙ্গে দেখা হল, ততবারই তিনি আমাকে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। আজ তাই ঠিক করলাম, বেলাবেলি, মানে সন্ধের আগেই এখানে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে দেখব কে কীভাবে ঘরে ঢোকে?

তাই করলাম। সন্ধের আগেই ফিরে এসে দূরে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সন্ধেটি যেই উত্তীর্ণ হল, অমনই দেখলাম আলো জ্বলে উঠল ঘরের ভেতর। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। কেউ কোথাও নেই। আমি টর্চের আলোয় পথ দেখে ঘরে যেতে গিয়ে তালা খুলেই যা দেখলাম, তাইতে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। দেখলাম আমার এঁটো বাসনপত্তর কে যেন মেজে ঝকঝকে করে রেখেছে। এলোমেলো বিছানা পরিপাটি করে, মায় আমার রাতের খাবারটি পর্যন্ত তৈরি করে রেখেছে।

বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। এ কোথায় এসে উঠেছি আমি? কাউকে যে ডাকব, ভয়ে গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। গজেনবাবুও সন্ধের পর থাকেন না এখানে। কেন যে থাকেন না, তা এবার বুঝতে পারলাম। শুধু বুঝতে পারলাম না ওই মহিলাটি কে? তবে কি—

হতাশভাবে ধপ করে বসে পড়লাম বিছানায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সবে সাড়ে ছ'টা। চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। এ রাতে কোথায় বা যাব? বসে বসেই মনস্থির করে ফেললাম। আজকের রাত্রিটা যেমন করেই হোক এখানে কাটিয়ে কাল সকাল হলেই পালাব এখান থেকে। কিন্তু সারাটা রাত এখানে যে কী করে কাটাব তা ভেবে পেলাম না।

অনেকক্ষণ বসে থেকে কোনওরকমে রাত ন'টা করলাম। তারপর সঙ্গে আনা প্যাঁড়া চমচমগুলো খেয়ে নিলাম। যে রান্না তৈরি করা ছিল তাতে হাতই দিলাম না। এবার জল খেতে হবে। কিন্তু কলসি গড়াতে গিয়েই অবাক! এ কী! জল কই? বাইরে যাওয়ার আগে জলপূর্ণ কলসি যে আমি নিজে হাতে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। আমার সর্বাঙ্গ তখন নীল হয়ে উঠেছে। তার ওপর ভয়ে এবং প্যাঁড়া চমচম খাওয়ার ফলে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কী আর করি, বাইরে কুয়োতলায় গিয়ে জল আনতে ভয় করছিল যদিও, তবুও যেতেই হবে। যেতে গিয়েই বাধা পেলাম। দরজা খুলতে গিয়ে দেখি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। অনেক টানাটানি করেও সেই বন্ধ দরজা কিছুতেই খুলতে পারলাম না। এমন সময় হঠাৎ দপদপিয়ে হারিকেনটাও নিভে গেল। আমার গা দিয়ে কলকল করে ঘাম বেরোচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আমি জোরেই কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, "কে তুমি? কে আমাকে এইভাবে ভয় দেখাচ্ছ? আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। তা ছাড়া তুমি আমার অনেক কাজ এমনিই তো করে দিচ্ছ। তবে কেন এমন করছ আমার সঙ্গে? আমায় তুমি রক্ষা করো।"

হঠাৎ বাইরে কুয়োতলায় টিপ করে একটা শব্দ হল। নিশ্চয়ই কেউ জল তুলতে এসেছে। অনেকে এই কুয়ো থেকে দিনের বেলায় জল নিতে আসে দেখেছি। কিন্তু রাতে কেউ আসে কিনা জানি না। কী করেই বা জানব? সবে তো একটা দিন এসেছি। তাড়াতাড়ি জানলা খুলে কুয়োতলায় তাকাতেই দেখলাম, কুয়োর পাড়ে একটা হারিকেন জ্বলছে। আর তারপরেই যা দেখলাম সে এক বীভৎস ব্যাপার। কুয়োতলায় ভাঙা পায়খানার ধারে বড় একটা গাছের ডালে সেই মহিলা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। কী ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য! জিভটা এক হাত বেরিয়ে এসেছে। মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে। আর ঠেলে বেরিয়ে আসা বড় বড় চোখ দুটো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

পরদিন সকালে যখন চোখ মেললাম তখন দেখলাম ঘর ভরতি লোক। গজেনবাবু আমার মাথার কাছে বসে হাওয়া করছেন। আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। তারপর সব কিছু খুলে বললাম সকলকে।

আমার বৃত্তান্ত শুনে প্রত্যেকেই বকাবকি করলেন গজেনবাবুকে।

আমি তখনই মালপত্তর গুছিয়ে নিয়ে স্টেশনে চলে এলাম। আবার থাকে এখানে? লোকমুখে শুনলাম, যে মহিলাকে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেছি, উনিই গজেনবাবুর স্ত্রী। তাঁর বর্তমানে গজেনবাবু দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় ভদ্রমহিলা ওই গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।



প্রেতাত্মার ডাক

সেবার কলেরার মড়কে বাতাসপুর গ্রামটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো হয়েছিল। সেকালে গ্রামে ঘরে এই রোগ একবার ঢুকলে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। বাতাসপুরের পাশের গ্রামে আমার এক মেসোমশাই থাকতেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার। তাঁর মুখে গল্পটা যেমন শুনেছিলাম ঠিক তেমনি ভাবেই বলছি:

তখন শ্রাবণ মাস। সকাল থেকেই সেদিন প্রচণ্ড দুর্যোগ চলেছে। সেই দুর্যোগে সারাদিন রোগী দেখে রাত্রিবেলা ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। ঘুম ভেঙে উঠে বসে কেরোসিনের কুপিটা জ্বেলে সাড়া দিলাম, "কে?"

বাইরে থেকে কোনও প্রত্যুত্তর এল না। তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কে ডাকে?"

এবার উত্তর এল, "আমি সনাতন। একবার দরজাটা খুলুন না ডাক্তারবাবু?"

সনাতন বাতাসপুরে থাকে। কাল ওর স্ত্রী কলেরায় মারা গেছে। কিন্তু এত রাতে সনাতন আবার এসেছে কেন? তবে কি আবার নতুন করে কারও অসুখ করল? এ অঞ্চলে ডাক্তার বলতে একা আমিই। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এই মহামারীতে একটি রোগীরও প্রাণ আমি রক্ষা করতে পারিনি। সেজন্য কারও বাড়ি যেতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। অথচ ডাক্তার হিসেবে রোগীর বাড়ি থেকে কল পেয়ে না গিয়েও থাকতে পারছি না। তাই ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় আমি চিকিৎসা চালাচ্ছি। আমি বিছানা থেকে উঠে এসে সনাতনকে দরজা খুলে দিতেই সনাতন অন্ধকারে বাইরে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, "ডাক্তারবাবু গো, বাঁচান।"

"কী হল সনাতন! কার কী হল আবার?"

"আমাব এই একটিমাত্র ছেলে ডাক্তারবাবু। তারও হয়েছে। যেমন করেই হোক, ওকে আপনি বাঁচান। বউটা গেছে, ছেলেটার মুখ চেয়ে বুক ধরে বেঁচে আছি। ও চলে গেলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে ডাক্তারবাবু। না হলে আমি পাগল হয়ে যাব।"

আমি সনাতনকে আশ্বাস দিয়ে আমার ডাক্তারির ব্যাগটা ওর হাতে দিলাম।

ব্যাগ নিয়ে সনাতন বলল, "আমি তা হলে এগোচ্ছি ডাক্তারবাবু। আপনি আসুন। ছেলেটা ঘরে একলা আছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

সনাতন এগোল।

আমি চালাঘর থেকে আমার শীর্ণকায় ঘোড়াটাকে বের করে আনলাম। তারপর ছাতা মাথায় দিয়ে তার পিঠে চেপে টর্চের আলোয় পথ দেখে বাতাসপুরে চললাম। রাত তখন দেড়টা। দুর্যোগ খুব বেশি না হলেও ঝিমঝিম অনবরতই চলছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুড়গুড় করে মেঘও ডাকছে মাঝে মাঝে। আশশ্যাওড়া, বাবলা ও খেজুরগাছের

গা ঘেঁষে আমি মেঠোপথে ঘোড়ায় চেপে চলেছি। কিছুটা পথ আসার পর হঠাৎ মনে হল, তাই তো, সনাতন গেল কোথায়? ও আমার আগে গেলেও পায়ে হেঁটে গেছে। কিন্তু আমি চলেছি ঘোড়ায় চেপে। এতক্ষণে তো ওকে ধরে ফেলবার কথা। যাই হোক, বাতাসপুরে ঢোকার মুখে একটা খাল আছে। সেই খালের ধারে এসে থামলাম আমি। এইখানে একটা পিটুলি গাছের গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে একটা অপলকা সাঁকো পার হয়ে ওপারে গেলাম। খালের দু'পাশে কালকাসুন্দে ও বেড়াকলমির ঝোপ। সাঁকো পেরোতেই শুনতে পেলাম অন্ধকারে ঝোপের ভেতর থেকে কে যেন ডুকরে কেঁদে উঠল, "ডাক্তারবাবু, ছেলেটা বাঁচবে তো?"

গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল আমার। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। এ যে সনাতনের বউ সৌদামিনীর গলা। যে সৌদামিনীকে আমি আমার ডাক্তারি বিদ্যা প্রয়োগ করেও বাঁচাতে পারিনি। কাল দুপুরে আমার চোখের সামনে সে মারা গেছে। গাঁয়ের লোকেরা মুখাগ্নি করে কাল যাকে খালের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। সেই সৌদামিনী ছেলের অসুখের জন্য হাহাকার করে উঠল কী করে?

এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সনাতনের দেখা না পেলে হার্টফেলই করে ফেলতাম। সনাতন একটা হারিকেন নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, "তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসুন ডাক্তারবাবু। ছেলেটা কেমন করছে।"

আমি ভীত হয়ে বললাম, "কিন্তু সনাতন, একটু আগে তোমার বউয়ের গলায় কে যেন—।"

"ওসবে কান দেবেন না ডাক্তারবাবু। ওরকম অনেক কান্নাই শুনতে পাবেন এবার থেকে। সারা গাঁ উজাড় হয়ে গেল। মানুষের আত্মাগুলো সব যাবে কোথায়? তাড়াতাড়ি আসুন।"

আমি মনে সাহস সঞ্চয় করে সনাতনের পিছু পিছু চললাম। কী জোরে জোরে হাঁটছে সনাতন। তারপর এক সময় সনাতনকেও দেখতে পেলাম না। দেখলাম, শুধু হারিকেনটাই মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলেছে। আমার তখনকার অবস্থার কথা বলে বোঝাবার নয়! আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই আলোকের অনুসরণ করলাম। এক সময় আলোটাও মিলিয়ে গেল। আমি তখন সনাতনের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ঘরটা অন্ধকার। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে কাঁপা গলায় ডাকলাম, "সনাতন! সনাতন!"

কোনও সাড়া নেই।

আবার ডাকলাম।

আমার ডাক শুনতে পেয়ে আশপাশের বাড়ি থেকে দু-একজন আলো নিয়ে এগিয়ে এল, "কে, ডাক্তারবাবু নাকি?"

"হ্যাঁ। সনাতন কোথায়? ওর ছেলের অসুখের খবর দিয়ে ডেকে আনল আমাকে, অথচ ওকেই দেখতে পাচ্ছি না।" পথের ঘটনার কথা অবশ্য বললাম না কাউকে।

আমার কথা শুনে সকলে অবাক হয়ে গেল। সকলেই বিস্মিত হয়ে বলল, "সনাতন আপনাকে ডেকে নিয়ে এল?"

"হ্যাঁ। আমার ব্যাগটাও যে বয়ে আনল সে।"

"সে কী! এই তো সন্ধের সময় খালের ধারে রেখে এলাম তাকে। এই প্রচণ্ড দুর্যোগে সন্ধেবেলাই অসুখে পড়ে শেষ হয়ে গেল বেচারা! আপনাকে একবার খবর দেওয়ারও সময় পেলাম না। তবে ওর ছেলের অসুখের কথা জানি না। চলুন তো দেখি?"

আমরা সকলে আলো নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখলাম, সনাতনের ছেলেটা বিছানাপত্তর নোংরা করে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। আমার ব্যাগটা সযত্নে বসানো আছে ওর মাথার কাছে। আমি যতটা সম্ভব ওকে পরিষ্কার করে স্যালাইন দিলাম। কিন্তু না। আমার এ চেষ্টাও ব্যর্থ হল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মারা গেল ছেলেটা।

সে রাত্রিটা ওই গ্রামেই একজনদের বাড়ি কাটালাম আমি। পরদিন ভোরে সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথাটা স্মরণ করে স্বগ্রামে ফিরে এসে চলে এলাম কলকাতায়। সেই থেকে আমি এখানেই প্র্যাকটিস করছি। বাতাসপুরের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্কই নেই।



প্রেতিনী

সেবার ভোটের সময় বরদাবার প্রাইমারি স্কুলে ইলেকশন ডিউটি পড়েছিল আমার। উলুবেড়িয়া থেকে ভোটের সরঞ্জামাদি বুঝে নিয়ে লরি চেপে চললাম বরদাবার। তখন গ্রীষ্মকাল। বেশ আনন্দে কয়েকটি বুথের লোকজনসহ হইচই করতে করতে চললাম। বাগনান পার হয়ে বরদাবারের দিকে যত এগোচ্ছি আশপাশের লোকেরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ততই হাত নেড়ে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। কী সুন্দর গ্রাম সব, ঝকঝকে তকতকে উঠোন। লেপা-মোছা ঘরদোর। ফুলে ফলে শোভিত বাগান। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল।

যাই হোক, সন্ধের সময় আমরা বরদাবার পৌঁছলাম। সেখানকার লোকজন আমাদের সুবিধার জন্য মালপত্তরগুলো বয়ে নিয়ে চলল। একজন প্রিসাইডিং অফিসার, তিনজন পোলিং অফিসার, একজন চৌকিদার ও একটি অস্থিচর্মসার তালপাতার সিপাইকে নিয়ে আমরা মোট ছ'জন।

গ্রামের প্রান্তে বড় একটি পুকুরের ধারে মুখোমুখি দুটি চালাঘর। এ দুটোই স্কুল। তারপরে ধু-ধু করছে শুধু মাঠ আর বন। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও খেতগুলি সবুজ বোরো ধানে ভরে আছে। বাতাসের আন্দোলনে মাঝে মাঝে ঢেউ খেলছে ধানেব শিষে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। আমার মন ভরে উঠল।

দূরের পথ বলে ভোটের আগেই আমাদের যেতে হয়েছিল। এতে কেউ কেউ বিরক্ত হলেও আমার কিন্তু আনন্দ হয়েছিল খুব। কেননা আমি শহুরে মানুষ। গ্রাম ভালবাসি। পরশু তো সময় পাব না। কাল সারাদিনে গ্রামটা একটু ঘুরে নিতে পারব।

নির্দিষ্ট স্থানে মালপত্তর রেখে আমরা প্রথমেই আলোচনায় বসলাম আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে। কেননা এইসব কাজে এসে কোনও প্রার্থী বা অপর কারও বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করা যায় না। অথচ এমন এক জায়গায় এসেছি যেখানে না আছে কোনও হোটেল, না আছে দোকান। আমাদের সঙ্গে যে চৌকিদারটি ছিল তার নাম শ্যামল। সে এ অঞ্চলেরই ছেলে। তাকে বললাম, "ভাই শ্যামল, তুমি যেখান থেকে হোক একটি লোককে জোগাড় করে আনো। সে এই দু'দিন সকাল-বিকেল একটু রেঁধেবেড়ে দেবে। না হলে মহা মুশকিলে পড়ে যাব আমরা।

শ্যামল মাথাটা একটু চুলকে নিয়ে বলল, "আচ্ছা দেখছি কতদূর কী করতে পারি।"

আমাদের প্রিসাইডিং অফিসার ছিলেন শ্যামপুরের এ-ই-ও। সুদর্শন যুবক। বললেন, "দেখছি নয়, আনতে হবে।"

শ্যামল চলে গেল। খুব করিৎকর্মা ছেলে। কিছু সময়ের মধ্যেই একজন বয়স্কা স্ত্রীলোককে ধরে আনল সে। বলল, "এই মাসি আপনাদের কাজ করতে রাজি আছেন।"

আমি বললাম, "আপনাদের মানে? তুমি কি আমাদের ছাড়া?"

শ্যামল বলল, "না, তা নয়। পাশের গ্রামেই আমার বাড়ি। আমি সেখানে গিয়েই খেয়ে আসব।"

প্রিসাইডিং অফিসার বললেন, "না, তা হবে না। তোমাকেও আমাদের সঙ্গে এইখানেই খেতে হবে।"

শ্যামল বলল, "যা আপনারা বলবেন।"

আমি মাসিকে বললাম, "তা মাসি, তুমি রাজি আছ তো?"

মাসি লাজুক মুখে বলল, "ক্যান্ থাকবুনি। কিন্তু আপনারা কীরকম কী দেবে বলো দিকিনি?"

তুমি কী চাও বলো?

আপনাদের সঙ্গে দু' বেলা পেটভরে খাওয়া আর দশ টাকা নগদ।

বললাম, "পাবে। এবার কোমর বেঁধে লেগে পড়ো তা হলে।" বলে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে শ্যামলের হাতে টাকা দিয়ে বললাম, "এবার ভাই যেখানে যা পাওয়া যায় তুমি কিনেকেটে নিয়ে এসে আমাদের ব্যবস্থা করে দাও, কেমন?"

শ্যামল টাকা নিয়ে চলে গেল।

আমরা অনেক রাত পর্যন্ত দাওয়ায় বসে গল্প করে আলাপ-আলোচনা করে কাটালাম। তারপর রান্না হলে গরম ভাত, আলু-কুমড়ো ভাজা, ডিমের ঝোল ও আমের অম্বল দিয়ে উদরপূর্তি করে ঘরের দরজা বন্ধ করে যে যার মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল শেষ রাতে। ঘুম ভাঙতেই শয্যাত্যাগ করলাম। প্রাতঃকৃত্যটা মাঠেই সারতে হবে। অতএব দেরি না করাই ভাল। আমি উঠে ঘড়ি দেখে টর্চটা হাতে নিয়ে আর কারও ঘুমের ব্যাঘাত যাতে না ঘটে সেজন্য পা টিপে টিপে বাইরে এলাম। আকাশ নক্ষত্রে গিজগিজ করছে। রাত তখন সাড়ে তিনটে। একেবারে শেষরাত। চারদিক ফাঁকা। একা চললাম ধানখেতের কাছে নাবাল জমিতে। জমিতে বসে-বসেই দেখলাম আমাদের স্কুলঘরের চালায় যেন কার একটা গামছা শুকোচ্ছে। দেখে একটু অবাক হলাম। এমন অসময়ে গামছাটা ওখানে কে শুকোতে দিল? যতদূর জানি আমাদের যার যার জিনিস তার তার কাছেই আছে। আবার ভাবলাম, চোখের ভুল নয় তো?

কেননা এই মুক্ত প্রান্তরে এত হাওয়া যেখানে বইছে সেখানে গামছাটা একটুও উড়ছে না কেন? অথচ শেষ রাতের ফিনফিনে আলোয় গামছাটা বেশ ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, মাঠ থেকে উঠে কাছে এসে আর একবার গামছাটাকে ভাল করে দেখলাম। না, কোনও ভুল নেই দেখার। ভাবলাম, নিশ্চয়ই কেউ এখানে গামছা রেখে মাঠে গেছে। কিন্তু কোথায় কে? যতদূর চোখ যায় কেউ কোথাও নেই। যাই হোক, যারই গামছা হোক না কেন, এ নিয়ে আমারও কোনও মাথাব্যথা নেই। পাশের পুকুর থেকে মুখহাত ধুয়ে কাপড় কেচে উঠে এলাম। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। উঠে এসে দেখলাম গামছাটা যেন ম্যাজিকের মতো উধাও হয়ে গেছে। আশপাশে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। চারদিক এত ফাঁকা যে, এইটুকু সময়ের মধ্যে গামছাটা নিয়ে চলে যাওয়াও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মনটা কীরকম খারাপ হয়ে গেল। ভয়ও পেলাম একটু। গা-টাও ছমছম করে উঠল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মশারি খুলে নিজের বিছানাপত্তর গুটিয়ে রাখলাম। অনেক পরে ভোর হল।

সকালবেলা সহকর্মীদের কাছে ঘটনাটা বলে জানতে চাইলাম, আমাদেরই ভেতর থেকে কেউ গামছাটা ওখানে রেখেছিল কিনা। কিন্তু না। একবাক্যে সকলেই না করল। সবাই যে যার পুরনো গামছা বের করে দেখাল। ও গামছাটা তো নতুন। তা ছাড়া কাল রাতে শয্যাগ্রহণের পর কেউ ওঠেওনি।

কথাটা প্রচার হতে গ্রামের অনেকেরই মুখ দেখলাম শুকিয়ে গেল। এক ভদ্রলোক বললেন, "আপনাদের বলে দেওয়া হয়নি জায়গাটা একটু দোষাস্ত। শুধু আপনি নয়, আমাদেরও অনেকেই ওইরকম নতুন গামছা বা লালপাড় শাড়ি শুকোতে দেওয়া অবস্থায় দেখেছে। কিন্তু যার জিনিস আজ পর্যন্ত তাকে কেউ দেখেনি। যাই হোক, রাতভিত একা কেউ বেরোবেন না ঘর থেকে।"

যে মাসি আমাদের রান্না করে দিচ্ছিল সে তো শুনেই চোখ বড় বড় করে বলল, "ওমা! ই কি কাণ্ড গো। তবে শোনো বাছা। আপনারা যদি ভয় না পাও তা হলে বলি", বলেই সে নানারকম উদ্ভট গল্প শোনাতে লাগল। এসব নাকি ভুতুড়ে ব্যাপার। এমনকী এও বলল, যে ঘরটায় আমাদেব রান্না খাওয়া হচ্ছে সে ঘরটায় এত ভূতের উপদ্রব যে, রাত্তির বেলা কেউ ও-ঘরে টিকতে পারে না। এবং সেই কারণেই আমাদের থাকার জন্য এই ঘরখানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর পর সারাদিন ধরে চলল আমাদের মধ্যে নানারকম বিশ্বাস অবিশ্বাসের পালা। ঝড়টা বেশি বইল আমার ওপর দিয়ে। সবাই বলল, "দুর মশাই! সাত সকালবেলায় আপনি এমন মেজাজটা খেঁচড়ে দিলেন যে সারাদিনের সব কাজ মাটি।"

আমাদের প্রিসাইডিং অফিসার অত্যন্ত স্মার্ট ও একরোখা যুবক, ভূত-টুত তো বিশ্বাসই করেন না। কাজেই এসব ব্যাপার তাঁর কাছে স্রেফ একটা হাসির খোরাক ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বারবার আমাকে বলতে লাগলেন, "ওই দেখুন বরুণবাবু, কে আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।"

চৌকিদার শ্যামল বলল, "আজ রাতে শোওয়ার সময় আপনাকে বেশি করে জল খাওয়াব। যাতে মাঝরাতে একা উঠতে হয়।"

তালপাতার সেপাই বলল, "আমার হাতে মশাই এই বন্দুকের নলটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমি কাউকে পরোয়া করি না। ভূতের হিম্মত থাকে আমার সঙ্গে এসে লড়ে যাক।"

শুধু এই নয়। আরও অনেক টিটকিরি, অনেক হাসাহাসি চলল সারাদিন ধরে। আমি অবশ্য চুপচাপ রইলাম। তা ছাড়া উপায়ও নেই। কেননা এটা তো ঠিক, আজকের দিনে এইসব উদ্ভট ব্যাপার কাউকে বিশ্বাস করানো যায় না। যাই হোক সারাদিনে আমরা ঠাট্টা তামাশা ও হাসাহাসির মাঝে বুথটাকে বেশ ভালভাবেই সাজিয়ে রাখলাম। কাল ভোট। যাতে সকালবেলা কোনওরকম অসুবিধা না হয় সেইভাবে সব ঠিকঠাক করে ব্যালট পেপারগুলো বিছানায় নিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে-শুয়েও অনেকক্ষণ ভূত ভূত করে কাটল।

শ্যামল বলল, "ওই দেখুন, চালার ওপর কীসের শব্দ হচ্ছে।"

তালপাতার সেপাইটা বলল, "আমার বেঞ্চিটা যেন কীরকম দুলছে ভাই।"

কে যেন একজন বলল, "বরুণবাবু, একবার উঠে দেখুন তো। মনে হল আপনার নাম ধরে বাইরে কে যেন ডাকল।"

এ সবই রসিকতা।

প্রিসাইডিং অফিসার বললেন, "কী মশাই, আপনারা কি একটু ঘুমোতে দেবেন, না কী? কাল কিন্তু ভোর ভোর উঠতে হবে। তারপর সারাদিনে নিশ্বাস ফেলবারও সময় পাবেন না। ভোট শেষ হলেও রেহাই নেই। লরির আশায় হাঁ করে বসে থাকতে হবে। উলুবেড়িয়ায় গিয়ে মালপত্তর জমা দিতে হবে। চুপচাপ শুয়ে পড়ুন সব।"

কথাটা ঠিকই। রসিকতা ছেড়ে সবাই চুপ করল। একটু পরে দু-একজনের নাক ডাকার শব্দও শোনা গেল। তারও পরে একসময় নিজেও ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে হঠাৎ একটা চিৎকার ও গোঙানির শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। কী ব্যাপার? ব্যাপার কী? আচমকা ঘুম ভেঙে গিয়ে হাত পা থরথর করে কাঁপছে তখন। সবাই 'কী হল, কী হল' বলে মশারি গুটিয়ে টর্চ জ্বেলে উঠে দাঁড়ালাম। আমাদেরই ভেতর থেকে কে যেন একজন হারিকেন জ্বালল। সেই আলোয় দেখলাম সেপাই ও চৌকিদারটি দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে মেঝেতে বিছানা মশারি সমেত ড্যালা পাকিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমরা তাদের মুক্ত করে চোখেমুখে জল দিয়ে পাখার বাতাস করতে লাগলাম। অনেক পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে তারা যা বলল তা হল এই—মধ্যরাত্রে সেপাই ও চৌকিদারটি হঠাৎ অনুভব করল কে যেন ওদের পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রথমে ওরা ভেবেছিল আমাদেরই ভেতর থেকে কেউ নিশ্চয়ই ওদের ভয় দেখাবার জন্য ওইরকম করছে। তাই ওরা টর্চ জ্বেলে খুব ভালভাবে যখন দেখল আমরা সবাই নিদ্রামগ্ন তখন ওরা সজাগ হয়ে রইল। খানিক শুয়ে থাকার পরই ওরা অনুভব করল কে যেন ওদের দু'জনের পা দুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আবার টিপে দিচ্ছে। ওরা টর্চ জ্বেলে দেখল কোথায় কে? আবার দু'জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে শুয়ে পড়ল। ঘুম তো এলই না, উপরন্তু পাছে বিরক্ত হয় সেই ভয়ে কেউ ডাকতেও পারল না আমাদের। ওরা দু'জনে তখন যুক্তি করে দু'জনের শয্যা এক করে নিয়ে একই মশারির ভেতর জেগে শুয়ে রইল। একটু পরেই আবার পা টেপা। যে হাত ওদের পা টিপে দিচ্ছে সে হাতের শাঁখা, নোয়া, চুড়ি ইত্যাদির স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা এবার টর্চ না জ্বেলে উঠে বসতে গিয়েই দেখল মশারির কোণে এক বীভৎস চেহারার মহিলা ওদের দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে বসে আছে। তার সেই চাউনির মধ্যে ক্রোধের আগুন যেন ছিটকে বেরোচ্ছে। এর পরের কথা ওদের মনে নেই। ওরা চিৎকার করে জ্ঞান হারায়।

ওদের কথা শুনে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমাদের প্রত্যেকেরই গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত তখন একটা। সে রাত্রে আমরা আর কেউ ঘুমোলাম না।

প্রেত আতঙ্ক

তখন শীতকাল। কোনও এক ছুটির দুপুরে আমি নবনির্মিত দোতলার ঘরে শুয়ে পত্রপত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু তারক এসে বলল, "এই দ্যাখ! এটা দেখেছিস? আজকের কাগজে বেরিয়েছে।"

আমি চেয়ে দেখলাম, খবরের কাগজে 'সম্পত্তি বাড়ি জমি' বিভাগে ছোট্ট একটি বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের হেডিং হচ্ছে 'ভুতুড়ে বাড়ি'। নীচে লেখা আছে : 'ঘাটশিলায় কাশীদা অঞ্চলে আমাদের সাবেক কালের বাড়িটা ভূতেব উপদ্রবের জন্য বেচে দিতে চাই। সম্পূর্ণ খালি বাড়ি। সামান্য আসবাবপত্র যা আছে তা সমেত বাড়িটার দাম পাঁচ হাজার টাকা। সব জেনেশুনে যদি কেউ কিনতে চান, নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।'

আজ থেকে বছর তিরিশ আগে যে সময়কার কথা বলছি তখন পাঁচ হাজার টাকার দাম ছিল অনেক। কাজেই পাঁচ হাজারে যখন বাড়িটা বিক্রি হচ্ছে তখন নিশ্চয়ই বেশ বড় বাড়ি। আমি কাগজটা রেখে উঠে বসে বললাম, "বেশ অভিনব বিজ্ঞাপন তো! আর বাড়ির মালিকও খুব সৎ লোক মনে হচ্ছে। কেননা তিনি যখন সবকিছু জানিয়েই বাড়িটা বিক্রি করছেন তখন নিশ্চয়ই কোনও জোচ্চুরি বুদ্ধি তাঁর নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, দেখে আমাদের লাভ কী? এত টাকা তো আমাদের নেই যে, এই বাড়ি আমরা কিনব। অতএব কিনবে কে?"

তারক বলল, "বাড়ি কেনার লোকের কি অভাব আছে রে! মোহনের জ্যাঠামশাই একবার ঘাটশিলায় বাড়ি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এখন বিজ্ঞাপনটা তাঁকে দেখালে নিশ্চয়ই তিনি রাজি হয়ে যাবেন। আর ভৌতিক ব্যাপারস্যাপার যেগুলো, সেগুলো তাঁকে যুক্তিতর্ক দিয়ে নস্যাৎ করিয়ে দিলেই হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, এই সুযোগে ঘাটশিলাটা একবার ঘুরে আসা।"

প্রস্তাবটা চানাচুরের মতোই মুখরোচক। বললাম, "আরে ব্বাঃ। বেশ বলছিস তো! চল তবে। এখুনি যাই।" আমরা দু'জনে তখন খবরের কাগজের ওই অংশটার ওপর লাল পেনসিলে দাগ দিয়ে শিবপুরে মোহনদের বাড়ির দিকে চললাম। ওদের বাড়িতে গিয়ে মোহনকেও পেয়ে গেলাম অপ্রত্যাশিতভাবে। আসলে ছুটির দিন তো! এই সময়টা খেয়ে দেয়ে সবাই একটু বিশ্রাম করে। মোহনকে কাগজটা দেখাতে ও একটু অবাক হয়ে গেল। তারপর বলল, "বেশ মজার ব্যাপার! ভূতের বাড়ি এই কথা আগে থেকে জানিয়ে কেউ আবার বিজ্ঞাপন দেয় নাকি? লোকটার মাথাখারাপ নেই তো! না কি বিজ্ঞাপনটাই ফল্‌স?"

তারক বলল, "দেখ মোহন, এটা যখন বিজ্ঞাপন তখন ফল্‌স এটা কিছুতেই নয়। কেননা কার এত টাকা আছে যে, খরচা করে এইসব ফাজলামি করতে যাবে?"

মোহন বলল, "তা ঠিক। তবে জ্যাঠামশাই যা ভিতু লোক, তাতে এ বাড়ি উনি কিনতেই চাইবেন না।"

তারক বলল, "আরে বাবা বুঝছিস না কেন, ভূতটুত ওসব বাজে। আসলে ভদ্রলোকের সম্পত্তি অনেক। বিক্রি করতে চাইছেন কিন্তু খদ্দের পাচ্ছেন না। কাজেই এই চমক লাগানো বিজ্ঞাপনে কিছু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। অনেক লোক তো আছে ভূতের নামে হাড়ে চটা, তাদেরই ভেতর থেকে কেউ হয়তো জেদ করে বাড়িটা কিনেই ফেলল।"

"এটা অবশ্য মন্দ বলিসনি। ঠিক আছে, এসেছিস যখন বোস তোরা। জ্যাঠামশাই সবে শুয়েছেন। উঠলেই খবরটা দিচ্ছি। তারপর বাড়ি কেনা হোক না হোক দেখতে যাওয়ার ছলে দু-চারদিন ঘাটশিলা থেকে ঘুরে আসা যাবে'খন।"

তারক বলল, "আমিও তাই বলি। তোর জ্যাঠামশাইকে যেভাবেই হোক তুই রাজি করা। আমাদের তিনজনের তা হলে রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে। আর যদি সম্ভব হয় তো এক রাত ভূতের বাড়িতে কাটিয়েও আসতে পারব আমরা। ভূত সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতাও হবে আমাদের।"

সেই দুপুরটা আমরা তিনজনে এক নতুন আনন্দে চুটিয়ে গল্প করে কাটালাম। তারপর বিকেলবেলা খবরের কাগজটা মোহনের জ্যাঠামশাইকে দেখাতেই লাফিয়ে উঠলেন তিনি, "না না। ও বাড়ি আমি কিনব না। আমি টাকা দিয়ে জিনিস কিনব, ওইসব ঝামেলার মধ্যে কেন যাব আমি? তা ছাড়া তোমরা আজকালকার ছেলেরা ভূতপ্রেত মানো না বটে, কিন্তু আমি মানি। কেননা আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনেক সময় ভূতের অস্তিত্ব অনুভব করেছি। তাই বলি, কী দরকার বাবা, ওইসবের মধ্যে যাওয়ার? তবে ঘাটশিলায় একটা বাড়ি কেনবার ইচ্ছে আমার আছে। আমি বরং তোমাদের কিছু টাকা দিচ্ছি, তোমরা তিনজনে দিনকতক ঘাটশিলা থেকে ঘুরে এসো। আর যদি কোথাও ভাল কোনও বাড়ির খোঁজখবর পাও তো দেখে এসো। পরে দরদাম করে কেনা যাবে।"

আমরা তাতেই রাজি হয়ে মনের আনন্দে ঘাটশিলা যাওয়ার তোড়জোড় করতে লাগলাম।

পরদিন বেলা এগারোটায় নাগপুর প্যাসেঞ্জারে (বর্তমানে কুরলা এক্সপ্রেস) চেপে আমরা ঘাটশিলার দিকে রওনা হলাম। সন্ধের পর যখন স্টেশনে নামলাম তখন চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। ঘাটশিলা তখন এখনকার মতো শহর নয়। একেবারে বুনো জায়গা ছিল। স্টেশনের কাছেই একটি চায়ের দোকানে খোঁজখবর নিয়ে চার-পাঁচদিনের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করে ফেললাম আমরা।

রাতটা ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে পরদিন সকালে আমরা তিনজনে যুক্তি করে সেই ভূতের বাড়িটাই দেখতে চললাম। ঠিক হল বাড়ি যদি পছন্দ হয় তা হলে ওই বাড়িই জ্যাঠামশাইকে রাজি করিয়ে কেনাব আমরা। আর যদি না হয় তা হলে এক রাত ওই বাড়িতে থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরে আসব।

খবরের কাগজে দেওয়া ঠিকানার খোঁজ করে আমরা রাজবাড়ির কাছে বিজ্ঞাপনদাতার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। ভদ্রলোকের নাম সিন্ধুবাবু। কৃপাসিন্ধু রায়। বেশ অভিজাত পরিবারের লোক বলে মনে হল। আমরা যখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন সকাল ন'টা। বাড়ির চাকর এসে আমাদের বৈঠকখানার ঘরে বসতে বলল। আমরা বসলাম। একটু পরেই সর্বাঙ্গে শাল মুড়ি দিয়ে মধ্যবয়সী সিন্ধুবাবু এসে বসলেন আমাদের সামনে। তারপর স্মিত হেসে বললেন, "কোথা থেকে আসছেন আপনারা? আপনাদের পরিচয়?"

তিনজনের হয়ে আমিই বললাম, "আমরা হাওড়া থেকে আসছি। আমার এই বন্ধুটি

খবরের কাগজে আপনার দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখে ওই বাড়িটা কিনতে চান। অবশ্য বাড়িটা যদি পছন্দ হয়।"

"কিন্তু ওটা তো ভূতের বাড়ি। ও বাড়ি কিনে কী করবেন আপনারা?"

"ভূতের বাড়ি সেটা তো আমরা জেনেই আসছি। আর কিনতে চাই এই কারণে যে, ও বাড়িতে আমরা বরাবরের জন্য থাকতে আসছি না। ভূতের বাড়ি ভূতেরই থাকবে। আমরা শুধু মাঝেমধ্যে দিনকতকের জন্য এসে একটু উপদ্রব করে যাব।"

সিন্ধুবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঠিক আছে, একটু বসুন আপনারা। আপনাদের চা জলখাবার আসছে। তারপর আমার একজন লোক গিয়ে আপনাদের দেখিয়ে আনবে বাড়িটা।"

খানিক বসবার পরই চাকর এসে এক প্লেট করে গরম হালুয়া এবং ধূমায়িত চা এক কাপ করে রেখে গেল আমাদের সামনে। আমরা তিনজনেই খেয়ে নিলাম সেগুলো। তারপর সিন্ধুবাবুর লোকের সঙ্গে চললাম বাড়ি দেখতে। কাশীদা এখান থেকে অনেক দূরে। তবুও আমরা পায়ে হেঁটেই দেখতে গেলাম বাড়িটা।

সিন্ধুবাবুর যে লোক আমাদের বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর নাম রাখালদা। রাখালদা যেতে যেতে বললেন, "আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন তো? তা বলছিলাম কি—।"

মোহন বাধা দিয়ে বলল, "না রাখালদা। আমরা মোটেই কলকাতার লোক নই। আমরা হাওড়ার লোক। শিবপুরের বাসিন্দা। হাওড়া থেকেই আসছি।"

"সে যেখানকারই লোক হোন না কেন, হাওড়া আর কলকাতা একই ব্যাপার। তা বলছিলাম কি, এ বাড়ি আপনারা কিনবেন না। দারুণ উপদ্রব এ বাড়িতে। আজ পর্যন্ত কেউ এক রাতও টিকতে পারেনি এখানে।"

"সে কী!"

"এসব বাড়ি দিনমানে ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ অফিস কাছারি ইত্যাদির জন্যই ভাল। কিন্তু থাকার পক্ষে এ বাড়ি উপযুক্ত নয়।"

"কেন বলুন তো?"

"শুনুন তবে। সিন্ধুবাবুরা এই অঞ্চলের অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী লোক। ঘাটশিলা এবং এর আশেপাশে বেশ কয়েকটি বাড়ি আছে এদের। কাশীদার এই বাড়িটি সিন্ধুবাবুদের সাবেককালের বাড়ি। ওঁর কাকা আর কাকিমার মধ্যে প্রায়ই খুব ঝগড়াঝাটি হত। এই বিবাদসূত্রেই সিন্ধুবাবুর কাকা এক রাতে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেন। সেই থেকেই উপদ্রব। তা উপদ্রব এমনই চরম পর্যায়ে পৌঁছল যে, কাকিমা ঠিক করলেন গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসবেন। কিন্তু সেখানেও নানা ঝামেলা। যাত্রাপথে ট্রেনের কামরাতেই কাকিমা স্বপ্ন দেখলেন, কাকাবাবু তাঁকে ভয় দেখিয়ে গয়ায় যেতে মানা করছেন। কিন্তু সেই স্বপ্নকে তিনি আমল না দিয়েই গয়ায় নেমে পাণ্ডা ঠিক করে সর্বাগ্রে চললেন প্রেতশিলায় পিণ্ডি দিতে। আর সেই সময়েই টাঙ্গা গেল লরির ধাক্কায় উলটে। কাকিমা পায়ের হাড় ভেঙে হাসপাতালে গেলেন। পিণ্ডি দেওয়া তো হলই না, উলটে ছ'মাসের ওপর হাসপাতালে থেকে ভাঙা পা নিয়ে ফিরে এলেন ঘাটশিলায়। তারপর একদিন ছাদ থেকে পড়ে তিনিও মারা যান। সেই থেকে ওই বাড়িতে যে কেউ থাকতে গেছে সে-ই নানারকম ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে।"

"বলেন কী!"

"হ্যাঁ। রাতদুপুরে এমন সব কাণ্ডকারখানা হয় ও বাড়িতে যে, কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে তা চোখ মেলে দেখার ব্যাপার নয়। একবার টাটানগর থেকে একদল ছেলে জোর করে ওই বাড়িতে থাকবে বলে এসেছিল, কিন্তু পরদিন সকালে তাদের কাউকেই আর দেখা যায়নি এখানে।"

"সে কী! ভূতেরা খেয়ে ফেলল নাকি তাদের?"

"না। রাত শেষ হওয়ার আগেই তারা পালিয়ে বাঁচে। এবং পরে টাটানগর থেকে চিঠি দিয়ে পালিয়ে আসার কারণও জানায়।"

"কী কারণ?"

"তা বলতে পারব না। তাই বলছিলাম, কী দরকার ও বাড়ি নিতে যাওয়ার? এর চেয়ে বাড়ি যদি সত্যিই কেনেন তো আমি একটা বাড়ির সন্ধান দিই আপনাদের।"

মোহন বলল, "বেশ তো, আগে দেখিই না এ বাড়িটা। তারপর যদি পছন্দ না হয় তখন আপনার বাড়িটাও দেখে আসা যাবে।"

এইভাবে কথা বলতে-বলতেই আমরা সেই বাড়ির কাছে এসে পৌঁছলাম। দূরে পাহাড়ের সারি। ছোট ছোট টিলা। ঘন শালবন। কী চমৎকার। তারই মধ্যে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি পাঁচিলঘেরা মস্ত দোতলা বাড়ি। বহুদিনের পুরনো। তবু আজও ব্যবহারযোগ্য।

তালা খুলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। বহুদিন ঘরে ঝাঁট পড়েনি। বাগানটা আগাছায় ভরা। এই বাড়ির পাঁচ হাজার টাকা দাম মানে জলের দাম। কেননা অনেক জায়গা। বড় বড় ঘর। ছোটখাটো প্রাসাদ একটা। বাড়িটার রিপেয়ারিং কস্টই পাঁচ হাজারের অনেক বেশি। এর আশপাশে অবশ্য কোনও বাড়ি নেই। যা আছে সবই দূরে দূরে। আমরা বাড়িতে এসে নীচে-ওপর করে সব ঘরগুলো ঘুরেফিরে দেখলাম। বসবাসের জন্যই হোক আর অবসর বিনোদনের জন্যই হোক, এর চেয়ে লোভনীয় বাড়ি সত্যিই হতে পারে না।

আমরা সবাই একমত হয়ে বললাম, "রাখালদা, আপনি যাই বলুন না কেন, এ বাড়ি আমরা কিনবই।"

মোহন বলল, "শুধু তাই নয়, আজ থেকে যে ক'দিন আমরা ঘাটশিলায় আছি সে ক'দিন এই বাড়িতেই থাকব আমরা।"

রাখালদা একটু মনমরা হয়ে বললেন, "যা আপনারা ভাল বোঝেন তাই করবেন। পরে যেন দোষ দেবেন না আমাদের। আর একটা কথা, এখানে আলোর কোনও কানেকশন নেই। দোকান থেকে একটা হারিকেন অথবা লণ্ঠন আনিয়ে রাখবেন।" এই বলে আমাদের হাতে চাবি দিয়ে চলে গেলেন রাখালদা।

এর পর এক সময় আমরাও আমাদের সেই ভাড়াকরা বাড়িতে গিয়ে মালপত্তর যা ছিল নিয়ে চলে এলাম এখানে। তারপর সারাদিন ধরে এ-ঘর সে-ঘর নীচে-ওপর এই করতে লাগলাম। সম্পূর্ণ বাড়িটা আমাদের দখলে পেয়ে মনের ভাব এমনই হল, যেন বাড়িটা আমাদের হয়েই গেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের এই বাড়িতে আসতে দেখে কিছু কৌতূহলী মানুষও উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল এদিক-সেদিক থেকে। আমরাও সবার জন্যই বাড়িটার অবারিত দ্বার রাখলাম। সবাই যখন শুনল আমরা এই বাড়ি কিনতে চাই তখন যারপরনাই অবাক হয়ে

গেল সকলে। সবাই একবাক্যে বারণ করতে লাগল এই বাড়িতে না থাকা বা এই বাড়ি না কেনার জন্য। সবাই বলল, "বাড়িটা সত্যিই উপদ্রবের বাড়ি। নাহলে কখনও এত কম দামে এতবড় একটা বাড়ি এখানে এতদিন খালি পড়ে থাকে?"

আমরা সব শুনলাম। শুনে বললাম, "তবুও আমরা নিজেরা একবার পবখ করে দেখতে চাই। যদি সেরকম খারাপ কিছু না ঘটে তা হলে এই বাড়িই আমরা কিনছি।"

অবশেষে আমাদের জেদ দেখে দু-একজন একটু অন্য সুরে কথা বলল, "তা একান্তই যখন কিনবেন আপনারা তখন দু-এক রাত এখানে থেকেই দেখুন, বাড়িটার বদনাম আছে ঠিকই। তবে সচরাচর কেউ তো থাকে না। এইভাবে মানুষজন সাহস করে এলে, থাকতে থাকতে কী হয় কে বলতে পারে? দেখাই যাক না, এতদিনে ভূতের উপদ্রব একটু কমেছে কিনা?"

কেউ বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। সাহস করে থেকেই যান। তা ছাড়া আমরা যখন জেনে গেছি তখন আমরাও একটু সজাগ থাকব। যদি বেশি ভয়টয় পান তো ছাদে উঠে জোরে চেঁচাবেন। দলবেঁধে ছুটে আসব সবাই।"

আমরা জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরে আলো জ্বেলে তিন বন্ধুতে এই নির্জন বাড়িতে সত্যিকারের ভূত এলে কীভাবে মোকাবিলা করব সেই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করে যখন দেখলাম সব ভোঁ ভাঁ তখন তক্তাপোশে পাতা বিছানায় মশারি খাটিয়ে আমরা তিনজনে জড়াজড়ি করে লেপচাপা দিয়ে শুলাম। শোওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুম।

রাত তখন কত তা কে জানে! হঠাৎ ঝনঝন করে দরজার শিকল নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমাদের। শিকল নাড়তে নাড়তে কে যেন একজন ভারিক্কি গলায় বলল, "এই যে, কে আছেন ভেতরে? দরজা খুলুন।"

আমরা তিনজনেই উঠে বসলাম।

মোহন বলল, "কে!"

"কে, তা দেখতেই পাবেন। দরজা খুলুন।"

আমরা উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! কোথায় কে? সব ফাঁকা। দালানের দরজাটাও খিল দেওয়া। যেমনকার তেমনই আছে। কে তা হলে কীভাবে এসে ঘুম ভাঙাল আমাদের?

ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এল পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে। আমরা আবার দরজা বন্ধ করে শুতে এলাম। কিন্তু এসে দেখি অসম্ভব ব্যাপার। এরই মধ্যে আমাদের তক্তাপোশটা ঘরের উলটোদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং আমাদের বিছানাও দখল করেছে কারা। দেখলাম আমাদের লেপটা মুড়ি দিয়ে কারা যেন দু'জনে শুয়ে আছে। লেপটা এমনভাবে ঢাকা যে, মুখ দেখতে পাচ্ছি না তাদের। শুধু মাথা দুটো দেখা যাচ্ছে। আমরা যত জোরে লেপটা তাদের গা থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, তারা তত বেশি আঁকড়ে ধরতে লাগল লেপটাকে।

অবশেষে অনেকক্ষণ টানাহেঁচড়ার পর লেপ আবার আলগা হয়ে গেল। বিছানা থেকে লেপটা উঠিয়ে নিয়ে দেখলাম কেউই নেই ভেতরে। আমরা তিনজনে আবার তক্তাপোশটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে এনে ফের লেপের তলায় ঢুকলাম।

তারক বলল, "না ভাই, কাজটা ভাল করিনি। এতগুলো লোকের কথা ঠেলে এই বাড়িতে

রাত কাটাতে এসে খুবই অন্যায় কাজ করেছি। এখন ভালয় ভালয় ফিরে যেতে পারলে বাঁচি। উঃ! কী সাংঘাতিক!"

আমি তো ভয়ে কোনও কথাই বলতে পারলাম না।

মোহন বলল, "সকালটা একবার হলে হয়! এর আগে সত্যি কথা বলতে কি, ভূতপ্রেত আমি বিশ্বাসই করতাম না। অথচ আজ যা দেখলাম একে মনের ভ্রম বলে উড়িয়ে দেওয়ার মতো মানসিকতাও আমার নেই। এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়।"

আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে আরও কিছু ঘটে কিনা দেখবার আশায় জেগে রইলাম। ঘুম তো এলই না, ঘুমোতে সাহসও হল না। ঘুমিয়ে পড়লে আবার যদি শিকল ঝনঝন করে?

বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর আমরা দালানে একটা খটখট শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হল কে যেন চটি পরে পায়চারি করছে। দালানের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত একবার যাচ্ছে, একবার আসছে। তারপর আবার সেই ঝনঝন করে শিকল নাড়ার শব্দ। সভয়ে আমরা তিনজনে তিনজনকে জড়িয়ে ধরলাম। কেউ আর উঠলাম না দরজা খুলতে। শিকল ঝনঝন করে বেজেই চলল। তারপরই শোনা গেল আবার আগের মতোই ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, "কারা আছে ঘরের ভেতর? দরজাটা এত করে খুলতে বলছি যে, দরজা খোলো।"

কে খুলবে দরজা?

আমরা তখন আতঙ্কে নীল হয়ে উঠছি ক্রমশ।

কে-ই-বা যাবে দরজার কাছে? উঠে দাঁড়াবারও যে শক্তি নেই কারও!

ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, "দরজা না খুললে কিন্তু ভয়ানক ব্যাপার হবে। খোলো বলছি। না হলে ভেঙে ঢুকব।" বলার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজায় দমাদ্দম লাথি পড়তে লাগল।

অগত্যা উঠতেই হল।

তিনজনে পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে খিলটা খুলতেই দরজাটা সশব্দে দু' হাট হয়ে খুলে গেল। মনে হল কেউ যেন ওদিক থেকে জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলে দিল দরজাটা। সে কী দারুণ শব্দ। গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠল বুঝি! কিন্তু তা না হয় হল। আবার তো সেই আগের মতোই ভোঁ ভাঁ। কেউ কোথাও নেই।

এই শীতেও গায়ে ঘাম দিল তখন। এর পরে আর বিছানায় ফিরে যাওয়ার মতো মন বা সাহস নেই। সেখানেও তো ওই আগের মতোই খারাপ ব্যাপার ঘটবে। অর্থাৎ কিনা লেপ নিয়ে টানাটানি। কী যে করি! পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি এমন সময় হঠাৎ আমাদের লণ্ঠনটা কে যেন আছাড় মেরে ভেঙে ফেলল ঘরের ভেতর। অন্ধকার, অন্ধকার—ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ঘরে ঢুকে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে যে যার জামা-প্যান্ট পরে নিলাম। মোহনের টর্চ ছিল। টর্চ জ্বেলে হাতঘড়িতে দেখে নিলাম রাত তখন আড়াইটে। এখনই পালাতে হবে এখান থেকে। নাহলে যে কোনও মুহূর্তে ভয়ানক একটা কিছু ঘটে যেতে পারে।

ওদিকে বারান্দার দরজাতেও তখন দমাদ্দম লাথি পড়তে শুরু হয়েছে! লাথির পর লাথি, আর তার সঙ্গে সেই প্রচণ্ড ধমকানি, "খোলো বলছি, খোলো। নাহলে ভাল হবে না। শিগগিব খুলে দাও।"

আমরা কোনওরকমে দরজা খুলেই এক লাফে বাইরের বাগানে এসে পড়লাম। তারপর পেছন ফিরে দেখি দালানের দরজার কাছে আগুনে পোড়া ঝলসানো চেহারার এক বিকট

মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ তাকে বলব না। মানুষ কখনও অত কুৎসিত হয় না। মানুষ কখনও অত দীর্ঘ হয় না। মানুষের চোখ দিয়ে কখনও অত আগুন বেরোয় না। আমরা বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারলাম না সেদিকে। বাগানের দরজার খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। অদূরে একটি আদিবাসী বস্তি ছিল। বাকি রাতটুকু সেখানে কাটিয়ে ভোরের ট্রেনেই হাওড়ায়।



পুষ্কর

অনেকদিন আগেকার কথা। হাওড়া বাঁশতলা শ্মশানে রাতবিরেতে মড়া পোড়াতে যাওয়া একটা রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার ছিল। চারদিকে ঘুটঘুটে করত অন্ধকার বাঁশবন। আগাছার জঙ্গল। শুধু তাই নয়, নানারকম ভৌতিক ব্যাপারও ঘটত।

সেবার গ্রীষ্মের শুরুতেই হঠাৎ এই অঞ্চলে খুব মহামারি দেখা দেয়। তা এক সন্ধ্যায় মধ্য হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরের এক ভদ্রলোক কলেরায় মারা যান। এই মড়া তো সারারাত ফেলে রাখা যায় না, তাই মৃতদেহ নিয়ে বাড়ির লোকেরা চলল শবদাহ করতে। চারজন কেঁধো আর দু'জন বাড়তি। মোট ছ'জন। সঙ্গে ভদ্রলোকের ভাইপোও ছিল। ভাইপোর নাম বিশু। সে ছিল খুব ডাকাবুকো।

গোছগাছ করে মড়া নিয়ে যেতে রাত হয়ে গেল অনেক। তা প্রায় দশটা। মড়া শ্মশানে নামিয়ে অন্যান্য কাজে মানে কাঠকুটো, নতুন কাপড়, মেটে কলসি ইত্যাদি জোগাড় করতে সবাই চলে গেল। মড়া আগলে বসে রইল বিশু।

সামনেই শ্মশানকালীর মন্দির। মন্দিরে একটি রেড়ির তেলের মাটির প্রদীপ জ্বলছে। দেবীমূর্তিকে দেখাচ্ছে অতি ভয়ঙ্করী। এ ছাড়া ঝোপঝাড় থেকে কীটপতঙ্গর ডাক, শ্মশানের নিমগাছ, বটগাছ থেকে প্যাঁচার ডাক ও শেয়াল-কুকুরের চেঁচানিতে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেখানে। সে এমনই এক পরিবেশ যে, বিশুর মতো সাহসী যুবকেরও বুক কেঁপে উঠতে লাগল মাঝে মাঝে।

এরই মধ্যে একবার মড়িপোড়া বামুনটা এসে বলল, "এ কী! তুমি একা? আর কেউ নেই?"

বিশু বলল, "আর কারও থাকার দরকারও নেই। আমি একাই একশো।"

"এ জায়গা ভাল নয় বাবা। মাথার চুল পেকে গেছে আমার। তোমার চেয়ে অনেক আচ্ছা আচ্ছা সাহসী ছেলে আমি দেখেছি। একটু সাবধানে থেকো। মড়া ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। কিছু দেখলে অযথা গোঁয়ার্তুমি কোরো না। আর ভয় পেলে আমাকে ডেকো। আমি ওদিকে থাকি।"

বিশু বলল, "আপনি যান তো মশাই, আমাকে একটু একা থাকতে দিন। আমার বহু দিনের সাধ ভূত দেখার। আজ যদি ভূত একটা দেখতে পাই তো সে সুযোগ ছাড়ি কেন? যতসব বুজরুকি।"

অগত্যা বামুন ঠাকুর চলে গেলেন।

বিশু মড়ার খাটিয়ার পাশে বসে কিছুক্ষণ পায়ের ওপর পা রেখে দোলাতে লাগল। তারপর মনের আনন্দে শিস দিল। হঠাৎ "ম্যাও।"

একটা বেড়াল ডাকল যেন।

কোথায় বেড়ালটা?

আবার "ম্যাও।"

বিশুর হঠাৎ চোখ পড়ল চিমনির দিকে। চিমনির ভেতর থেকে একটা কালো বেড়াল বেরিয়ে এসে ওর দিকে তাকিয়ে আবার ডাকল, "ম্যাও।"

বিশু সেদিকে তাকাতেই হঠাৎ ওর শরীরে কেমন শিহরন খেলে গেল। এ কী হল! এমন তো হওয়ার কথা নয়! ওর মতো সাহসী ছেলের ভূতের বদলে শেষকালে একটা বেড়াল দেখে...? না না। মন থেকে এ দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতেই হবে।

বিশু আবার বেড়ালের দিকে তাকাল।

বেড়ালের চোখ দুটো যেন তীব্র আলোকরশ্মির মতো জ্বলছে। সেই আলোর দিকে তাকানো যায় না।

বিশু মনের দুর্বলতা ত্যাগ করে তবুও একদৃষ্টে সেই বেড়ালের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বেড়ালটাও কিছুক্ষণ ওইভাবে থেকে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসতে লাগল এবার।

কিন্তু এ কী! বেড়ালটা হঠাৎ অতবড় হয়ে উঠছে কেন?

বিশুর এবার সত্যি ভয় হল।

ও দেখল, বেড়ালটা যত এগোচ্ছে ততই বড় হচ্ছে। এও কি সম্ভব! পাশেই একটা চিতা খোঁচা অর্ধদগ্ধ বাঁশ পড়ে ছিল। ও সেটা কুড়িয়ে নিয়েই রুখে দাঁড়াল এবার। বলল, "আর এক পা এগোবি তো মেরে ফেলব।"

বেড়ালটা তখন আর বেড়াল নেই। তার তখন বাঘের মতো আকার।

চোখেমুখে আগুনের হলকা আর কুচকুচে কালো গায়ের রং।

হঠাৎ কে যেন বিশুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে কেড়ে নিল বাঁশটা। তারপর সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "এ কী করছ হে ছোকরা। আমি জানি এরকম অঘটন একটা কিছু ঘটবে। দু'হাত জোড় করে ক্ষমা চাও ওর কাছে। বলো অন্যায় হয়ে গেছে।" বলে বামুন নিজেই বলতে লাগল, "তুমি ওকে ক্ষমা করো বাবা। ও ছেলেমানুষ। ওর অপরাধ নিয়ো না। তুমি স্বস্থানে ফিরে যাও।"

বিশু নিজেও তখন ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে। সেও একবার হাতজোড় করে বলল, "আমি তোমাকে অবিশ্বাস করেছিলাম, তাই কি তুমি এমন রূপে আমাকে দেখা দিলে? আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। কথা দিচ্ছি, আর কখনও তোমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করব না।"

অনেকক্ষণ ধরে ওদের কাতর অনুনয় বিনয়ের পর সেই বেড়ালটা যেমন এসেছিল তেমনই এক-পা এক-পা করে পিছু হটতে লাগল আর প্রতিটি পদক্ষেপে ছোট হতে হতে আবার সেই আগের চেহারায় পরিণত হল। তারপর চিমনিটার ভেতরে ঢুকে যেতেই মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল বিশু। ওর গা দিয়ে তখন দরদর করে ঘাম ছুটছে।

বামুন বলল, "ওই বেড়ালটা বেড়াল নয় বাবা। কালো বেড়াল অপঘাতে মরলে অনেক সময় ওরা পুষ্করযোনি প্রাপ্ত হয়। ওটাও তাই। মাঝেমধ্যে তিথি নক্ষত্রের দোষ ঘটলে ওকে এখানে দেখা যায়। ও জেগে উঠলে কারও সাধ্যি নেই ওকে আটকায়। আমি আসতে আর একটু দেরি করলেই ও শেষ করে ফেলত তোমাকে।"

বিশু বলল, "আপনি না এলে আমি সত্যিই রক্ষা পেতাম না ঠাকুরমশাই। ভূত আমি

বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন করছি। এরকম ভৌতিক ব্যাপার যে হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। পুষ্করভূত সত্যিই ভয়ঙ্কর।"

এর কিছুক্ষণ পরেই সবাই এসে পড়লে দলবদ্ধ হয়ে শবদাহ করল ওরা। গঙ্গায় স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ভোরবেলা বাড়ি ফিরে গেল। তবে সেই থেকে বিশু আর কখনও মড়া পোড়াতে যায়নি।



শিমুলতলার মাধবী লজ

সে-বছর ঘন ঘন নিম্নচাপের ফলে বর্ষাকালটায় মানুষ প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। একে তো বর্ষার বৃষ্টি হচ্ছেই, তার ওপর যেদিনই একটু ধরনের মতো হয় সেদিনই রেডিয়ো আর খবরের কাগজ ঘোষণা করে ভয়ঙ্কর এক নিম্নচাপের কথা।

যাই হোক, সারাটা বর্ষা এইভাবে কাটাবার পর শরৎ আসার সঙ্গে-সঙ্গেই ভাবলাম, এবার বুঝি দুর্যোগ কাটল। এক সুন্দর সকালে হঠাৎ দেখি আঙিনায় শিউলি ছড়িয়ে আছে। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে পুজো-পুজো গন্ধ। আনন্দে নেচে উঠল মনটা। ভাবলাম আর ঘরে বসে থাকা নয়, দু-চারদিনের জন্য বরং চট করে কোথাও থেকে ঘুরে আসা যাক। কিন্তু যাব কোথায়? চা খেতে-খেতে 'টাইম টেবল'-এর পাতা ওলটাতে লাগলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল নতুন একটা সাপ্তাহিক 'নর্থ বিহার এক্সপ্রেস' চালু হয়েছে। ট্রেনটি প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় ছাড়ে। শিমুলতলা পৌঁছয় সকাল ছ'টায়। ভাবলাম, অনেক জায়গায় তো গেছি, কিন্তু শিমুলতলায় কখনও যাইনি। অতএব শিমুলতলা থেকেই ঘুরে আসি না কেন?

এই মনে করে পাজামা আর পাঞ্জাবিটা পরে যখন বেরোতে যাচ্ছি ঠিক তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে সুজয় এসে হাজির হল। সুজয় আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। বলল, "কী ব্যাপার রে! এমন অসময়ে চললি কোথায়? ক'দিন পর একটু হাঁফ ছেড়ে ভাবলাম তোর বাড়ি এসে চুটিয়ে আড্ডা দেব, তা তুই-ই শেষকালে কেটে পড়ছিস?"

আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। বললাম, "ভাগ্য ভাল যে, বেরিয়ে পড়িনি। আমি এই বিরক্তিকর আবহাওয়ায় বড্ড বেশি বোর বোধ করছিলাম নিজেকে। তাই দু-চারদিনের জন্য এই একঘেয়েমির হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছিলাম। সেইজন্যই হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছিলাম আজ রাতের গাড়িতে একটা বার্থ রিজার্ভেশনের ধান্দায়।"

"যাবি কোথায়?"

"শিমুলতলায়। তুই যাবি?"

"এত তাড়াতাড়ি কী করে যাব? কোনও প্রস্তুতি নেই, কিছু নেই, একেবারে আজই?"

"আরে, এ তো কাশ্মির কিংবা সিমলা নয়, শিমুলতলা। এর আবার প্রস্তুতির কী আছে? তোর কিট ব্যাগে শুধু জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে নিবি। খরচখরচা আমার।"

সুজয় উৎসাহিত হয়ে বলল, "তা হলে আমি রাজি।"

মনের মতো একজন সঙ্গী পেয়ে আনন্দে ভরে উঠল মন। দু'জনে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে রাতের গাড়িতে রিজার্ভেশনও করিয়ে আনলাম। রাত এগারোটায় ট্রেন। সুজয়ের সঙ্গে কথা হল ও ন'টার মধ্যেই চলে আসবে আমার কাছে। তারপর আমরা একসঙ্গেই রওনা দেব।

যাই হোক, বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়ার পর সারাটি দুপুর ধরে গোছগাছ করতে লাগলাম। আসলে এই বর্ষায় অথবা বর্ষার পরে পাহাড়ি অঞ্চলগুলো আমার খুব ভাল লাগে। কেননা

বৃষ্টিস্নাত গাছপালা থেকে একটা মিষ্টি সোঁদা গন্ধ বেরোয়। ভিজে মাটি থেকে চমৎকার একটা মেঠো সুবাস পাওয়া যায়। তাই নতুন দেশে যাওয়ার উল্লাসে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর নিয়ে পরিপাটি করে সুটকেসটি গুছিয়ে ফেললাম।

কিন্তু এত আনন্দ, এত গোছগাছের মধ্যেও হঠাৎ একসময় দেখি আকাশ কালো করে কী ভয়ানক মেঘ উঠেছে। আবার কি নিম্নচাপ? কে জানে? খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। একদিকে ভাদ্রের চড়া রোদ, অন্যদিকে আকাশের ঈশানে মহাপ্রলয়ের সূচনা। দেখতে-দেখতে সেই মেঘ আকাশময় ছড়িয়ে পড়ল। তারপর খুব ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে। তারও পরে শুরু হল প্রবল বর্ষণ। কিছু সময়ের মধ্যেই রাস্তায় হাঁটুজল দাঁড়িয়ে গেল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ডুবে গেল সব। সন্ধের মুখে বেগ একটু কমলেও বৃষ্টিপাত সমানে চলতে লাগল। আমার বাড়ি থেকে সুজয়ের বাড়ি অন্তত আধ ঘণ্টার পথ। এই দুর্যোগে সে কিছুতেই আসতে পারবে না। আমিই বা যাব কী করে? তাই যাওয়ার আশা ত্যাগ করে ঘরে বসে গল্পের বই পড়তে লাগলাম।

এদিকে রাত ন'টা বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজার কড়া নড়ে উঠল। উঠে গিয়ে দরজা খুলেই দেখি সুজয়। কালো একটা বর্ষাতি পরে কিট ব্যাগ কাঁধে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, "এই দুর্যোগে কী করে এলি তুই?"

"না এলে তুই কী ভাবতিস বল?"

"কী আর ভাবতাম? এত দুর্যোগে মানুষ বেরোতে পারে? যাক, এসে ভালই করেছিস। রাস্তায় এখন জল কীরকম?"

"কোনওরকমে যাওয়া যাবে।"

"তা হলে আর দেবি নয়, বেরিয়ে পড়ি চল।"

আমি তৈরিই ছিলাম। সুটকেসটা হাতে নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে বাইরে এসেই একটা টানা রিকশা ধরে সোজা হাওড়া স্টেশনে। আমাদের ট্রেন তখন প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে।

প্রতিদিনের দেখা সেই হাওড়া স্টেশনের আজ একেবারেই অন্যরকম চেহারা। খাঁ-খাঁ করছে স্টেশন চত্বর। মাঝেমধ্যে একটি-দুটি যাত্রিবিহীন লোকাল ট্রেন আসছে। দূরপাল্লার গাড়িগুলো সবই প্রায় ফাঁকা। বহু লোক এই দুর্যোগে আসতেই পারেনি। আমরা যাওয়ার পরই দেখলাম একজন রেলকর্মচারী রিজার্ভেশন চার্ট হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিল। কিন্তু চার্টের দিকে তাকিয়েই চক্ষুস্থির। এ তো বৃষ্টির জন্য নয়। দেখলাম এতবড় গাড়িটার একটি বগিতে মাত্র আমাদের দু'জনের নাম আছে। আর একটিতে আছে পাঁচজনের। বাদবাকি সবই সাদা। ইংরেজিতে 'নিল' লেখা আছে।

সুজয় বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "ট্রেনটা আসলে নতুন তো। সবে চালু হয়েছে। অনেকেই জানে না। তাই এই অবস্থা। তা ছাড়া ভিড় হয় না বলে এই গাড়িতে সচরাচর কেউ রিজার্ভেশনও করায় না। বিনা রিজার্ভেশনেই এই গাড়িতে সারারাত শুয়ে যাওয়া যায়।"

কী আর করি? আমরা দু'জনে ভয়ে-ভয়েই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বগিতে ঢুকে বসলাম। সত্যি বলতে কী, এতবড় বগিতে আমরা দু'জন. এ যেন ভাবাই যায় না! সুজয় না এলে আমি তো আসতামই না। এলেও যাত্রা বাতিল কবতাম।

বৃষ্টির বেগ হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। ট্রেন ছাড়বার সিগন্যালও হয়েছে। এমন সময় দু'জন আর. পি এফ. এসে বললেন, "এই বগিতে কি আপনারা দু'জন?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এক কাজ করুন, পাশের বগিতে পাঁচজন আছেন। আপনারা সেখানে চলে যান। সাধারণ যাত্রীদেরও আমরা ওই বগিতে ঢুকিয়ে নিয়েছি। সেখানে পুলিশ গার্ড থাকবে। প্রত্যেক বগি থেকেই আমরা লোকজন সরিয়ে আনছি।"

আমি সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কী করবি রে?"

"যা করবার তাড়াতাড়ি করুন। সিগন্যাল হয়ে গেছে। ট্রেন এখনই ছাড়বে।" বলেই ওঁরা নেমে গেলেন।

এই নিষেধাজ্ঞার পর আর থাকা উচিত নয় ভেবে আমরা পাশের বগিতে যাওয়ার জন্য তৎপর হলাম। সুজয় অবশ্য যাওয়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখাল না। কিন্তু আমরা গেটের কাছে যেতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমি তবুও নামতে যাচ্ছিলাম। সুজয় আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরল, "করছিস কী! এখন কখনও রিস্ক নেয়? সেরকম বুঝলে বর্ধমানে নেমে বগি বদল করে নেব।"

সেই ভাল। আমরা দরজায় লক এঁটে ভেতরে এলাম। রাত এগারোটার ট্রেন। সামনে কোনও বাধা নেই। লাইন ক্লিয়ার। তাই ছেড়েই গতি নিল ট্রেন। বৃষ্টিও গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে ঝরে চলেছে। জানলার কাচ নামানো সত্ত্বেও বাইরের ঝাপটা ভেতরে ঢুকছে।

সুজয় বলল, "একটা কাজ করলে হয় না?"

"কী কাজ বল?"

"তা হলে আর কোথাও নামা-ওঠার দরকার হবে না। এই বগিটার চারদিকের দরজা ভেতর থেকে লক করে এর মধ্যে যে লেডিজ কুপে'টা আছে আমরা দু'জনে সেইখানে শুয়ে থাকলে কেমন হয়? তা হলে আর এতবড় বগিটার শূন্যতা চোখ মেলে দেখতে হবে না। কোনওরকমে দু' চোখ এক করে ঘুমিয়ে পড়তে পারলে এক ঘুমে সকাল হয়ে যাবে।"

"চমৎকার আইডিয়া।" বলেই চারদিকের গেটে ছিটকিনি এঁটে কুপের ভেতরেও লক করে দিলাম। এইবার সারারাতের মধ্যে গেট খুলে কাউকেই আর ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছি না।

রাত অনেক হয়েছে। সঙ্গের খাবার খেয়ে শেষবারের মতো একবার টয়লেটে গেলাম মুখ-হাত ধুয়ে একটু হালকা হয়ে আসতে। কিন্তু টয়লেটের ভেতরে ঢোকামাত্রই কেমন 'ম-ম' করা একটা মিষ্টি গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। সেইসঙ্গে হঠাৎ এক নিদারুণ ভয়ে গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল। সে কী দারুণ ভয়। ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবুও ভয়। তাই চট করে বেরিয়ে এলাম।

আমার হয়ে গেলে সুজয় ঢুকল। সেও বেরিয়ে এসে বলল, "ভারী চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ, তাই না?"

আমি অতিকষ্টে বললাম, "হ্যাঁ।"

"তুই খুব ভয় পেয়েছিস মনে হচ্ছে?"

"কই, না তো!"

"তোর মুখ দেখেই মনে হচ্ছে।" তারপর একটু হেসে বলল, "আসলে আমার মনে হয় কোনও ব্যাপারী এই বগিতে করে নিশ্চয়ই গোলাপের ঝাঁকা নিয়ে যাচ্ছিল।"

"তা হবে।"

"ঠিক আছে। তোর যদি ভয় করে, আর এদিকে না এলেই হল। এখন আমরা চুপচাপ শুয়ে পড়ি চল। এতবড় বগিতে আমরা মাত্র দু'জন। ভয় হওয়াই স্বাভাবিক।"

আমরা আর দেরি না করে কুপের মধ্যে দু'জনে দুটো মিডল বার্থ নিলাম। তার কারণ লোয়ার বার্থে বাইরের জলের ঝাপটা কাচের জানলার বাধা টপকে ভেতরে গড়াচ্ছে। আপার বার্থে ছাদের জল কাঠের ফাঁক দিয়ে চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ছে। মাঝের বার্থে সে ঝামেলা নেই।

শোওয়ামাত্রই ঘুম। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম আমরা।

রাত তখন কত কে জানে! বাইরে প্রবল বর্ষণ। ট্রেন দুর্গাপুরে থেমেছে। বেশিক্ষণ নয়। মিনিট-পাঁচেক থামার পরই ছেড়ে দিল ট্রেন। এমন সময় মনে হল, কে যেন ছুটে এসে ট্রেনের হাতল ধরে ঝুলে পড়েছে। তারপরই দমাদ্দম ধাক্কা দরজায়।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। সুজয় হাত চেপে ধরল আমার। বলল, "একদম খুলবি না। যেই হোক, মরুক ব্যাটা।"

আবার শব্দ। এবার মেয়েলি গলায় করুণ কণ্ঠে অনুরোধ, "ভেতরে কে আছেন? দয়া করে দরজাটা খুলুন। না হলে আমি আমি পড়ে যাব।"

আমি বললাম, "সুজয়, প্লিজ।"

"না। মরুক ও। এইভাবে ওঠে কেন?"

এবার রীতিমতো রেগে গেলাম আমি। বললাম, "এমন অমানুষের মতো ব্যবহার করিস না। একটি অসহায় মেয়ে এই দুর্যোগে চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরে ঝুলবে আর আমরা স্বার্থপরের মতো শুয়ে-শুয়ে ঘুমোব—এ হয় না।"

"কার মনে কী আছে জানিস তুই?"

"এটা জানাজানির ব্যাপার নয়, এখনই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।"

ওদিক থেকে তখন কাতর প্রার্থনা আবার শুরু হয়েছে, "প্লিজ, একবার দরজাটা খুলুন। দোহাই আপনাদের। আমি আর ঝুলতে পারছি না। আমার এক হাতে ভারী সুটকেস। আমি এখনই হাত ফসকে পড়ে যাব। আপনারা কি চান আমি মরি?"

এই কথার পর আর আমি থাকতে পারলাম না। সুজয়ের আপত্তি না শুনে নিজেই গিয়ে দরজার লক খুলে ঢুকিয়ে নিলাম মেয়েটিকে।

অষ্টাদশী তরুণী। অপূর্ব মুখশ্রীর তুলনা মেলা ভার। গায়ের রং চাঁপার মতো ফরসা। বৃষ্টিতে ভিজে সপসপ করছে বেচারি। ভেতরে ঢুকে সুটকেসটি নামিয়ে রেখে বলল, "সত্যি, কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে!"

আমি বললাম, "এইভাবে চলন্ত গাড়িতে কেউ ওঠে?" বলেই দরজাটায় আবার ছিটকিনি এঁটে দিলাম।

মেয়েটির দু' চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল, "এ কী! আবার লক করছেন দরজায়? খুলুন, খুলে দিন বলছি। এইভাবে দরজা বন্ধ করে ভেতরে শুয়ে থাকলে রাতদুপুরে লোকজন ওঠানামা করবে কী করে?"

আমি বললাম, "এই দুর্যোগের রাতে লোকজন কোথায়? তা ছাড়া এই বগিতেও আমরা মাত্র দু'জন। আপনাকে নিয়ে তিন।"

"সে আপনারা দু'জনই থাকুন আর একজনই থাকুন, দরজায় লক করা কখনওই উচিত নয়। দেখুন তো, কত কষ্ট পেলাম আপনাদের জন্য।"

সুজয়ও তখন কুপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বলল, "খুব তো জ্ঞান দিচ্ছেন, লাইনের অবস্থা জানেন? এই উদারতার সুযোগে কোনও বদলোক

গাড়িতে উঠে যদি রিভলভার দেখায়, তখন কী হবে?”

বৃষ্টিভেজা মেয়েটি তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। সুজয়ের কথায় একটু নরম হয়ে বলল, “কিছু মনে করবেন না, আমি অবশ্য বিপদের ওইদিকটা চিন্তা করিনি।”

সুজয় বলল, “কাউকে কিছু বলার আগে অনেক কিছুই চিন্তা করবেন। আসুন, ভেতরে আসুন।”

মেয়েটির আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ঘুমের দফাও শেষ হয়ে গেল। সে কুপের মধ্যে ঢুকেই তার সুটকেসটি আপার বার্থে রেখে নিজে লোয়ার বার্থে কষ্ট করে বসে রইল।

আমি বললাম, “আপনি এক কাজ করুন, আমরা বাইরে যাচ্ছি। আপনি ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে ফেলুন। না হলে এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকলে আপনার শরীর খারাপ করবে।”

মেয়েটি বলল, “কিছু হবে না আমার।”

এমন সময় হঠাৎ গাড়ির আলো নিভে গেল।

আমি বললাম, “আমার কথা শুনুন। শাড়িটা বদলে নিন। না হলে নিজেই কষ্ট পাবেন।”

“বেশ, যখন আপনি এত করে বলছেন তখন তাই হোক।” বলেই সুটকেস নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল মেয়েটি।

আবার আলো জ্বলে উঠল। মেয়েটি কুপের বাইরে গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে হাসিমুখে আবার এল ভেতরে।

আমি ওর বসবার সুবিধের জন্য মিডল বার্থটা নামিয়ে দিলাম। সুজয় তখন ওপাশের বার্থে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি মেয়েটিকে বললাম, “আপনি চাইলে আমরা কিন্তু কুপের বাইরে যেতে পারি।”

“কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া আমাকে কাছাকাছিই নেমে যেতে হবে। যদি ঘুমিয়ে পড়ি তো মুশকিল হয়ে যাবে।”

“এইটুকু পথ যাওয়ার জন্য আপনি রাতের গাড়ি ধরলেন কেন? তায় এইভাবে একা!”

মেয়েটি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, “আমার কথা থাক। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন বলুন?”

“আমরা শিমুলতলা যাচ্ছি।”

“কেউ আছে বুঝি সেখানে?”

“উঁহুঁ। কেউ নেই, এমনই বেড়াতে যাচ্ছি।”

“কোথায় উঠবেন ঠিক করেছেন?”

“আমাদের এক বন্ধু বলে দিয়েছেন রানিকুঠিতে উঠতে।”

“ওখানে যদি জায়গা না পান?”

“তা হলে অন্য কোথাও উঠব।”

“আপনারা মাধবী লজে উঠবেন।”

“আপনি কখনও উঠেছিলেন ওই লজে?”

“না, না। ওখানে মানে শিমুলতলায় আমার মেজো মাসি থাকেন। আমি প্রায়ই যাই। খুব ভাল জায়গা। আমার তো গেলে আসতে ইচ্ছে করে না।”

“তা হলে চলুন না আমাদের সঙ্গে? আপনি থাকলে খুব ভাল হবে। আপনার সাহায্য নিয়ে চারদিক বেশ ভালভাবে ঘুরে দেখে নিতে পারব। আপনিও এই সুযোগে আর-একবার

আপনার মাসির বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারবেন।”

মেয়েটি বলল, “যেতে খুবই ইচ্ছে করছে। তবে এখন আমার যাওয়ার কোনও উপায় নেই।” বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে একটা দামি জিনিস দেব, সেটা দয়া করে আমার মাসির বাড়িতে পৌঁছে দেবেন?”

“নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু আমরা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আপনি বিশ্বাস করে দামি জিনিসটা আমাদের হাতে দেবেন? ধরুন, যদি আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করি?”

মেয়েটি হাসল। বলল, “তা আপনারা করবেন না। আমি মানুষ চিনি।”

“বেশ, দেবেন। কিন্তু সেই দামি জিনিসটা কী?”

“যখন দেব তখনই দেখতে পাবেন। আমার যাওয়ার উপায় থাকলে আমিই গিয়ে দিয়ে আসতাম।”

“উপায় নেই কেন?”

“কী হবে জেনে? আপনি বড় সেন্টিমেন্টাল। শুনে আপনি সহ্য করতে পারবেন না। আপনার ওই বন্ধুটি তো দরজাই খুলতে দিচ্ছিলেন না আপনাকে। আপনি জোর করে খুলে দিলেন, তাই। সত্যি, সবাই যদি আপনার মতো হত!”

“আমার বন্ধুটি দরজা খুলতে দিচ্ছিলেন না সে-কথা আপনি কী করে জানলেন?”

মেয়েটি হেসে বলল, “আমি সব জানতে পারি।”

“তা জানুন। কিন্তু আমিও আপনার সব কথা জানতে চাই।”

মেয়েটি ম্লান মুখে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “শুনবেন?” বলেই উঠে দাঁড়াল।

“কোথায় যাচ্ছেন?”

“একবার টয়লেট থেকে আসি, এসে বলছি।”

মেয়েটি দরজার লক খুলে টয়লেটের দিকে গেল। ও বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কুপের ভেতরটা সেই ঝাঁঝালো গোলাপি গন্ধে ভরে উঠল। সেইসঙ্গে হু হু করে বাতাস ঢুকতে লাগল কামরার মধ্যে। অমনই শোনা গেল গেটের পাল্লার দড়াম-দড়াম শব্দ। সর্বনাশ, মেয়েটি লকগুলো খুলে দিয়েছে নাকি?

সুজয় তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। আমি ওকে ডেকে তুললাম। বললাম, “তোর কথা না শুনে খুব ভুল করেছি রে ভাই! মেয়েটি নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টচক্রের সঙ্গে জড়িত। টয়লেটে যাওয়ার নাম করে দরজার লকগুলো খুলে দিয়েছে। পরের স্টেশনে নির্ঘাত ডাকাত পড়বে।”

সুজয় লাফিয়ে নামল বার্থ থেকে, “বলিস কী রে!”

“হ্যাঁ। ওই দ্যাখ দরজাটা খোলা।”

সুজয় রেগে বলল, “দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। আমার সঙ্গে চালাকি? আমি জানতুম বলেই বারণ করেছিলাম। কই, চল তো দেখি কোথায় গেল?”

“টয়লেটে গেছে। কিন্তু আমাদের এই কুপের ভেতরটা কেমন ফুলের গন্ধে ভরে উঠেছে দেখেছিস?”

“ভরে ওঠাচ্ছি।” বলে এগিয়ে গেল টয়লেটের দিকে।

আমিও গেলাম ওর সঙ্গে। প্রথমেই গেটের পাল্লা দুটো লক করে দিলাম। কিন্তু দিলে কী হবে? সঙ্গে-সঙ্গে সশব্দে আপনা থেকেই খুলে গেল পাল্লা দুটো। একটা ঠান্ডা স্রোত শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেল যেন।

সুজয়ের কিন্তু এসবে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সোজা এগিয়ে গিয়ে টয়লেটের দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। মুখোমুখি দুটি দরজারই একই অবস্থা। কিন্তু মেয়েটি গেল কোথায়? তাকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন?

ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম আমি। সুজয়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আসানসোলে গাড়ি থামলে বগি বদল করলাম। মেয়েটির সুটকেস তেমনই পড়ে রইল কুপের ভেতর। ওতে আমরা হাতও দিলাম না।

সে রাতটা প্রায় জেগেই কাটালাম। পরদিন খুব ভোরে ট্রেন এসে শিমুলতলায় থামলে নেমে পড়লাম আমরা।

শিমুলতলার আকাশে কোনও মেঘ নেই। শিমুলতলার প্রকৃতি ভোরের আলোয় অপরূপ। আমরা স্টেশনে নেমে দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে রানিকুঠির দিকে চললাম। স্টেশনের বাঁ দিক দিয়ে যে পথটি লীলাবরণ ঝরনার দিকে চলে গেছে সেই পথ ধরেই গেলাম আমরা। থানার পাশ দিয়ে অনেকটা হেঁটে যাওয়ার পর দূরের ঝাঁঝার পাহাড়গুলো স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তারপর লাল মাটির আঁকাবাঁকা পথে দু-একটি দিঘি-সরোবর পার হতেই চোখে পড়ল মাধবী লজ। আমরা মাধবী লজ ছেড়ে রানিকুঠিতে এলাম। কিন্তু বিধি বাম। এখন সিজন-টাইম নয় বলে রানিকুঠির অধিকাংশ ঘরই মালগুদামে পরিণত হয়েছে। তাই বাধ্য হয়েই মাধবী লজে উঠতে হল।

মাধবী লজের দরোয়ান কেয়ারটেকার যাই বলো না কেন, সবই ওই গফুর। বেশ লম্বা-চওড়া লোকটি। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কাছাকাছি। ব্যবহার ভদ্র। আমরা যেতেই খুব আগ্রহের সঙ্গে একটি ঘর খুলে দিল আমাদের। খুব যে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর তা নয়। তবে বেশ বড়সড়। বাথরুম লাগোয়া। কল আছে কিন্তু জল নেই। বাইরে একটা ইঁদারা আছে। সেখান থেকে জল এনে ভরতে হবে। এই ঘরের লাগোয়া আর-একটি ঘর আছে। সেটি আকারে ছোট। তবে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

আমরা বললাম, "এই ঘরটাই আমাদের দাও না গফুর। দু'জন তো আমরা। ছোট ঘরই আমাদের পক্ষে ভাল।"

গফুর বলল, "না বাবু, ও ঘর ভাড়া হয়ে গেছে। একজনের আসবার কথা, না হলে ওটাই আপনাদের দিতাম।"

দুটি ঘরের মাঝখানে দরজা। দরজার শিকলটা আমাদের দিকে। গফুর দরজায় শিকল তুলে দিল। বলল, "এই দরজা একদম খুলবেন না বাবু। ও ঘরেও যাওয়ার চেষ্টা করবেন না।"

"ওরা তা হলে যাতায়াত করবে কোথা দিয়ে?"

"ওদিকে আর-একটা দরজা আছে। সে দরজায় তালা দেওয়া। চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না তাই। না হলে ও ঘরে গিয়ে এই দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিতাম।"

আমি বললাম, "গফুর, ওই ঘরটাই আমাদের চাই। ওরা এলে তুমি বরং ওদেরকেই এই ঘরে পাঠিয়ে দিয়ো।"

"অ্যায়সা কভি নেহি হো সকতা। ওঁরা আমাদের পুরানা আদমি। হরবখত আসেন। তাই ওই ঘরটাই পছন্দ করেন। অ্যাডভান্স রুপিয়া ভি পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই ডবল ভাড়া দিলেও ও ঘর আপনাদের আমি দেব না।"

"বেশ, তোমার অসুবিধে থাকে দিয়ো না। আমরা বরং অন্য কোথাও চলে যাই।"

"যো আপকো মর্জি। তবে এই ঘর ছাড়লে কিন্তু ভুল করবেন।"

"কেন, এখানে কি আর কোথাও ঘর খালি নেই?"

"নেহি। এই সময় এখানে কোনও লোক আসে না।"

"কিন্তু তোমার এখানে বাথরুমে তো জলাভাব।"

"সেজন্য আমি আছি। আমি ইঁদারা থেকে পানি তুলে এনে দেব আপনাদের। যাওয়ার সময় দু-পাঁচ টাকা বকশিশ দিয়ে দিবেন।"

আমরা আর কী করি, মাধবী লজেই রয়ে গেলাম।

ঘরে জিনিসপত্র রেখে দরজায় তালা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম শিমুলতলার পথে পথে। চারদিকে ভিজে লাল মাটি আর সবুজের সমারোহ। এখনও এত গাছপালার ঘনত্ব খুব কম জায়গাতেই দেখা যায়। পায়ে-পায়ে আমরা লাট্টু পাহাড়ের দিকে এগোলাম। জায়গাটা বেশ নির্জন এবং এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ চমৎকার। আমরা অনেকক্ষণ ধরে লাট্টু পাহাড়ে বেড়িয়ে আবার যখন ঘরে ফিরলাম তখন চড়া রোদ্দুরে চারদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। আমরা এসে ইঁদারার জলে স্নান করে মোড়ের মাথায় গিয়ে একটা দোকানে দুটো ডাল-ভাত খেয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

এ-ঘরে পাশাপাশি দুটো খাট পাতা। একটাতে আমি, অন্যটিতে সুজয়। শুয়ে-শুয়ে আমরা গতরাতের সেই রহস্যময়ীর ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলাম।

সুজয় অবশ্য একটু গম্ভীর। কাল রাত থেকেই ও যেন কীরকম হয়ে গেছে।

আমি বললাম, "মেয়েটার ব্যাপারে আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিই বল তো? ওইভাবে দুমদাম দরজা খুলে যাওয়া, টয়লেট থেকে অদৃশ্য হওয়া, আর ওই গোলাপ ফুলের গন্ধ, এর থেকে আমরা কী ধারণা করতে পারি?"

সুজয় গম্ভীর স্বরেই বলল, "যা করবার। অর্থাৎ কিনা আমরা ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম। ভূত ছাড়া কিছুই নয়, ওটা একটা প্রেতিনী।"

"ভাগ্যে বুদ্ধি করে কামরাটা বদল করেছিলাম, না হলে কী যে হত। তবে মেয়েটি খুবই ভাল, ভূত-প্রেতিনি যেই হোক না কেন, আমাদের সঙ্গে কিন্তু কোনওরকম দুর্ব্যবহার করেনি।"

"করেনি বললেই হল? ওইভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, দুমদাম করে দরজা খুলে দেওয়া, এগুলো বুঝি ভদ্র ব্যবহারের নমুনা?"

"তা হয়তো নয়, তবে আমার মনে হয়, ওইসবের মধ্য দিয়ে ও নিশ্চয়ই ওর অস্তিত্বের অলৌকিকত্বটা বোঝাতে চেয়েছিল। ওর মনে কোনও বদ মতলব থাকলে ও নিশ্চয়ই অন্য কোনওভাবে ভয় দেখাত আমাদের।"

এইভাবে কথা বলতে-বলতে দুপুর গড়িয়ে দিলাম আমরা। বিকেলে আবার বেড়াতে বেরিয়ে দূরের ঝাঁঝার পাহাড়গুলো দেখতে-দেখতে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও আমরা সেই নির্জন প্রকৃতির লীলাভূমিতে বিচরণ করে আবার যখন মাধবী লজে ফিরে এলাম, তখন দেখি, আমাদের পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। খুটখাট শব্দও শোনা যাচ্ছে। তার মানে যাদের আসবার কথা ছিল, তারা এসে গেছে।

আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একবার ভাবলাম, আমাদের এদিকে দরজায় শিকল তো দেওয়া আছে, ঝনঝন করে নাড়া দিয়ে ওদের ডাকি এবং দু' ঘরের দরজা খোলা রেখে

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করি। আবার ভাবলাম, কী দরকার! যদি ওঁরা অন্য কিছু মনে করেন। তাই মনে-মনে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিজেদের মধ্যেই নানা বিষয়ের আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

সুজয় বলল, "এই সময় গফুরটাকে পাওয়া গেলে খুব ভাল হত।"

"ও থাকলে কী করত?"

"ওকেই বলতাম ওদের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে।"

"ঠিক বলেছিস। ডাকব গফুরকে?"

"ডাক।"

আমি বাগানে এসে অনেক হাঁকডাক করলাম। কিন্তু কোথায় গফুর? তার কোনও সাড়াশব্দও পেলাম না। এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। কী নিদারুণ অন্ধকার চারদিকে। পাশের ঘর থেকে স্ত্রীলোকের গলার খিলখিল হাসির শব্দ শোনা গেল।

সুজয় বলল, "এই সুযোগ। এইবার বরং শিকল নেড়ে ওদের ডাকা যেতে পারে।"

"সেটা কিন্তু আরও খারাপ হবে।"

"খারাপ হবে কেন? আমরা চালাকি করে একটা দেশলাই চাইব। অন্ধকারে যে কেউ যাকে ইচ্ছা দেশলাই চাইতে পারে। তা ছাড়া সত্যিই তো আমাদের কোনও বদ মতলব নেই। শুধু এই প্রেতপুরীর মতো ভয়ানক নির্জনতায় একটু মানুষের সান্নিধ্য চাই।" এই বলে সুজয় এগিয়ে গিয়ে দরজার শিকল খুলে একবার ঝনঝন শব্দ করল। মুখে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন তো দরজাটা খুলবেন একবার?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। সেইসঙ্গে গতরাতে ট্রেনের মধ্যে যে মিষ্টি গোলাপের গন্ধটা পেয়েছিলাম, সেই গন্ধে ভরে উঠল ঘর। আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেছে তখন। হবে নাই-বা কেন? এই মিষ্টি গন্ধের সঙ্গেই তো সেই অশুভ আবির্ভাব হয়। তবে? তবে কি আবার আমরা সেই প্রেতিনীর পাল্লায় পড়লাম? কিন্তু না, এই অন্ধকার ঘরে কেউ কোথাও নেই।

সুজয় বলল, "এ-ঘরে কে আছেন? অনুগ্রহ করে একটা দেশলাই ধার দেবেন আমাদের?"

আমি ভয়ার্ত গলায় বললাম, "এ-ঘরে কেউ নেই সুজয়, চলে আয়।"

ও তবুও ঘরে ঢুকল। আর ঢোকামাত্রই সেই অন্ধকারে একটি হাত এগিয়ে এল, "এই নিন দেশলাই।"

বলা বাহুল্য, সে হাত একটি মেয়ের।

সুজয় তার থেকে দেশলাইটা নিতে যেতেই হো হো করে হেসে উঠল সে।

আমি সভয়ে পিছিয়ে এলাম।

এইবার একটু-একটু করে অন্ধকারে তার ছায়াশরীর স্পষ্ট হল। তাকে দেখেই চমকে উঠলাম। এ আর কেউ নয়, কাল রাতের সেই রহস্যময়ী।

আমি তখন এক লাফে বাইরে এসেই একেবারে রাস্তার মোড়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলাম, "গফুর, গফুর!"

আমার চিৎকার শুনে মোড়ের মাথা থেকে গফুর এবং আরও কয়েকজন ছুটে এল, "কী হল বাবুজি? মনে হচ্ছে খুব ভয় পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ। তোমরা সবাই এসো, গিয়ে দেখবে চলো কী অঘটন ঘটে গেছে।"

"কী হয়েছে?"

"গেলেই দেখতে পাবে। দেরি কোরো না, তা হলে আমার বন্ধুকে বাঁচাতে পারব না।"

এই কথায় সবাই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর গফুরের ডাকে অন্তত জনাদশেক লোক ছুটে এল হইহই করে।

গফুর বলল, "আমি বারবার মানা করেছিলাম পাশের ঘরের দরজা খুলতে। নিশ্চয়ই খুলেছিলেন আপনারা?"

আমি নতমস্তকে বললাম, "হ্যাঁ।"

"কেন খুলেছিলেন?"

ততক্ষণে আলো এসে গেছে। আমরা ঘরের ভেতরে গিয়ে যা দেখলাম, তা বড়ই মর্মান্তিক। ঘরের মধ্যে সুজয়ের দেহটা ঝুলছে। সে ছাড়া সেই ঘরে আর কারও অস্তিত্বই নেই। আমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল।

সেই রাতেই আমি মাধবী লজ ত্যাগ করে স্টেশনের কাছে এক বাঙালির বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ওদের মুখেই শুনলাম, কিছুদিন আগে মাধবী লজের ওই ঘরটিতে এক যুবক আত্মহত্যা করেন, তারপর থেকে ওই ঘরটি বন্ধই থাকে। কাউকে ভাড়া দেওয়া হয় না।

ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে সেই রাতেই আমি সুজয়ের বাবাকে টেলিগ্রাম করলাম। টেলিগ্রাম করতে গিয়ে এমনই এক সংবাদ পেলাম, যাতে আমার চিত্ত দারুণভাবে বিচলিত হল। সংবাদটি হল, মর্গে নিয়ে যাওয়ার সময় ভ্যান থেকেই নাকি সুজয়ের লাশটি উধাও হয়ে যায়। কাল ওর বাড়ির লোকেরা এলে কীভাবে যে কী কৈফিয়ত দেব তা ভেবে পেলাম না। বেশ তো একা আমি আসছিলাম। কেন যে জড়াতে গেলাম ওকে, তা ভেবেই মনখারাপ হয়ে গেল। তবুও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

ফিরে আসতেই আর-এক চমক। যে বাড়িতে উঠেছিলাম সেই বাড়ির ভদ্রলোক বললেন, "ভাগ্যের কী পরিহাস দেখুন, একদিকে দু' বন্ধুতে বেড়াতে এসে একজনকে হারিয়ে বসলেন। অন্যদিকে ট্রেনের কামরায় হারিয়ে যাওয়া জিনিস ঘরে বসেই ফেরত পেলেন।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "ট্রেনের কামরায় হারিয়ে যাওয়া জিনিস মানে? আমার তো কিছুই হারায়নি।"

"সে কী! না হারালে এটা তা হলে কার?"

আমার দু' চোখ কপালে উঠে গেছে তখন। এ যে ট্রেনের কামরায় ফেলে-আসা মেয়েটির সুটকেস। বললাম, "এ আপনি কোথায় পেলেন?"

"একটু আগে একটি মেয়ে এসে দিয়ে গেছে আপনাকে।"

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল আমার। বুকের ভেতরও টিপটিপ করতে লাগল। এবার কি আমি ওর গ্রাস? বললাম, "কিছু কি বলে গেছে?"

"বলেছে, আপনারা নাকি একই ট্রেনে আসছিলেন। ভুল করে সে আপনার সুটকেসটি নিয়ে যায়। তাই এটি ফেরত দিয়ে গেছে। আর বলে গেছে, অম্বিকা কুণ্ডুর বাড়িতে আপনাকে একবার দেখা করতে।"

কে অম্বিকা কুণ্ডু, তা জানি না। কোথায় থাকেন, জানি না তাও। তবে আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা না করে সুটকেসটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে।

ভদ্রলোক বললেন, "করেন কী, করেন কী মশাই? এই রাতদুপুরে কোথায় চললেন? একে এইরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল, তার ওপর অচেনা জায়গায় কার খপ্পরে পড়বেন তার ঠিক কী?"

কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন আর আমি কি আছি? কী এক অদৃশ্য শক্তি ভর করে আমাকে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে চলল। কোথা দিয়ে কীভাবে যে গেলাম তা এখনও আমি মনে করতে পারি না। তবে একটা প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে এসে দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে সাড়া এল, "কে?"

"এটা কি অম্বিকা কুণ্ডুর বাড়ি?"

"হ্যাঁ। একটু দাঁড়ান।"

আমি দাঁড়িয়েই আছি। এমন সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক সুবেশা তরুণী। তাঁকে দেখেই আমার হাত থেকে সুটকেসটা পড়ে গেল। আমি অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে জ্ঞান হারালাম।

পরদিন সকালে জ্ঞান যখন ফিরল, তখন দেখি অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে আমার চারপাশে। সবাই বলল, "কী ব্যাপার! কাল হঠাৎ কী হল আপনার? কাকে দেখে অমন ভয় পেলেন?"

আমি তখনও সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছি। কেননা মেয়েটি আমার পাশেই বসে ছিল। আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, "ও কে? ওকে চলে যেতে বলুন। ওকে দেখেই আমি ভয় পেয়েছিলাম।"

সরে যাওয়া দূরের কথা, ও আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল, "কেন, চলে যাব কেন? আমি কি ভূত না পেতনি? তা ছাড়া আপনি আমাদের যা উপকার করেছেন তা ভোলবার নয়। ওই সুটকেসের ভেতরে দশ ভরির মতো সোনার গয়না আর পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল। ও জিনিস হাতে পেয়ে কেউ ছেড়ে দেয় না। আপনি মহানুভব তাই ফেরত দিতে এসেছেন।"

আমি বললাম, "দেখুন, আমার যেন কীরকম সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আপনি কে?"

"আমি চন্দনা। কিন্তু ওই সুটকেস আপনার হাতে এল কী করে?"

"কেন, আপনিই তো দিয়েছেন।"

"আমি দিয়েছি? একটু মনে করে দেখুন তো কীভাবে কী হল। মনে হচ্ছে অলৌকিক ব্যাপার কিছু ঘটে গেছে।"

আমি এবার সাহস পেয়ে উঠে বসলাম। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বললাম ওঁদের। সব শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ওঁরা। তারপর ওঁদের মুখে যা শুনলাম তা আরও মর্মান্তিক.

চন্দনারা দু' বোন। বন্দনা ও চন্দনা। যমজ বোন ওরা। বাবা-মায়ের সঙ্গে দুর্গাপুরে থাকে। এটা ওদের মাসির বাড়ি। একবার বন্দনা পরিচিত একটি ছেলেকে বিয়ে করতে চাইলে বাড়িতে প্রচণ্ড আপত্তি ওঠে। বন্দনা তাই এক রাতে ওরই বিয়ের জন্য রাখা গয়না ও টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। হয়তো সে মাসির বাড়িতেই আসত। কিন্তু দুর্দৈবে তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। সেও ছিল এক দুর্যোগের রাত। স্টেশনের কিছু লোক ওকে মধ্যরাতে সাপ্তাহিক

নর্থ-বিহার এক্সপ্রেসের চলন্ত গাড়িতে উঠতে দ্যাখে। কম্পার্টমেন্টের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় সম্ভবত ভেতরে ঢুকতে পারে না বেচারি। পরে কিছুদূর যাওয়ার পর দেহের ভারসাম্য রাখতে না পেরে হাত ফসকে পড়ে যায়। পরদিন ওর ডেডবডি পাওয়া গেলেও এই সুটকেসের সন্ধান কেউ দিতে পারে না।

আমি বললাম, "আশ্চর্য, যদি ওর প্রেতাত্মাই আমাকে দেখা দিয়ে থাকে তা হলে বারবার ও ট্রেনের টয়লেটের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল কেন?"

"সেটা তো আমাদের পক্ষেও বলা শক্ত। তবে মাধবী লজের যে ঘরে কাল রাতে ওই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে, সেই ঘরে এক যুবক বন্দনার দুর্ঘটনার খবর কাগজে বেরনোর পরই আত্মহত্যা করে। হয়তো এমনও হতে পারে, ওই ছেলেটিই বন্দনার পরিচিত সেই ছেলে।"

যাই হোক, পরিচয়-পর্ব সেরে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় চমকের পর চমক। হঠাৎ দেখি মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সুজয় এসে হাজির। নেহাত দিনের বেলা তাই, না হলে হার্টফেল করতাম। তবুও আমার শরীরের সমস্ত রক্ত তখন মুখে এসে জমাট বেঁধেছে। কোনওরকমে বললাম, "সুজয় তু-তু-তুই!"

"হ্যাঁ আমি। কীসব উলটোপালটা টেলিগ্রাম করেছিস? তোকে কি ভূতে পেয়েছে না মাথাখারাপ হয়েছে তোর? আমি তোর সঙ্গে এলাম কখন যে, আত্মহত্যা করব?"

"এলাম কখন মানে? মাধবী লজে একবার চল তো, সবাই সাক্ষী দেবে তুই এসেছিলি কিনা?"

"কী আশ্চর্য! তুই বিশ্বাস কর, সে রাতে ওই প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য ঘর থেকে বেরোতেই পারিনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম তুইও বোধ হয় যাওয়া ক্যানসেল করেছিস। কিন্তু তুই যে কার সঙ্গে এসেছিস তা ভগবানই জানেন! কাল তোর টেলিগ্রাম পেয়েই মাথা ঘুরে গেছে আমার। ভাবলাম, আমি না যাওয়ায় রসিকতা করে টেলিগ্রাম করেছিস। কিন্তু এটা যখন বাবাকে, তখন কেন জানি না মনে হল কোথাও একটু গোলমাল হয়েছে। তাই মা-বাবা দু'জনকেই নিয়ে এসে হাজির করেছি।"

সুজয়ের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এবং আমার যে মাথাখারাপ হয়নি তার প্রমাণস্বরূপ মাধবী লজের গফুর থেকে স্থানীয় সকলেই অকপট বিবৃতি দিলেন। এমনকী মর্গে নিয়ে যাওয়ার পথে লাশ উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও গোপন রাখলেন না কেউ। ভৌতিক ঘটনার এমন রোমাঞ্চকর নাটকীয়তা আমাদের সকলকেই বিস্মিত করল।



শিবাইচণ্ডীর বিষ্টু মশাল

শিবাইচণ্ডীর বিষ্টু মশাল কখনও ভূতে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতো জেদি, সাহসী পুরুষ সেকালে খুব কমই ছিল। একদিন সন্ধেবেলা বিষ্টু মশাল ভিন গাঁ থেকে ফিরছেন, হঠাৎ মনে হল কে যেন তাঁর পেছন পেছন আসছে। বিষ্টু মশাল থমকে দাঁড়ালেন। পিছু ফিরে দেখলেন কেউ তো নেই। তাই একটু থেমে আবার চলা শুরু করলেন। চলা শুরু করামাত্রই আবার সেই পায়ের শব্দ। আগেই বলেছি, বিষ্টু মশাল ভূতে বিশ্বাস করেন না, তাই ব্যাপারটা তাঁর কাছে ভারী অদ্ভুত লাগল। এমন সময় হঠাৎ কাঁধের ওপর কার যেন একটা দীর্ঘশ্বাস অনুভব করলেন তিনি। বিষ্টু মশাল চমকে উঠলেন। পুরোপুরি ভয় না পেলেও বুকটা কেঁপে উঠল তাঁর। কেমন যেন ভয় ভয় করল। মন বলল, তবে কি সত্যিই ভূত আছে?

যাই হোক, বিষ্টু মশাল বাড়ি ফিরে গুম হয়ে রইলেন। মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লেন। বাড়িতে শুধু কর্তা আর গিন্নি। ছেলেপুলে নেই, তাই দু'জনেরই সংসার।

গিন্নি বললেন, "কী হল তোমার? হঠাৎ এত চুপচাপ যে?"

বিষ্টু মশাল সাড়া দিলেন না।

"যে কাজে গিয়েছিলে সে কাজ হয়নি বুঝি?"

"না, ঠিক তা নয়। তবে...।"

"তবে কী?"

বিষ্টু মশাল তখন সব কথাই খুলে বললেন গিন্নিকে।

গিন্নি সব শুনে ভয়ে চোখ দুটো কপালে উঠিয়ে বললেন, "বলো কী গো? তুমি তো তা হলে ভূতের পাল্লায় পড়েছিলে!"

বিষ্টু মশাল একটুও আতঙ্কিত না হয়ে বললেন, "থামো তো। যত্তসব। ভূত আবার কী? ভূত বলে কিছু আছে? মানুষ মরে গেলে দেহটা পুঁতে অথবা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপরে আর কিছুই থাকে না।"

"সে কী! মানুষ তো মরেই ভূত হয়।"

"তা যদি হত তা হলে পৃথিবীতে মানুষ বাস করতে পারত না। যত মানুষ এ যাবৎ মরেছে, সবাই ভূত হয়ে মানুষকে তাড়াত।"

"আহা, সব মানুষ ভূত হবে কেন? যারা অপঘাতে মরে, তারাই ভূত হয়।"

"তারও সংখ্যা কি কম? জলে ডুবে, গলায় দড়ি দিয়ে, আগুনে পুড়ে, পথ দুর্ঘটনায় কম লোক মরেছে?"

গিন্নি বললেন, "অতশত জানি না বাপু, আমার কিন্তু ওসবে বড় ভয়।"

এর পরে আর কথা নয়। রাতও হয়েছে অনেক। তাই কর্তা-গিন্নি দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে বিষ্টু মশাল গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক খেতে খেতে তাঁর

বন্ধুবান্ধবদের বললেন কথাটা। সবাই শুনে বললেন, "তা তেনারা সব আছেন বইকী! না হলে মনের মধ্যে ভয় ভাবটা আসবে কেন? দেবতা অপদেবতা সবই আছেন। তুমি বিশ্বাস করো না, সে-কথা আলাদা। এই যে এত লোককে ভূতে ধরছে, এ সবই কি মিথ্যে?"

বিষ্টু মশাল কোনও কথা না বলে সোজা চলে এলেন পঞ্চা পণ্ডিতের কাছে। তারপর পাঁজি-পুঁথি দেখে জেনে নিলেন অমাবস্যাটা কবে এবং মনে মনে ঠিক করলেন ওইদিন ভরা অমাবস্যায় 'ভিন গাঁয়ে যাচ্ছি' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভোজঙ্গার ডাঙালে বসে সারাটি রাত কাটাবেন। ভোজঙ্গার ডাঙাল হচ্ছে এই অঞ্চলের শ্মশান। একটি খালের ধারে ডাঙালে যেখানে শবদাহ করা হয় সেই জায়গাটা ভূতের উপদ্রবের জন্য এমনই কুখ্যাত যে, সন্ধের পর চোব ডাকাতরাও সেখানে যেতে ভয় পায়। বিষ্টু মশাল ঠিক করলেন, এই শ্মশানে বসেই তিনি ভূত দেখবেন। অবশ্য ভূত যদি সত্যিই থাকে। সেইসঙ্গে গত সন্ধ্যার সেই পায়ের শব্দ বা দীর্ঘশ্বাস পড়াটা যে মনের ভুল, সেটাও তিনি প্রমাণ করবেন।

মাঝে মাত্র কয়েকটি দিন।

তারপর মঙ্গলবারের ঘোর অমাবস্যায় নানারকম ভাবনাচিন্তা এবং পরিকল্পনা করে বিষ্টু মশাল ভরদুপুরে গিন্নির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোলেন ভিন গাঁয়ে তাঁর এক আত্মীয়র সঙ্গে দেখা করবেন বলে। আসবার সময় গিন্নিকে বলে এলেন রাত্রে বোধ হয় বাড়ি ফেরা হবে না, তাই যেন কোনওরকম চিন্তাভাবনা না করেন।

গিন্নি তো অতশত বুঝলেন না, তাই কর্তাকে নির্ভাবনায় বিদায় দিলেন।

বিষ্টু মশালও ধীর পদক্ষেপে পাশের গ্রামে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। তারপর সন্ধে পর্যন্ত বেশ চুটিয়ে গল্প করে যখন বিদায় নিতে চাইলেন তখন তো তাঁরা কিছুতেই ছাড়বেন না। সবাই বললেন, "না না। আজ আর যাওয়া নয়। এখানেই খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করুন, কাল সকালে যাওয়ার কথা চিন্তা করবেন। এই রাতদুপুরে দু' মাইল পথ একা যাওয়া কি মুখের কথা?"

বিষ্টু মশাল তো থাকবেন বলে আসেননি। তিনি এসেছেন সময় কাটাতে। তাই বললেন, "না গো না। আমার কি হুট করতেই কোথাও গিয়ে থাকা চলে? ঘরের মানুষটা ভাববে কী? বলা নেই কওয়া নেই মন গেল তাই চলে এসেছি। যেতে আমাকে হবেই।"

এই কথার পর কথা চলে না। সবাই বলল, "তা বেশ করেছেন। সাবধানে যাবেন তা হলে। এই রাত-বিরেতে কী করে আপনাকে ছাড়ি বলুন দেখি? পথে কোনও বিপদ হলে কাকে কী বলব?"

বিষ্টু মশাল বললেন, "কিচ্ছু হবে না গো, কিচ্ছু হবে না। আজ তা হলে আসি।" বলে পথে নামলেন বিষ্টু মশাল।

অমাবস্যার রাত, তায় গ্রামের অন্ধকার। একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার যাকে বলে! কোনও কিছুতেই দিশা চলে না। একহাত দূরে কী আছে, দেখা যায় না তাও।

সেই অন্ধকারে টর্চের আলোয় পথ দেখে বিষ্টু মশাল চললেন গ্রামের দিকে। কিছু পথ এসেই তিনি হাজির হলেন ভোজঙ্গার ডাঙালে। একবার একটু ভয় ভয় করল। তবে সে ভয়টা কিন্তু ভূতের নয়। সাপের। বিষ্টু মশাল সাপকে বড় ভয় করেন। তবুও তাঁর জেদ, ভূতের দেখা তাঁকে পেতেই হবে। সারারাত বসে থেকেও তিনি দেখবেন ভূত কী এবং

সত্যিই ভূত বলে কিছু আছে কিনা।

বিষ্টু মশাল শ্মশানযাত্রীদের বসবার জায়গায় এসে বসলেন। বসে একটা বিড়ি ধরালেন। চারদিকে বনবাদাড়। নিশাচর পশুপক্ষীদের ডানা ঝাপটানির শব্দ আর কর্কশ ডাক ছাড়া কিছুই নেই। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ একসময় শুনতে পেলেন 'হ্যাঃ' করে একটা দীর্ঘশ্বাস এবং করুণ একটা আক্ষেপোক্তি। তারপর আর কিছুই নেই। বিষ্টু মশাল তবুও বসে রইলেন। কেমন যেন ঘুম আসতে লাগল তাঁর। এমন সময় হঠাৎ মনে হল কেউ যেন কোদাল দিয়ে কুপিয়ে একটা শ' খুঁড়ছে। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না তিনি। হঠাৎ একটা মেটে কলসি শ'-এর পাশ দিয়ে গড়গড় করে গড়িয়ে পড়ল জলে।

বিষ্টু মশাল সেইদিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। তারপর বললেন, "কে বাবা তুমি, এসব করছ? পারলে একটা শরীর নিয়ে দেখা দাও। আমি যে অবিশ্বাসী মানুষ। লোককে গিয়ে যেন বলতে পারি স্বচক্ষে ভূত দেখেছি।"

বিষ্টু মশালের সে-কথার উত্তরও দিল না কেউ।

খানিক বাদে কাঠ কাটার মতো একটা ঠক ঠক শব্দ বিষ্টু মশালের কানে এল। বিষ্টু মশাল শব্দটা যেদিক থেকে আসছে সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় দেখলেন একজন লোক ভারী একটা কাঠের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে ধপাস করে একটা শ'-এর ওপরে ফেলল। তারপর একের পর এক কাঠ রেখে সাজাতে লাগল একটা চিতা।

বিষ্টু মশাল হেঁকে বললেন, "কে গো! কে তুমি?"

লোকটি নিরুত্তর। সে বিষ্টু মশালের দিকে একবার তাকিয়ে খালে নেমে সেই মেটে কলসিটাকে জলপূর্ণ করে তুলে নিয়ে এল।

বিষ্টু মশাল বললেন, "এই অন্ধকারে একা একা শ' খুঁড়ছ, কাঠ বইছ, চিতা সাজাচ্ছ, জল তুলছ, বলি কার জন্য হে?"

এইবার উত্তর দিল লোকটি। বলল, "সে যার হোক একজনের জন্য। কিন্তু আপনি এখানে এই রাতদুপুরে একা বসে কী করছেন? ভূতের ভয় নেই?"

"তোমার আছে? আমি তো ভূত দেখব বলেই বসে আছি।"

"আর ভূত দেখে না। যান, ঘরে যান। ঘরে গিয়ে ঘুমোন গে যান। রাত হয়েছে।"

বিষ্টু মশাল বললেন, "তা ভূত যখন দেখলুম না তখন ঘরে যাব নিশ্চয়ই। কিন্তু শ্মশানে তো মড়া নেই, কাঠ সাজাচ্ছ কার জন্য?"

লোকটি হেসে কিছু না বলেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বিষ্টু মশালের শিরদাঁড়া বেয়ে কেমন যেন হিমস্রোত নেমে এল একটা। এক প্রচণ্ড ভয় তাঁকে যেন পেয়ে বসল হঠাৎ। খুব শীত করতে লাগল। সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। সে কী কষ্ট!

বিষ্টু মশাল আর থাকতে পারলেন না। কোনওরকমে টলতে টলতে বাড়ি চলে এলেন।

এত রাতে বিষ্টু মশালকে ফিরে আসতে দেখে গিন্নি তো অবাক! বললেন, "কী ব্যাপার! তুমি ফিরে এলে যে? তোমার তো থাকবার কথা ছিল।"

"হ্যাঁ, হঠাৎ শরীরটা খুব খারাপ করল কিনা, তাই চলে এলাম। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে।"

গিন্নি গায়ে হাত দিয়েই বললেন, "জ্বর আসবে কীগো? জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে। একবার ডাকব নাকি হরি ডাক্তারকে?"

"কাল যা হয় কোরো। আজ রাতে তো নয়, এত ভয় পাচ্ছ কেন? কথায় আছে যেমন তেমন জ্বর, দু'দিন উপোস কর। দু'একদিন উপবাসে থাকলে জ্বর এমনিই ছেড়ে যাবে।"

কিন্তু না। জ্বর ছাড়া তো দূরের কথা, আরও বাড়তে লাগল। রাতটা কোনওরকমে কাটলেও সকালে জ্বর এত বেশি হল যে, জ্বরের সঙ্গে শুরু হল কাঁপুনি।

খবর পেয়ে হরি ডাক্তার এসে ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিলেন, কিন্তু জ্বর কমল না। দুপুরের পর থেকে শুরু হল ভুল বকা।

গিন্নি তো কান্নাকাটি করে লোকজন জড়ো করলেন। সবাই বলল, "ওঝা বদ্যি করো। এ জ্বর ডাক্তারি ওষুধে সারবে না।"

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এই গ্রামের ধারেকাছেও তখন কোনও ওঝা বদ্যি ছিল না। তবে যেখানে যিনি আছেন তাঁর কাছেই খবর পাঠানো হল। অবশেষে সারাদিনের পর অনেক রাতে একজন ওঝা এসে উপস্থিত হলেন।

"এটা কি বিষ্টু মশালের বাড়ি? শুনলাম তেনাকে নাকি ভূতে ধরেছে?"

বিষ্টু মশালের বাড়িতে তখন অনেক লোকজন। বললেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"কাল উনি যেখানে গিয়েছিলেন আমি সেখান থেকেই আসছি। শুনলাম আপনারা ওঝার খোঁজ করছেন? তা আমি কি একটু ওঁকে দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই পারেন। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। জ্বরের ঘোরে উনি ভুল বকছেন আর এমন এমন সব কথা বলছেন যাতে বোঝাই যাচ্ছে ওঁকে ভূতে ধরেছে।"

যিনি এলেন তিনি নীরবে ঘরের মধ্যে ঢুকে বিষ্টু মশালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর সবাইকে ঘরের বাইরে যেতে বলে রোগীর আপাদমস্তক একবার দেখে মৃদুস্বরে ডাক দিলেন, "বিষ্টুবাবু!"

বিষ্টু মশাল ঘোরের মধ্যে ছিলেন। এবার অল্প করে তাকালেন তাঁর দিকে। তাকিয়েই শিউরে উঠলেন। ভয়ে তাঁর চোখমুখের চেহারাই অন্যরকম হয়ে গেল। আতঙ্কিত হয়ে বললেন, "কে! কে তুমি?"

"আমাকে চিনতে পারছ না?"

"তুমি! তুমি তো সেই। তুমি এখানে কেন?"

"তুমি যে আমাকে দেখতে চেয়েছিলে, তাই তো তোমার কাছে এসেছি।"

"তুমি চলে যাও এখান থেকে।"

" তাই কি হয়? আমি যে তোমাকে নিতে এসেছি। কাল অত করে তোমার জন্য শ' খুঁড়লাম, কাঠ কেটে চিতা সাজালাম, কলসিতে জল ভরে রাখলাম, সে তো তোমারই জন্য। এখন থেকে আমরা দু' বন্ধুতে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াব, কেউ কাউকে আর অবিশ্বাস করব না।"

"না না না। তুমি চলে যাও। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না।"

কিন্তু কাল যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন কি সে সহজে যায়? বিষ্টু মশাল দেখলেন গত রাতে শ্মশানে দেখা সেই লোকটি কেমন যেন ঘোলাটে চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটির মুখ কী ভয়ানক!

হঠাৎ দেখলেন তার চেহারাটার কেমন যেন পরিবর্তন হচ্ছে। গায়ের মাংসগুলো গলে গলে খসে পড়ছে। দেখতে দেখতে লোকটির চেহারা একটি কঙ্কালে পরিণত হল, আর সেই কঙ্কালের চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। সেইসঙ্গে কী ভয়ানক ফ্যাঁসফেঁসে গলার হাসি। বিষ্টু মশাল ভয়ে দু' চোখ বুজে আর্তনাদ করে উঠলেন।

বাইরে যাঁরা অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা সবাই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। কিন্তু এ কী! ঘরের ভেতর কেউ তো নেই! কোথায় গেলেন গুনিন? সেই ভিন গাঁয়ের আগন্তুক? তবে বিষ্টু মশাল আছেন। প্রাণহীন দেহ নিয়ে নিথর হয়ে শুয়ে আছেন অন্তিম শয়ানে।

ভোজঙ্গার ডাঙালে সেই রাতেই সৎকার হল তাঁর। অবশ্য তাঁর চিতা তো একদিন আগেই সাজানো ছিল। কলসি ভর্তি জলটাও রাখা ছিল একপাশে।



শাঁখটিয়ার আতঙ্ক

বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত বেড়ুল গ্রামের গুহ পরিবারের একটি ছেলের চমকপ্রদ এক কাহিনীকে নিয়ে এই গল্প। ছেলেটির নাম তারাপদ।

সময়টা তখন চৈত্রের শেষ।

গ্রামবাংলা মেতে উঠেছে গাজনে, চড়কে। কোথাও বা হরিবাসর বসেছে। কোথাও হচ্ছে যাত্রাগান। তা এইরকম সময়ে এক রাতে তারাপদ গিয়েছিল যাত্রা দেখতে। অনেক রাতে যাত্রা যখন শেষ হল তখন দলবেঁধেই বাড়ি ফিরছিল ওরা। এমন সময়ে হঠাৎ প্রকৃতির ডাকে বয়ে যেতে হল ওকে।

সঙ্গীসাথী যারা ছিল তারা বলল, "তোমাকে একা পথের মাঝখানে ফেলে রেখে যাই কী করে আমরা? তার চেয়ে আমরা বরং অপেক্ষা করি, তুমি একটু তাড়াতাড়ি সেরে নাও।"

তারাপদ বরাবরই ডাকাবুকো। বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। গ্রামের কাছাকাছি যখন এসে গেছি তখন আর ভয় কী? তা ছাড়া চোর ডাকাত এলেও সুবিধে হবে না কিছু। কী আর আছে আমার?"

"না, ঠিক তা নয়, আসলে রাতবিরেতের ব্যাপার তো! যদি অন্য কিছু, মানে ওইসবের একটু বদনাম আছে কিনা এই গাঁয়ের।"

"সোজা কথায় ভূতপ্রেতের কথা বলছ? ওইসবে আমার ভয়ও নেই, বিশ্বাসও নেই। থাকলেও ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না।"

সবাই জানত তারাপদ সাহসী ছেলে। তাই বলল, "আমরা তা হলে যাই?"

তারাপদ বলল, "স্বচ্ছন্দে।"

ওরা চলে গেল। তারাপদ নিশ্চিন্ত মনে মাঠে কাজ সেরে পাশেরই একটা বড় পুকুরে গিয়ে নামল। পুকুরটা শাঁখটিয়ার মধ্যে পড়ে। মাছে ভর্তি এই পুকুর। বড় বড় রুই, কাতলা, কালবাউসে ভর্তি পুকুরটা। আর এই পুকুরের মাছের স্বাদও খুব।

তারাপদ যখন জলে নেমেছে ঠিক তখনই দেখতে পেল মস্ত একটা মাছ ঘাই দিল পুকুরের জলে।

পুকুরের চারপাশে বড় বড় আমগাছ ও বাঁশবন থাকায় কী মাছ সেটা বুঝতে পাবল না। তবে অনুমান করল, আট-দশ কেজি ওজনের কাতলা মাছ একটা।

মাছটা আবার ঘাই দিল।

এবারও একেবারে ডাঙার কাছে, তারপর হঠাৎই ওর গায়ে গা ঠেকিয়ে পিছলে সরে গেল।

তারাপদ জলে হাত-পা ধুয়ে ওত পেতে রইল মাছটাকে বাগে পাওয়ার জন্য। ও ঠিক করল, যেভাবেই হোক মাছটিকে ও ধরবেই। এই পুকুরের মাছ একটা ধরতে পারলে খাওয়াটা যা হবে তা কল্পনা করেও তৃপ্তি পেল।

মাছ যদি জলে থাকে তা হলে শুধু হাতে তাকে ধরতে যাওয়া বোকামি ছাড়া কিছু নয়। তবু সব জেনেও তারাপদ শুরু করল দাপাদাপি। তারপর যা হওয়ার নয় তাই হল। হঠাৎ মাছটা ঘাই মেরে ডাঙায় উঠে ছটফট করতেই তারাপদ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটার ওপর। আর ঠিক তখনই একজোড়া টর্চের আলো এসে পড়ল ওর গায়ে।

তারাপদর মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। নিশ্চয়ই যাদের পুকুর তাদেরই কেউ।

তবু ও ভাল করে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। ও দেখল, একটা গোরু ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অন্ধকারে তার চোখ দুটো কী সাংঘাতিক রকমের জ্বলছে। এই দেখে ও নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না। এমন নাকি হয়? রাত্রিবেলা চতুষ্পদ জন্তুদের চোখ জ্বলে ঠিকই, কিন্তু এইভাবে?

যাই হোক, তারাপদ মাছটাকে নিয়ে যখন কোনওরকমেই সেই ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারল না তখন বাধ্য হয়েই আঘাটায় উঠতে গেল। এবারে আরও ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

ও দেখল, একটা কুকুর অগ্নিদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে এক পা, এক পা করে। আর কুকুরের চোখ দুটো দিয়ে নানান রঙের আলো বেরিয়ে এসে অন্ধকারে রঙের খেলা খেলে হারিয়ে যাচ্ছে।

তারাপদর বুক কেঁপে উঠল এবার।

সে যত এগিয়ে আসে কুকুরও এগিয়ে আসে তত। ভাবটা এই, ডাঙায় উঠলেই ছিঁড়ে ফেলব একেবারে।

তারাপদ তবুও দমবার পাত্র নয়।

সে আবার অন্যদিক দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু কী জ্বালা! এখানে একটা কালো বিড়াল। তারও চোখের অবস্থা একই রকম।

তবু ও মাছটাকে বুকে নিয়ে উঠতে গেল বাঁশবনের দিকে। এখানে আবার অন্য দৃশ্য। একটা শেয়াল 'হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া' করে ডেকে উঠে আকাশের দিকে মুখ করতেই তার মুখ দিয়ে আগুনের হলকা ছুটতে লাগল।

তারাপদ জানে এগুলোকে বলে উল্কামুখী শেয়াল। ও এবার নির্ভয়ে ডাঙায় উঠল। তারপর এক হাতে মাছটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখেই মাটির একটা ঢ্যালা নিয়ে ছুড়ে মারল শেয়ালটাকে। যেই না মারা শেয়ালটা অমনই খ্যা, খ্যা করে মানুষের গলায় হেসে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু এই বাঁশবন পার হবে কী করে?

ওর কেবলই মনে হতে লাগল কারা যেন চারদিক থেকে দোল খাচ্ছে সেই বাঁশবাগানের ভেতরে। কেউ যেন ওর কানের পাশ দিয়েই সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

এবার দারুণ ভয় পেয়ে গেল তারাপদ। ও বুঝতে পারল যে, সে কখনও যা বিশ্বাস করত না তা বিশ্বাস না করে আর উপায় নেই। সত্যি-সত্যিই সে আজ এই মুহূর্তে ভূতের পাল্লায় পড়ে গেছে।

যখন মনের অবস্থা ঠিক এইরকম, তখনই তারাপদ দেখতে পেল একজন বয়স্ক মানুষ লণ্ঠন হাতে বাঁশবাগানের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন। কিন্তু এই রাতবিরেতে বাঁশবনের ভেতরে কেন? ওঁরও কি ভূতের ভয় নেই? অথবা সাপখোপের?

তারাপদ চেঁচিয়ে ডাকল তাঁকে, "এই যে শুনছেন?"

মানুষটি কোনও সাড়াশব্দ না দিয়েই চলতে লাগলেন। কালা নাকি? শুনতে না পান তবু

একজন চলমান মানুষ তো! ও দ্রুত পা চালিয়ে ধরে ফেলল তাঁকে।

তারাপদ কাছে গিয়ে বলল, "আমি আনগুনোয় গিয়েছিলাম যাত্রা শুনতে। তারপর হঠাৎ প্রকৃতির ডাকে আটকে গিয়ে ভূতের পাল্লায় পড়ে যাই। আমাকে একটু দয়া করে বাঁশবনটা পার করে দেবেন?"

মানুষটি 'হ্যাঁ' 'না' কিছু না বলে একই ভাবে পথ চলতে লাগলেন। চলছেন তো চলছেনই। বাঁশবন আর শেষ হয় না। পথও ফুরোয় না।

তারাপদর অবস্থা তখন শোচনীয়। ইতিমধ্যে হঠাৎ সে দেখল, তার বুকে যেটা আছে সেটা আসলে মাছের বদলে তার কঙ্কালটা। দেখামাত্রই শিউরে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাসার মাছটাকে ছুড়ে ফেলে দিল মাটিতে। মাছটা তখন আবার পূর্বরূপ ফিরে পেয়ে জীবন্ত হয়ে হঠাৎ ঘাই মেরে শূন্যে লাফিয়ে ছিটকে পড়ল পুকুরের জলে।

তারাপদ দেখল এতক্ষণ ধরে এত হেঁটেও সে কিন্তু পুকুরপাড়েই আছে।

মাছটা জলে পড়তেই চলমান মানুষটি থমকে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনটা আবার তুলে ধরে পুকুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাঃ, বেঁচে গেল ওটা!"

সেই আলোয় খুব কাছ থেকে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়েই এবার শোচনীয় হয়ে উঠল তারাপদর অবস্থা।

ওর শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল তখন।

কাঁপা কাঁপা গলায় তারাপদ বলল, "এ কী সিধুজেঠু আপনি?"

"চিনতে পেরেছিস তা হলে?"

"আপনি এখানে কেন?"

"এখানে ছাড়া কোথায় থাকব বল? এই বাঁশবাগানেই তো আমাকে সাপে কামড়েছিল। এর পাশেই তো খালধারে পোড়ানো হয়েছিল আমাকে। সেই থেকেই এখানে আছি।"

তারাপদ তখন প্রাণের দায়ে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছে। এক সময় বাঁশবন পার হয়ে পীরবাবার থানের কাছে চলে এল। অনেক আগে এখানে এক বৃদ্ধ ফকির থাকতেন। এখন তিনি নেই। তবে ভগ্ন স্থানটুকু আছে। কতকগুলো পোড়া মাটির ঘোড়া আরও কীসব যেন আছে। ও সেইখানে এসে হাঁফাতে লাগল।

এদিকে সেই গোরু, কুকুর আর উল্কামুখী শেয়ালটা পিছু পিছু এসেছে ওর। আর নানারকম ভাবে দেহটাকে ছোট-বড় করে চোখের মণিতে আলোর খেলা দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছে।

তারাপদ বুঝল, এদের হাত থেকে আজ ওর কোনওরকমেই পরিত্রাণ নেই। তাই কাতরভাবে সেই পীরবাবার কাছে মাথা কুটে বলতে লাগল, "পীরবাবা গো, আমাকে রক্ষা করো। এই প্রেতের কবল থেকে তুমি না বাঁচালে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমার শত অপরাধ ক্ষমা করো, তুমি আমাকে রক্ষা করো।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল এক অদ্ভুত ব্যাপার। কোথা থেকে যেন এক ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হল সেখানে। তার হাতে তীক্ষ্ণ তরবারি। সে এসেই বলল, "কে ডাকে আমায়? কে তুই?"

"আপনি কে?"

"তুই কে আগে বল?"

"আজ্ঞে, আমি তারাপদ। গুহদের বাড়ির ছেলে। বেড়ুগ্রামে থাকি। আনগুনোয় যাত্রা

শুনতে গিয়েছিলাম, এমন সময়—।"

"আর ভয় নেই। আমি এসে গেছি।"

তারপদর চোখের সামনে তখন এক ভয়ানক দৃশ্য। সেই ঘোড়সওয়ার রূপকথার রাজপুত্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল গোরু, কুকুর আর শেয়ালের ওপর।

গোরুর আকৃতি তখন হাতির মতো বিশাল। কুকুরের চেহারা ঘোড়ার মতো। আর শেয়াল! সে কখনও বাড়ে কখনও কমে।

সে কী ভয়ানক যুদ্ধ! সেই যুদ্ধে কেউ কাউকেই পরাস্ত করতে পারে না।

অবশেষে একসময় হার মানতে হল। গোরু, কুকুর আর শেয়াল নিপাত গেল তিনজনেই।

ঘোড়সওয়ারের আকৃতি তখন অন্যদের চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তালগাছের মতো।

একটু একটু করে দিনের আলো ফুটে উঠছে তখন। রণক্লান্ত ঘোড়সওয়ার একহাতে কপালের ঘাম মুছে বলল, "আর কোনও ভয় নেই তোর। যা, চলে যা।"

তারাপদ বিগলিত হয়ে বলল, "আপনি কে?"

"যা বলছি।"

সেই কণ্ঠস্বরে তারাপদ ভয়ে ভয়ে তাকাল ঘোড়সওয়ারের দিকে। আর কী আশ্চর্য! ওর চোখের সামনেই ভোরের আবছা আলো-অন্ধকারে একটু একটু করে মিলিয়ে গেল ঘোড়সওয়ার।

তারাপদও ঘরে ফিরে এল। তবে সেই থেকে সে আর কখনও রাতদুপুরে একা শাঁখটিয়া দিয়ে যাওয়া-আসার চেষ্টা করেনি।



সন্ধ্যানীড়

আমার বন্ধু শিশিরের ওই এক রোগ, যখন-তখন যার-তার সঙ্গে পায়ে পা তুলে ঝগড়া বাধিয়ে বসে। সেইজন্য ওকে নিয়ে পথেঘাটে বেরোতে আমার ভয় লাগে। তা সেবার হল কি, আমাদেরই এক বন্ধু শিলদায় থাকে, হঠাৎ করে তার বোনের বিয়ের ঠিক হয়ে গেলে সেই উপলক্ষে আমাদেরও যেতে হল ঝাড়গ্রামে।

ইস্পাত এক্সপ্রেস তখন সবে চালু হয়েছে। সকাল ছ'টা দশে ট্রেন। তাড়াহুড়ো করে স্টেশনে এসে টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই দেখি ট্রেন আসছে।

শিশির তো লাফাতে লাফাতে বলল, "যেভাবেই হোক জানলার ধারে একটা সিট আমাদের চাই।"

কিন্তু চাই বললেই তো হল না। রিজার্ভেশন নেই। আগে উঠে জায়গা দখল করতে পাবলে তবেই না! তা সেইভাবেই ওঠা হল। শিশির কবল কি, গাড়িতে ওঠার আগেই জানলা গলিয়ে সাইডেব সিটে একটা রুমাল ফেলে দিয়েছিল। তাবপব গাড়িতে উঠে অন্য এক সহযাত্রী সেখানে বসতে যেতেই তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ওই সিটে আমাকে বসিয়ে আমাব পাশে নিজেও বসে পড়ল। ব্যস কেলেঙ্কারির চরম। সেই নিয়ে তো হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। অবশেযে ওই সহযাত্রীকে শিশিরের বিক্রমের কাছে হার মানতেই হল।

ট্রেন ছাড়ল যথাসময়ে। সেই সহযাত্রী, যিনি আমাদের আগে উঠে জায়গার দখল নিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তিনি অনববত গজগজ করতে লাগলেন। অন্যান্য সহযাত্রীরাও বললেন, "না না, এইভাবে রুমাল পেতে সিট রাখা যায় না।"

শিশিরও ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, "কেন যায় না মশাই? সবাই রাখে। ক'জনকে দেখতে চান?"

"কাউকেই দেখতে চাই না। কিন্তু ওটা নিয়ম নয়।"

"আরে রাখুন তো মশাই নিয়ম। বেশি নিয়মকানুন দেখালে পর পর লাইন দিয়ে ট্রেনে উঠতে হয়। এই ভদ্রলোক তো আমাকে ঠেলে সরিয়ে আমার আগে উঠলেন। তখন কোথায় ছিলেন আপনারা?"

অবশেযে আমিই বিবাদেব অবসান ঘটাতে জানলার ধার থেকে সরে এসে ভদ্রলোককে বললাম, "নিন দাদা, আপনিই বসুন। আমার জানলার ধারে না বসলেও চলবে।"

ওম শান্তি। ভদ্রলোক অন্য সিট থেকে সরে এসে গুছিয়ে বসলেন জানলার ধারে। কিন্তু ততক্ষণে শিশির তো আমার ওপর রেগে আগুন, তেলে বেগুন। বলল, "এটা কী করলি তুই? যে জায়গার জন্য এত ঝগড়াঝাঁটি করলাম, তুই কিনা বদান্যতা দেখিয়ে সেই জায়গাটা ওঁকেই ছেড়ে দিলি? এতে আমার কতটা অপমান হল একবার ভেবে দেখলি না?"

আমি হেসে বললাম, "আরে মান-অপমানেব কী আছে এতে? সবাই যখন অপছন্দ কবছেন, তখন দিলামই না হয় সিটটা ছেড়ে।"

শিশির বলল, "বাঃ বন্ধু! বেশ বেশ।" বলে রাগে ফুলতে লাগল। তারপর খড়্গপুর এলে আমাকে বসিয়ে রেখে প্ল্যাটফর্মে নেমে ভাল চা এক ভাঁড় আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমার টিকিটটা আমাকে দে তো।"

"কেন, কী করবি? এখনই ছেড়ে দেবে ট্রেন, উঠে আয়।"

"যা বলছি তাই কর। তাড়াতাড়ি দে।"

অগত্যা একটা টিকিট ওর হাতে দিলাম।

নড়ে উঠল ট্রেন।

শিশির বলল, "তুই যা। আমি যাচ্ছি না। আমার মুড খারাপ হয়ে গেছে। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।"

মুড আমারও খারাপ হয়ে গেল। এমন যে হবে তা কেই-বা জানত?

যথাসময়ে ঝাড়গ্রাম এলে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম আমি। এবং নামার সঙ্গে-সঙ্গেই স্থির করলাম, বন্ধুর বোনের বিয়ে যখন কাল, তখন আজ আর সেখানে না গিয়ে এখানেই কোনও একটা হোটেলে উঠে চারদিক একটু ভাল করে ঘুরে বেড়িয়ে নিই।

এই ভেবে স্টেশন সংলগ্ন দু-একটি লজে গেলাম আশ্রয় নিতে। কিন্তু কোনওটিই আমার মনের মতো না হওয়ায় যখন কী করব ভাবছি তখনই একজন বলল, "খুব ভাল জায়গায় যদি থাকতে চান তা হলে আপনি সন্ধ্যানীড়-এ চলে যান।"

"সন্ধ্যানীড়টা কোথায়?"

"ঝাড়গ্রামের শেষপ্রান্তে। মনোরম পরিবেশ। ওর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।"

তার কথামতো অনেকটা পথ হেঁটে চমৎকার একটি নবনির্মিত বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই সন্ধ্যানীড়। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম এক প্রবীণ ভদ্রলোক খাতা পেন নিয়ে বসে আছেন। আমি যেতেই অভ্যর্থনা করলেন, "আসুন আসুন, ঘর নেবেন?"

বললাম, "হ্যাঁ। সিঙ্গল রুম একটা চাই।"

"আপনার নাম-ঠিকানাটা লিখে দিন। পঞ্চাশ টাকা জমা করুন।"

আমি তাই করলাম। অমনই এক রূপবতী বিবাহিতা তরুণী একমুখ হাসি নিয়ে পরিচিতজনের মতো এসে বলল, "আসুন।"

আমি তাকেই অনুসরণ করলাম।

বাড়ির পেছনে বাগানের দিকে একা থাকার মতো ছোট্ট একটা ঘর দেখিয়ে তরুণী বলল, "এই ঘর পছন্দ আপনার?"

সত্যিকথা বলতে কি, এইখানকার পরিবেশটাই আমার পছন্দ। তার ওপর একার জন্য এমন একটি ঘর তো দারুণ লোভনীয়। বললাম, "এই ঘরই আমার পছন্দ।" বলে ঘরে ঢুকেই বললাম, "আঃ, কী সুন্দর গন্ধ। কীসের গন্ধ বলুন তো?"

"হাস্নুহানার। সারারাত আমোদে ভরিয়ে দেবে আপনাকে। ক'দিন থাকবেন?"

"ঠিক নেই। এখানকার পরিবেশ দেখে আমি এমনই মুগ্ধ যে, এই জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারছি না।"

"বেশ তো, থাকুন না এখানে কিছুদিন। পরে সময় পেলে মাঝেমধ্যে চলে আসবেন।"

"এই ঘরের ভাড়া কত?"

"বেশি নয়, পঁচিশ টাকা। কুড়ি টাকার ঘরও আছে।"

"থাকুক, এই ঘরই আমার পছন্দ।"

"থ্যাঙ্কস।"

অ্যাটাচড বাথ নয়, কমন। তা হোক, এই লজে গেস্টও কেউ নেই। কাজেই কোনও অসুবিধে হবে না। ঘর থেকে বেরোলেই বাথরুম। পাশেই বাগানে নানারকমের গাছগাছালির শোভা। ফুলগাছও রয়েছে অনেক।

আমি বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আসতেই তরুণী আবার মিষ্টি হাসির মাধুর্য ছড়িয়ে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল।

এই সময় চায়ের একটু সত্যি প্রয়োজন ছিল আমার। ভাবছিলাম বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে আসব। তার জায়গায় মেঘ না চাইতেই জল। বললাম, "আপনি কি অন্তর্যামী? সত্যিসত্যিই এখন আমার খুব চা খেতে ইচ্ছে করছিল।"

তরুণী বলল, "বাঃ রে! হোটেল চালাই আর যা-ই করি, আমিও তো একজন গৃহবধূ। অতদূর থেকে ট্রেন জার্নি করে এসেছেন, এখন একটু চা খাবেন বইকী! তাই নিয়ে এলাম। দুপুরে কী খাবেন বলুন? মাছ, মাংস না ডিম?"

আমি বললাম, "যদি মাছ-মাংস খাই?"

"তা হলে বলুন খাসি না মুরগি?"

"মুরগি।"

"ঠিক বেলা বারোটায় পেয়ে যাবেন। চা খেয়ে ততক্ষণ একটু আশপাশ থেকে ঘুরে আসুন।"

আমি তাই করলাম। চা খেয়ে চায়ের কাপটা দরজার বাইরে রেখে ঘরে তালা দিয়ে বেড়াতে চললাম। ভাগ্যে শিশিরটা সঙ্গে আসেনি। এলে সব মাটি করে দিত। প্রথমত, ওই তরুণীকে দেখে এই লজে তো উঠতই না। তার ওপর রসবোধ না থাকায় কথাটি বলতে দিত না কারও সঙ্গে। বিশেষ করে কোনও মেয়ের সঙ্গে তো নয়ই। যখনকার গল্প, তখন আমার কাঁচা বয়স। তরুণীও সুন্দরী। ফলে তার মাধুর্য আমার মনকে ভরিয়ে তুলেছিল। তবুও একটা ব্যাপার আমার কিন্তু ভাল লাগছিল না, সেটি হল তরুণীর এই আন্তরিকতা। হোটেলের যাত্রী পরিষেবার জন্য এমন এক গৃহবধূকে এগিয়ে দেওয়ায় গৃহস্থের প্রতি কারও ধারণা ভাল থাকে কী? আমার পরিবারের মধ্যে এইরকম তো আমি কল্পনাও করতে পারি না।

যাই হোক, আমি ঝাড়গ্রামের পথে পথে ঘুরে শাল ও সেগুনের বন দেখতে লাগলাম। চারদিকে লাল মাটি আর ঘন সবুজের সমারোহ দেখে মন আমার ভরে গেল। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই আমার এক পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক রেলে চাকরি করেন। একসময় উনি আমাদের এলাকাতেই থাকতেন। আমায় দেখেই উল্লসিত হয়ে বললেন, "কী গো! তুমি!"

"আপনি এখানে?"

"আমি তো এখন এখানেই আছি। কিন্তু তুমি এখানে কী করছ?"

"কিছুই না। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"বুঝেছি। মাথার পোকাটা আবার নড়ে উঠেছে তাই না? উঠেছ কোথায়?"

"সন্ধ্যানীড়ে।"

সন্ধ্যানীড়ের নাম শুনেই কেমন যেন হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। পরক্ষণেই স্বাভাবিক হয়ে

বললেন, "কী করে সন্ধান পেলে?"

"স্টেশনের কাছেই একজনের মুখে শুনলাম, তাই—।"

"ভাল ভাল। একেবারেই ঘরোয়া পরিবেশ ওখানকার।"

আমি বললাম, "তবে ওখানকার একটা ব্যাপার আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।"

"কোন ব্যাপারটা?"

"কোনও ভদ্রঘরের তরুণী বউকে দিয়ে এইভাবে অতিথি আপ্যায়ন করানোটা কি ঠিক?"

"না না, ঠিক নয়। তবে কি জানো, এ ছাড়া উপায়ও ছিল না ওদের। ওই সন্ধ্যামা সত্যিকারের একজন আদর্শ গৃহবধূ। অত ভাল মেয়ে হয় না। ওই যে প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখলে, উনিই ওর শ্বশুর। আগে আর্মিতে ছিলেন। ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় ওঁর দুটি পা-ই হারান উনি। ওঁর একমাত্র ছেলে জয়ন্ত বছর দুই আগে হঠাৎই নিখোঁজ। এই অবস্থায় জীবনধারণের জন্য ওই হোটেল ব্যবসা করা ছাড়া ওঁদের আর কোনও উপায় ছিল না। ঝাড়গ্রামের ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে দূরে এই বাড়িটি ওঁরা শান্তিতে বসবাসের জন্যই তৈরি করেছিলেন। এখন ওটাকেই একটু গুছিয়ে গাছিয়ে দু-একটা ঘর বাড়িয়ে যাত্রীনিবাস করে তুলেছেন। বেশি নির্জনে বলে খুব একটা লোকজনও যায় না ওখানে। দুপুরে এবং সন্ধ্যায় খাওয়ার জন্য কিছু লোক আসে। মাঝেমধ্যে চেঞ্জাররাও গিয়ে থাকেন। তবে দু-একদিন। কেউ কেউ নাকি ভয়টয়ও পান। অবশ্য এ সবই মনের ব্যাপার। তা যাক, সন্ধ্যামাই দেখাশোনা করে সবকিছুর। এমনকী অতিথিদের রুচি অনুযায়ী রান্নাবান্নাও। এক হাতে হোটেলের হাল ধরা, আর ওই প্রতিবন্ধী শ্বশুরের সেবাযত্ন করা কি কম কথা? কাজের লোক একজন আছে, সে কোনও কাজেরই না। ঘর ঝাঁট দেয় আর বাসন মাজে। এমনকী দোকানবাজার পর্যন্ত সন্ধ্যামাই করে।

আমি অভিভূত হয়ে বললাম, "তাই বুঝি?" আমি মনে মনে অন্যরকম ভাবছিলাম। ছিঃ ছিঃ।

"তোমার দোষ নেই। যারা ভেতরের ব্যাপার জানে না তারা অনেক কিছুই ভাবে।"

আমি আর বেশিক্ষণ সেখানে না থেকে সন্ধ্যানীড়ে ফিরে এলাম। তরুণীর প্রতি এক বিনম্র শ্রদ্ধায় অন্তর আমার ভরে উঠল।

দুপুরে স্নানের পর তরুণী এসে মাংসভাত দিয়ে গেল। সেইসঙ্গে আলুভাজা, পাঁপড় আর চাটনি। একেবারে বাড়ির মতো রান্না। খেয়ে দারুণ তৃপ্ত হলাম। এর পর একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে গেলাম রাজবাড়ি দেখতে। তারপর সন্ধে উত্তীর্ণ হতেই আবার ফিরে এলাম।

আমি ফিরে আসায় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তরুণী। বলল, "কী এত পথে পথে ঘুরছেন বলুন তো সেই থেকে? একে বনজঙ্গলের দেশ, তায় নির্জন জায়গা। হঠাৎ করে কোনও ভালুক-টালুক বেরিয়ে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে যে!"

আমি হেসে বললাম, "বন্যজন্তুর কথাটা অবশ্য আমার মনে হয়নি একবারও। যাই হোক, এবার সাবধান হয়ে যাব।"

তরুণী বলল, "একটু আগে একজন যাত্রী এসেছিল। দূর করে দিয়েছি তাকে।"

"সে কী! কেন?"

"মনে হল ড্রিঙ্ক করে এসেছিলেন ভদ্রলোক। মুখ থেকে গন্ধ ছাড়ছিল। আমার এখানে ওইসব হবে-টবে না।"

"বেশ করেছেন। দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। বিশেষ করে এই সন্ধ্যানীড়ের একটা সুনাম আছে। সেটা যেন নষ্ট না হয়।"

আমি ঘরে এসে বসলে তরুণী আবার চা নিয়ে এল আমার জন্য।

আমি চায়ে চুমুক দিলে সে বলল, "রাত্রে কী খাবেন? ভাত না রুটি?"

"রুটি আর মাংস।"

"না না। দু' বেলা মাংস না। রাতে একটু আলুর দম করি। আমার হাতের আলুর দম খেয়ে দেখুন, সবাই ভাল বলে। আশা করি আপনারও ভাল লাগবে।"

"যা আপনি খাওয়াবেন, হাসিমুখ করে তাই খাব আমি।"

তরুণী আমাকে বসিয়ে রেখে সেই যে গেল, আর এল না। এল যখন, রাত দশটা। খান ছয়েক রুটি আর একবাটি আলুর দম টেবিলে রেখে বলল, "শুভরাত্রি। আজকের মতো আসি তা হলে?"

"অবশ্যই। আপনার দেরি দেখে ভাবলাম ভুলেই গেলেন বোধ হয়।"

"তাই কি পারি? আপনাদের সেবাই যে আমার ধর্ম।"

তরুণীর কথায় অন্তর প্লাবিত হয়ে গেল আমার। হাতে একটি গল্পের বই ছিল, তরুণীর হঠাৎ নজরে পড়ল সেদিকে। বইটা হাত থেকে নিয়ে নেড়েচেড়ে বলল, "কাল তো আপনি আপনার বন্ধুর বোনের বিয়েতে শিলদা যাবেন, যাওয়ার আগে বইটা দিয়ে যাবেন আমাকে? আমি সারাদিনে পড়ে শেষ করব।"

"বেশ তো, কাল কেন? আজ এখনই নিন আপনি। আমি খেয়েদেয়েই শুয়ে পড়ব। আর বই পড়ব না।"

তরুণী খুশিমনে বই নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, "বাগানের দিকের এই জানলাটা বন্ধ রাখবেন, কেমন? অন্ধকারে রাতদুপুরে লতাটতার উপদ্রব হতে পারে।"

তরুণীর কথামতো জানলা বন্ধ করে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। শোওয়ামাত্রই ঘুম।

সেই ঘুম ভাঙল মধ্যরাতে হঠাৎ একটা খস খস শব্দ শুনে। মনে হল পাশের বাগানে কে যেন পায়চারি করছে। কে? কে ওখানে? আমি শয্যাত্যাগ করে পা টিপে টিপে জানলার কাছে এসে জানলাটা ফাঁক করেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে সর্বাঙ্গ নীল হয়ে গেল আমার। দেখলাম বাগানের পাঁচিলের পাশে যে পেয়ারাগাছটা আছে তারই ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে সন্ধ্যানীড়ের সন্ধ্যাপ্রদীপ। সেই তরুণী। চোখেমুখে কোনও বিকৃতি নেই। হাসিখুশি মিষ্টি মুখে স্থির চোখে অপলকে চেয়ে আছে আমার জানলার দিকে। সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলাম আমি। এইটুকু সময়ের মধ্যে কী এমন হল যে, আত্মহননের পথ বেছে নিতে হল তরুণীকে? হঠাৎ সশব্দে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল জানলাটা। এমনভাবে বন্ধ হল যে, চেষ্টা করেও সেই জানলা আমি আর খুলতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে আবার এসে শয্যাগ্রহণ করলাম। সারারাত জেগেই কাটাতে হল এর পর।

ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই ঘুম ভাঙল রোদ ওঠার পর। দরজায় টক টক শব্দ শুনেই বুঝলাম নির্ঘাত পুলিশ। কিন্তু দরজা খুলেই অবাক! দেখি না চা-বিস্কুট হাতে নিয়ে হাসি হাসি মুখে তরুণী এসে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। বলল, "এ কী! এখনও ঘুমোচ্ছেন?"

আমি ভূত দ্যাখার মতো চমকে উঠলাম। আমতা আমতা করে বললাম, "না, মানে কাল

রাতে প্রথমদিকে ঘুম হয়নি বলে শেষের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"তবু ভাল।" বলে তরুণী আমার ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রেখে একটু রাগতস্বরেই বলল, "কাল আমি বলে গেলাম বাগানের দিকের জানলাটা খুলবেন না, ঠিক খুলেছেন দেখছি।"

আমার চোখ তখন কপালে উঠে গেছে। যে জানলাটা কাল রাত্রে আমি আর একবার চেষ্টা করেও খুলতে পারিনি, সেই জানলাটা শুধু যে খোলা আছে তাই নয়, ছিটকিনিও লাগানো আছে। আমি কোনওরকমে ঢোক গিলে বললাম, "না, মানে ইয়ে—।"

"যাক, মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিন। আপনি কি এখনই যাবেন, না খেয়েদেয়ে দুপুরে?"

"এখনই যাব। এবং একেবারেই।"

আমার কথার সুরে আহত হয়ে তরুণী আমার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল ঘর থেকে।

বয়েই গেল! কাল রাতে যে দৃশ্য আমি দেখেছি তারপরে আর এখানে থাকার সাহস আমার নেই। তাই চা খেয়ে হিসেবের পাট চুকিয়ে বিদায় নিলাম। তরুণী আমার বইটি ফেরত দিতে এলে উপহার হিসেবেই বইটি দিয়ে এলাম ওকে।

শিলদায় আমাদের যে বন্ধু থাকে তার নাম অমল। আমি যাওয়ায় অমল তো দারুণ খুশি। আনন্দের আবেগে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল ও। তারপর বলল, "তুই একা কেন? শিশিরেরও তো আসবার কথা ছিল। সে কই?"

আমি তখন সব বললাম ওকে।

শুনে অমল বলল, "শিশিরটা দেখছি বরাবর একই রকম রয়ে গেল। তা যাক, তুই যে এসেছিস, এতেই আমরা খুশি হয়েছি খুব। তবে কাল সন্ধ্যানীড়ে না উঠে এখানেই চলে আসতে পারতিস। বাড়িটার একটু বদনাম আছে।"

"কীরকম?"

"রাত্রিবেলা অনেকেই নাকি অনেক কিছু দেখতে পায় ও-বাড়িতে। ভয়টয় পায়।"

আমি তখন সুযোগ পেয়ে আমার অভিজ্ঞতার কথাটাও বললাম ওকে।

শুনেই শিউরে উঠল অমল। বলল, "ভাগ্য ভাল যে, বেঁচে গেছিস! ওই তরুণী নিশ্চয়ই জানত রাতের অন্ধকারে বাগানের মধ্যে ওইরকম কিছু দেখা যায়, তাই জানলাটা বন্ধ করতে বলেছিল।"

"কিন্তু এমনও কি হয়?"

"হয় কিনা জানি না। শুনতে পাই অনেক কিছুই। তবে তুই যখন দেখেছিস তখন আর অবিশ্বাস করি কী করে বল? এই প্রথম একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনলাম।"

এর পর সারাটা দিন বেশ ভালভাবেই কেটে গেল অমলদের বাড়িতে। বিকেল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকজনের আগমনে বাড়িটা জমজমাট হয়ে উঠল। আর ঠিক সন্ধের মুখেই মস্ত একটি পুষ্পস্তবক হাতে নিয়ে এসে হাজির হল শিশির। ওকে দেখে তো আনন্দে অধীর হয়ে উঠল সকলে। আমি কিন্তু শিশিরের চোখেমুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষণ ভাল বুঝলাম না। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল বটে, কিন্তু একটি কথাও বলল না।

রাত্রে খেতে বসলাম দু'জনে। ফার্স্ট ব্যাচেই বসলাম। গোঁজ হয়ে বসে খুব দ্রুততার সঙ্গে যা খাওয়ার গপাগপ করে খেয়ে নিল ও। নিজের থেকে কিছু চাইল না। কিন্তু যা দেওয়া হল

তা পাতে রইল না।

খেয়েদেয়ে উঠেই অমলকে বলল, "আমি চলি রে!"

"সে কী! অতদূর থেকে এলি, একটা রাতও থাকবি না?"

"কোনও কাজের বাড়িতে রাত কাটানো আমার পোষায় না। আর কেউ যদি যেতে চায় তো আমার সঙ্গে যেতে পারে।"

কথাটা যে আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলল, তা বুঝতেই পারলাম।

অমল আমাকে ইশারা করল ওর সঙ্গে যেতে। তারপর বলল, "এখন গেলেও লাস্ট বাসটা পেয়ে যাবি হয়তো। কিন্তু রাত কাটাবি কোথায়?"

"ঝাড়গ্রামে সন্ধ্যানীড়ে একটা ঘর আমি বুক করে এসেছি। সেখানেই উঠব।"

সন্ধ্যানীড়ের নাম শুনেই চমকে উঠলাম আমরা। আমার তো বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল।

অমল তখন আমার ব্যাপারটা সব খুলে বলল শিশিরকে।

শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল শিশির। বলল, "সেইজন্যই তো আরও বেশি করে যাব ওখানে। এই সমস্ত বুজরুকি আমি বিশ্বাস করি না। কিছু লোকের স্বভাবই হচ্ছে অযথা গুজব সৃষ্টি করা। আজ রাতে আমি স্বচক্ষে দেখব ওখানে কী হয়।"

অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশিরের সঙ্গে যেতে হল আমাকে।

সন্ধ্যানীড়ে যেতেই তরুণী মৃদু হেসে বলল, "কী ব্যাপার! আবার এলেন যে?"

"বাধ্য হয়েই আসতে হল আমার এই বন্ধুটির জন্য।"

তরুণী হেসে গড়িয়ে পড়ল, "বন্ধু! কোথায় বন্ধু আপনার?"

আমার তখনকার অবস্থাটা আমি ঠিক কাউকেই বুঝিয়ে বলতে পারব না। কোথায় শিশির, কোথায় কে? আমি তো একা। আমার শরীরের মধ্য দিয়ে যেন একটা হিমস্রোত বয়ে গেল।

তরুণী বলল, "আপনি কি ওই ঘরেই থাকবেন? না অন্য ঘর দেব আপনাকে?"

আমি কোনওরকমে বললাম, "আমি যাই।"

"আপনি যেতে চাইলেও আমি তো আপনাকে যেতে দেব না। তার চেয়ে বরং এখানেই থাকুন আপনি। একা থাকতে না চান এইখানেই বসে আমার সঙ্গে গল্প করেই রাতটা কাটিয়ে দিন।"

তরুণীর প্রস্তাবে রাজি হলাম আমি। না হওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। তার কারণ এই বাড়িতে কোনওমতেই একা থাকা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।

দু'জনে মুখোমুখি বসলে তরুণী বলল, "আচ্ছা বলুন তো, আজ সকালে হঠাৎ আপনি মতের পরিবর্তন করে চলে গেলেন কেন? কাল রাতে আপনি কি কোনও কারণে ভয়টয় পেয়েছিলেন?"

আমি তখন রাতের ঘটনার কথা বললাম তরুণীকে।

সব শুনে তরুণীর চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। বলল, "আমাদের এই সন্ধ্যানীড়ে আপনিই শেষ অতিথি। খুব শিগগির আমরা এখানকার পাট তুলে দিয়ে মধুপুরে চলে যাব।"

"কিন্তু কেন?"

"এইভাবে কি হোটেল ব্যবসা করা যায়? আপনিই বলুন না? এই সন্ধ্যানীড়ে আর একবার ফিরে আসতে আপনারই কি ইচ্ছে করবে?"

"তা অবশ্য ঠিক।"

"কাল রাতে যাকে আপনি দেখেছিলেন সে আর কেউ নয়, আমারই বোন। সামান্য একটা ব্যাপারে অভিমান করে ওই পেয়ারাগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়েছিল সে। তারপরেই অত্যন্ত রহস্যময়ভাবে আমার স্বামী নিখোঁজ হয়ে যান। এদিকে এখানকার ব্যাপারস্যাপার লোকমুখে চাউর হয়ে যাওয়ায় কেউ এখানে আসেও না বড় একটা। তবুও মাঝেমধ্যে আপনার মতো কেউ হঠাৎ করে এখানে এসে পড়লে দারুণ চমকে উঠি। কেননা তারা সবাই বলে স্টেশন এলাকা থেকেই কেউ নাকি তাদের এখানে আসতে বলেছে। অথচ ওখানে আমার কোনও লোকই নেই।"

আমি বললাম, "তা না হয় হল। কিন্তু আমার সঙ্গে যে বন্ধুটি এল সে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল কী করে? ঠিক যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।"

"আপনার সঙ্গে কোনও বন্ধুই আসেননি।"

"সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু সারাটা পথ যে আমরা একসঙ্গেই এলাম।"

"এবং এখান থেকে বিদায় নিলে ওই বন্ধুই আবার আপনার সঙ্গ নিতেন। সেইজন্যই আপনাকে আমি যেতে দিলাম না।"

"তা হলে কি বলতে চান আমার বন্ধুও, মানে ওরও কিছু হয়ে গেছে?"

"কী করে বলব বলুন? আপনিও যেখানে আমিও সেখানে।"

সে রাতটা তরুণীর সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে কোনওরকমে কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকালের ট্রেনেই ফিরে এলাম বাড়িতে। এসেই এক মর্মান্তিক সংবাদ পেলাম। আমার পাশের বাড়ির নরেশবাবু হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন। তবে কিনা অধিকাংশ ভূতের গল্প যা হয়, এক্ষেত্রে তা হয়নি। শিশিরের আত্মা শিশিরের মধ্যেই আছে। অর্থাৎ সজ্ঞানে এবং সুস্থ শরীরেরই আছে সে। ওইদিনের ঘটনার জন্য সে নিজেই অনুতপ্ত। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, শিশিরের মতো চেহারা নিয়ে যে আমাকে দেখা দিল, সে তা হলে কে?



সন্ধ্যামালতী

খুব যে একটা বেশিদিনের কথা, তা নয়। বছর তিরিশ আগেকার কথা। হুগলি জেলার নিত্যানন্দপুর নামে এক গ্রামে গেছি আমার এক বন্ধুর বিয়েব জন্য মেয়ে দেখতে। সময়টা বসন্তকাল, তাই আবহাওয়া বেশ মনোরম। চুঁচুড়া থেকে বাসে ত্রিবেণী কালীতলা হয়ে কালনার পথে নিত্যানন্দপুব।

কুন্তী নদীর সাঁকো ভেঙে সবে বাস চলার উপযোগী একটা সেতু হয়েছে। আর কেশোরাম রেয়নকে কেন্দ্র করে হয়েছে নতুন একটি রেল স্টেশন কুন্তীঘাট।

তা যাই হোক, মেয়ে তো দেখতে এলাম। মেয়ে দেখতে এসে হল এক দারুণ অভিজ্ঞতা। আর সেই অভিজ্ঞতা না হলে আজকের এই গল্প লেখাই হত না।

যে বাড়িতে আমরা মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম সেই বাড়ির মালিকের নাম আমি এতদিনে ভুলে গেছি। তবে মস্ত দালান কোঠা তাদের। মস্ত বড়লোক। প্রচুর জমিজমা আছে। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। সুশ্রী, সুন্দরী, রূপবতী, গুণবতী, বিয়ের সময় মেয়েদের জন্য যা যা বলা হয়, এই মেয়ের ব্যাপাবেও সেইসব শুনে গিয়েছিলাম। তবে যে কোনও কারণেই হোক ফোটো পাঠায়নি তারা। আমরাও তাই মেয়ের রূপের বর্ণনা শুনেই মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম।

তাড়াতাড়িই পৌঁছেছিলাম আমরা। এই বিয়ের ব্যাপারে যিনি ঘটকালি করেছিলেন সেই বীরু চক্রবর্তী আমাদের খুব আদর-যত্ন করে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বসালেন।

মেয়ের বাবা কাকা জ্যাঠামশাইরা এলেন। বললেন, "তোমরা অনেকদূর থেকে এসেছ বাবা। খাওদাও, আজকের দিনটা থাকো। আজ শনিবার। মেয়ে দেখাব না। কাল সকালে দিনের আলোয় মেয়ে দেখবে তোমরা।"

আমি বললাম, "কিন্তু এমন কথা তো ছিল না। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনওরকম কুটুম্বিতাই হল না যেখানে, সেখানে কী করে আমরা রাত্রিবাস করি বলুন?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "নাই বা হল। মানুষ কি মানুষের বাড়িতে আসে না? আজ শনিবার, খরবার। তাই বলছিলাম, আমরা গ্রামের মানুষ। মেয়ে আমাদের ঘরের লক্ষ্মী। তাকে কী করে...।"

বন্ধুর হয়ে আমি বললাম, "না না ঠিক আছে। কাল সকালেই মেয়ে দেখব আমরা। এখন মেয়ে দেখে বাড়ি ফিরতেও রাত হয়ে যাবে অনেক। আপাতত আমাদের একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিন তা হলে।"

মেয়ের বাবা বললেন, "সে আমরা সবরকম ব্যবস্থাই করে রেখেছি। এসো, তোমরা ওপরে এসো। ওপরের ঘর থেকে গ্রামের দৃশ্য দ্যাখো, গঙ্গা দ্যাখো। কাছেই গঙ্গা। এই যে কুন্তীনদীর পোল পেরিয়ে এলে তোমরা, ওই নদী লক্ষ্মীবাজারের পাশ দিয়ে গঙ্গায় মিলেছে। আরও একটা নদী আছে এখানে। সেটা মিলেছে কুন্তীতে। এমন মনোরম দৃশ্য আর কোথাও

পাবে না।”

আমরা ওঁদের আমন্ত্রণে ও আপ্যায়নে ওপরের ঘরে এলাম। ওপরেই আমাদের মুখ হাত পা ধোয়ার ব্যবস্থা হল। তারপর এল ডিশভর্তি ভাল খাবার।

আমার বন্ধুটির নাম অজয়। বলল, “এসব কী করেছেন? এত খাবার খাব কী করে? তা ছাড়া মেয়ে দেখে আমাদের মতামত জানানোর পরে এইসব আপ্যায়ন হলেই কিন্তু ভাল হত। এখন ধরুন, মেয়ে যদি আমাদের পছন্দ না হয়?”

জ্যাঠামশাই বললেন, “তাতে কী? আমাদের মেয়ে আমাদেরই থাকবে।”

এক প্রবীণা মহিলা, ইনি বোধ হয় জেঠিমা, বললেন, “তবে বাবা এও বলে রাখছি, এ মেয়ে একবার দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবে না। অপছন্দ হওয়ার মতো নয়।”

যাই হোক, আমরা তো জলযোগ সারলাম। এর পর দু' বন্ধুতে ছাদে উঠলাম প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে। সঙ্গে ওঁদের বাড়ির লোকরাও এলেন।

গ্রামের মধ্যস্থলে মস্ত দোতলা বাড়ি। ছাদে উঠে চারদিকে চোখ মেলে দিতেই প্রকৃতির শ্যামল শোভায় চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। কী সুন্দর দৃশ্য চারদিকে। মনে মনে ভাবলাম মেয়ে যদি পছন্দ হয় তা হলে বিয়ে হবে। বন্ধু তো শ্বশুরবাড়িতে আসবেই। আমিও মাঝেমধ্যে সঙ্গ নেব ওর। কলকাতার এত কাছে এমন পল্লীদৃশ্য আর কোথায় পাব?

সন্ধে পর্যন্ত আমরা ছাদে ঘুরে সকলের সঙ্গে গল্পগুজব করে দোতলায় আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নেমে এলাম।

এ বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট নেই। তার কারণ, এই গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। তাই লণ্ঠনবাতি জ্বেলে ঘরে আলো করা হল।

আবার একপ্রস্থ চা-জলখাবার এল।

আমরা জলখাবার ফিরিয়ে দিয়ে শুধু চা-ই খেলাম। ঘরের বড় বড় খোলা জানলা দিয়ে বসন্তের মৃদু সমীরণ আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল।

সারাদিনের পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করতে বিছানায় দেহ এলিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল অজয়।

আমি আর একা বসে থেকে কী করি? ফুটপাথের সস্তা কয়েকটি বই একপাশে রাখা ছিল, সেগুলো নাড়াচাড়া করতে-করতেই ঘরের দেওয়ালে চিত্র দেখতে লাগলাম।

এমন সময় হঠাৎই যা দেখলাম, তাতে বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। আমার চোখ দুটো যে ধন্য হল তা নয়। বুকের ভেতরটাও কেঁপে উঠল যেন!

আমি দেখলাম, এক অষ্টাদশী তরুণী আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে দ্রুতপায়ে ছাদে উঠে গেল। লণ্ঠনের স্বল্পালোকে তার যে রূপ দেখলাম তাতে অভিভূত হয়ে গেলাম। এই মেয়ে যদি অজয়ের বউ হয় তা হলে ওর চেয়ে ভাগ্যবান এ জগতে আর কেই বা হতে পারে? শুধু তাই নয়, অর্ধেক রাজত্ব সহ রাজকন্যা পাওয়ার মতো ব্যাপার। অর্ধেক রাজত্ব বলছি এই কারণে যে, ভদ্রলোকের এক ছেলে এক মেয়ে। কাজেই বিশাল সম্পত্তির ভাগ ও পাবেই। তার ওপরে অমন একটি সোনার প্রতিমা। এই মেয়েকে দেখতে এসে 'না' বলে ফিরে যাওয়ার কোনও কারণই নেই। অতএব বিয়ে এখানে পাকা। কাল সকালে সামনা-সামনি বসে মেয়ে দেখেই আমার মতামতটা জানিয়ে দেব আমি।

মেয়েটি অনেকক্ষণ ওপরে গেছে। কিন্তু নামার আর নাম নেই। এতক্ষণ ছাদে উঠে কী করছে ও?

আমি তাই একাকিত্ব কাটাবার জন্য এবং বন্ধুর ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে একটু আলাপ করবার জন্য নিজেই ওপরে উঠলাম। কিন্তু কোথায় কে? কেউ তো নেই ছাদে।

আমার কেমন যেন রহস্যময় মনে হল ব্যাপারটা।

আমি ছাদ থেকে নেমে এলাম।

রাত প্রায় দশটা নাগাদ খাওয়ার ডাক পড়ল আমাদের। সে কী এলাহি ব্যাপার! যেন সত্যিকারের জামাই আদর শুরু হয়ে গেল। এমন আতিথেয়তা আমরা এর আগে কখনও কোথাও পাইনি।

যাই হোক, সে রাতটা বেশ আনন্দেই কাটল।

পরদিন সকালে চা-পর্বের পর মেয়ে দেখার পালা। কিন্তু এ কী! এ কাকে দেখছি? সেই মেয়ে তো নয়। মেয়েটির গায়ের রং ফর্সা। স্বাস্থ্যও ভাল। মুখশ্রীও মন্দ নয়। তবে অপূর্ব সুন্দরী তাকে কোনওমতেই বলা যায় না। আমরা দেখলাম। দু'-একটা কথাও বললাম। ভালই লাগল। আমাদের মেয়ে দেখা হলে মেয়েটিকে বিদায় নিতে বললাম।

মেয়েটি চলে গেলে দু' বন্ধুতে ফিসফিস করে আলোচনা করলাম মেয়েটির ব্যাপারে। আমি বললাম, "মেয়ের ব্যাপারে ওর বাড়ির লোক কিছু জিজ্ঞেস করলে কী বলব?" অজয় বলল, "হ্যাঁ করে দে। এর আগে অনেক মেয়ে দেখেছি। এতটা চোখে ধরেনি। এই মেয়েটি খুব একটা সুন্দরী না হলেও সুলক্ষণা। তা ছাড়া এমন শ্বশুরবাড়ি আমি ছাড়ছি না।"

আমার চোখে তখন সেই মেয়েটির মুখ ভাসছে। কে ওই মেয়ে! এ বাড়িতে অজয়ের বিয়ে হলে আমার তো আসা-যাওয়া থাকবেই। তখন না হয় আমিই নিজের জন্য একটু চেষ্টা করে দেখব। কেননা মেয়েটাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

মেয়ে দেখা শেষ হলে বিদায় নেওয়ার পালা।

আসবার সময় আমাদের মতামত আমরা জানিয়ে এলাম। পাকা কথা পেয়ে বাড়িতে যেন উৎসবের বন্যা বয়ে গেল।

দিন পনেরোর মধ্যেই অজয়ের বিয়েটা সম্পন্ন হয়ে গেল। বিয়ের দিন বর নিয়ে যখন এলাম তখন থেকেই আমি একভাবে খুঁজতে লাগলাম সেই মেয়েটিকে। একবার যদি দেখা পাই তো ওর পরিচয় জেনে ওর সঙ্গে আলাপ করে আমার ইচ্ছার কথাটা জানাব। কিন্তু না। এই বাড়ির অসংখ্য লোকজনের মধ্যে তাকে আমি আর দেখতে পেলাম না।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি একসময় ছাদে উঠে একটু নির্জনতা খুঁজতে এলাম। এসেই অবাক! দেখি মেয়েটি বিয়ের কনের মতো সাজগোজ করে খোঁপায় ফুল গুঁজে ছাদের আলসেটা ধরে ঝুঁকে পড়া একটা চাঁপাগাছের ঘন পাতার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি অনেক আশা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে যেতেই মেয়েটি একবার আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

তা যাক। তবু এতক্ষণে ওর দেখা যে পেয়েছি, এই ঢের। এই মেয়ে যদি আমাকে পছন্দ করে তবে আমি বিনা পণে ওকে বিয়ে করব, এই সংকল্প করলাম।

ও নীচে নেমে এলে আমিও নেমে এলাম। আবার শুরু হল খোঁজার পালা। কিন্তু কোথায় যে লুকলো সে, তা কে জানে? আর তাকে দেখতেই পেলাম না।

বিয়ের আসরে বসে অজয় আমাকে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, "তোর কী ব্যাপার বল তো? সেই তখন থেকে দেখছি হঠাৎ যেন কীরকম হয়ে গেছিস তুই। ব্যাপারটা কী তোর?"

এর আগে আমি ওই মেয়েটির কথা একবারও বলিনি অজয়কে। এইবারে সব বললাম।

অজয় বলল, "ব্যস্ত হোস না। আমার বিয়েটা চুকতে দে। তারপর আমিই ঘটকালিটা করে দিচ্ছি তোর। দু' বন্ধুতে একই পরিবারের মেয়ে বিয়ে করব, এ তো খুব আনন্দের কথা। দু' বন্ধুতে একসঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে আসা যাওয়া করব এর চেয়ে সুখের আর কিছু কি আছে?"

আমি বললাম, "তুই যদি সত্যিই এই যোগাযোগটা করে দিতে পারিস, তা হলে তোর বন্ধুত্বের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।"

অজয়ের কাছ থেকে আশার আলো পেয়ে মনটা ভরে উঠল আমার। কী ভাগ্যিস, এই মেয়েটির সঙ্গেই অজয়ের বিয়েটা হয়ে যায়নি। তা হলে অবশ্য আমার কোনও আশা থাকত না। ও সারাজীবন আমার বন্ধুপত্নী হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্রী হয়েই থাকত।

অজয়ের বিয়ের লগ্ন ছিল মধ্যরাত্রে। অজস্র হুলুধ্বনির সঙ্গে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সম্পন্ন হল বিয়েটা। কিন্তু এই বিয়ের বাসরে সে কই?

খাওয়াদাওয়ার পর আমি অন্যান্য বন্ধুদের নজর এড়িয়ে ছাদে গেলাম। ছাদে গিয়েই দেখি, অবাক কাণ্ড! মেয়েটি সেই আগের মতোই ছাদের আলসের ধারে সেই চাঁপাগাছটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

আমি কাছে যেতেই মেয়েটি আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে নতবদনে চলে গেল আমার পাশ কাটিয়ে। আমার তখন বেজায় সাহস। আমি নিজে থেকেই মেয়েটিকে ডাকলাম, "শুনুন।"

মেয়েটি ভ্রূক্ষেপও করল না, ফিরেও তাকাল না আমার দিকে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। আমি ওকে অনুসরণ করেও আর ওকে দেখতে পেলাম না। তাই তো, গেল কোথায় মেয়েটা?

সে রাতও অজস্র হইহুল্লোড়ের মধ্যে কাটল। কত গানবাজনা হল। কিন্তু সেই মেয়ের আর দেখা পাওয়া গেল না।

পরদিন সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। মেয়ের বাবা-মা আমার দুটি হাত ধরে বারবার বলতে লাগলেন, "আমাদের বড় আদরের মেয়ে বাবা। দেখো যেন কষ্ট দিয়ো না। ও কোনও অন্যায় করলে ওর দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ো।"

আমি বললাম, "এই ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। অজয় সত্যিই ভাল ছেলে। ওর বাবা-মায়েরও তুলনা নেই। মেয়ে আপনাদের সুখেই থাকবে।"

ওর জ্যাঠামশাই জেঠিমা আমাকে ওঁদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, "তোমার বন্ধুর সঙ্গে তুমিও মাঝে মাঝে এসো বাবা। যেন ভুলে যেও না। সময় সুযোগ পেলেই চলে এসো। ওকে একটু দেখো। এই বাড়িতে ও-ই এখন একমাত্র মেয়ে।"

"এর আগে আর কেউ ছিল বুঝি এ বাড়িতে?"

জেঠিমা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার মেয়ে মালতী ছিল।"

"সে এখন কোথায়? তার বিয়ে হয়ে গেছে বুঝি?"

জ্যাঠামশাই চোখের জল মুছে বললেন, "সে নেই।"

এই 'নেই' কথাটার অর্থ বুঝতে আমার খুব একটা দেরি হল না। বললাম, "কতদিন হল?"

"এখনও বছর ঘোরেনি বাবা। মা আমার—।"

জেঠিমা বললেন, "অমন মেয়ে কালেভদ্রে জন্মায় বাবা। কী রূপ তার! যেমন চোখমুখের গড়ন, তেমনই গায়ের রং, ওই দ্যাখো না দেওয়ালের গায়ে সে কেমন ছবি হয়ে আছে।

বিয়ের কথাবার্তাও সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই সন্ধেবেলায় চাঁপাফুল তুলতে গিয়ে সাপকাটি হল। এক ছোবলেই শেষ। কেউটের ছোবল বাবা।"

ছবির দিকে তাকিয়েই আমি স্থির। এ তো সেই মেয়ে। যাকে ঘিরে আমি এত স্বপ্ন দেখছি। যে আমাকে একবার করে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বিজ্ঞানের যুগে এও কি সম্ভব? তবে সেই শেষ। অজয়ের শ্বশুরবাড়িতে আমি আর কখনও যাইনি।



সাত নম্বর ঘর

আমি তখন সবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি। সেই সময় একবার আমরা দু'জন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম বিষ্ণুপুর বেড়াতে যাব। বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের স্থাপত্য এবং মন্দিরের টেরাকোটার কাজ দেখার শখ ছিল বহুদিনের। বিষ্ণুপুর তখন এখনকার মতো এত জমজমাট ছিল না। রেল স্টেশনের কাছে একটা দোতলা হোটেল ছিল। এখন সেটা আছে কিনা জানি না। হোটেলের মালিকের নাম ছিল পঞ্চানন সাধুখাঁ। অমায়িক ভদ্রলোক। একটা ডবল বেডের রুমের ভাড়া ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। আর পেটভরে ডাল ভাত মাছ তরকারি খেলে লাগত এক টাকা চার আনা। তখন তো এখনকার মতো এত বাসের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই আমরা চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে চেপে শেষ রাতে বিষ্ণুপুরে যখন নামলাম তখন ঘন অন্ধকার। সময়টা বোধ হয় কার্তিকের শেষ, কাজেই একটু ঠাণ্ডার আমেজও ছিল। যাই হোক, শেষ রাতের সেই অন্ধকারে আমরা পায়চারি করতে করতে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

আমরা যখন এইভাবে পায়চারি করছি তখন কোথা থেকে একটি বেঁটেখাটো ঘাড়ে গদ্দানে লোক এসে জিজ্ঞেস করল আমাদের, "বাবুরা কোত্থেকে আসছেন?"

"আমরা আসছি হাওড়া থেকে।"

"বিষ্ণুপুর বেড়াতে এসেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় উঠবেন কিছু ঠিক করেছেন?"

"না। আগে সকাল হোক, তারপর দেখা যাবে।"

লোকটা এবার উৎসাহিত হয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, "স্টেশনের সামনে আমাদের হোটেল আছে। ভাল হোটেল। যদি দয়া করে পায়ের ধুলো দেন তো ধন্য হই। জল কল বাথরুমের সবকিছুরই ব্যবস্থা ভাল। এমন হোটেল এ অঞ্চলে দুটি নেই।"

আমরা দু'জনে একবার পরস্পরের চোখের দিকে তাকালাম। তারপর বললাম, "স্টেশনের সামনে বলতে কি একেবারেই সামনে, না একটু যেতে হবে?"

"একটুও যেতে হবে না। ওই দেখা যাচ্ছে। একেবারে রাস্তার উলটো দিকে। চলুন না আমার সঙ্গে।"

আমরা ওর কথায় রাজি হয়ে ওর সঙ্গে স্টেশনের বাইরে এসে সেই হোটেলে ঢুকলাম।

হোটেলের মালিক পঞ্চাননবাবু তখন সবে চেয়ারটিতে এসে গুছিয়ে বসেছেন। আমরা গিয়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে ঘর চাইতেই উনি বেঁটেখাটো লোকটিকে বললেন, "যাও তো হে সিধু, বাবুদের ঘর দেখিয়ে দাও।"

হোটেলটি ছোট হোক, তবে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

আমরা সিধুর সঙ্গে দোতলায় উঠে প্রথম যে ঘরখানি দেখলাম সেটিকেই পছন্দ করলাম।

আমরা অবশ্য ঘরের ভেতরে ঢুকলাম না। বাইরে থেকেই দেখলাম। পরিপাটি বিছানা। সাজানো-গোছানো সুন্দর ঘর। দরজাটা হাট করে খোলা ছিল।

সিধু দরজাটা টেনে বন্ধ করে বলল, "চলুন, ওদিকের ঘর দেখাই।"

"কেন, এই তো একটা ভাল ঘর ছিল।"

"এ ঘরটা নয়। এটা সাত নম্বর ঘর। এটা একটু আগেই হয়ে গেছে। আপনাদের অন্য ঘর দেখাচ্ছি।"

আমার বন্ধুটির নাম গোরা। ভয়ানক একরোখা সে। বলল, "হয়ে গেছে মানে? এই ভোরে আমরাই তো প্রথম যাত্রী। তা ছাড়া এ ঘরে অন্য কেউ এলে তার কিছু মালপত্তর থাকবে। মালপত্তর না থাকলেও দরজাটা তো বন্ধ থাকবে? ঘরে লোক নেই, জন নেই দু'হাট করে দরজা খোলা, হয়ে গেছে বললেই হল?"

আমি বললাম, "তোমাদের যদি বেশি ভাড়ার দরকার হয় সে-কথা বললেই পারতে? আমরা কি দিতাম না?"

সিধু আমতা আমতা করে বলল, "না মানে, আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না তো? যাই হোক, ঘর যখন খালি তখন আপনারা ঢুকুন। আমার মনে হয় আমি যখন স্টেশনে গেছি সেই সময় ওরা হয়তো চলে গেছে।"

গোরা বলল, "সে যাক গে। আমাদের দরকার নেই। এই ঘরই আমাদের পছন্দ। এই ঘরেই আমরা থাকব। তুমি যাও, এখন চটপট আমাদের জন্য দু' কাপ চা নিয়ে এসো দেখি?"

সিধু চা আনতে নীচে চলে গেল।

একটু পরেই শুনতে পেলাম পঞ্চাননবাবুর গলা, "ওই ঘরটা কে খুলল, কে?"

"তা জানি না বাবু। ও ঘর তো খোলাই হয় না। সবসময় তালা দেওয়া থাকে। বাবুদের নিয়ে ওপরে উঠেই দেখি দরজা একেবারে দু' হাট করে খোলা।"

পঞ্চাননবাবু বললেন, "ছোঁড়া দুটো কি ওই ঘরেই থাকতে চায়?"

"হ্যাঁ।"

এর পর চুপচাপ। আমরা বিছানায় আধশোয়া হয়ে সবই শুনলাম। একটু পরেই সিধু এসে চা দিয়ে গেল।

আমরা চা খেতে খেতে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। বাইরে তখনও অন্ধকার। একটি দুটি করে পাখির ডাক কানে আসছে তখন। খুব ভাল লাগল পরিবেশটা।

চা খাওয়া শেষ করে গোরা বলল, "যাই, বাথরুমের কাজটা সেরে আসি এবার। আমি এলে তুই যাবি।" এই বলে গোরা বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। অ্যাটাচড বাথ। কিন্তু এ কী! বাথরুমের দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখল দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

গোরা একটু রাগী প্রকৃতির ছেলে। সে দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই কে আছ ভেতরে? শিগগির বেরিয়ে এসো।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে ভিজে শাড়ি পরা এক তরুণী চকিতে দরজা খুলে গোরার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেই চোখের পলকে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

আমরা দু'জনে হতভম্ব।

এ কী রে বাবা!

এতক্ষণ রয়েছি এখানে অথচ ওর কোনও অস্তিত্বই বুঝতে পারিনি? অবশ্য এমনও হতে

পারে আমরা রয়েছি বলেই ভেতরে ঢুকে অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়েছিল সে। লজ্জায় বেরোতে পারছিল না। কিন্তু যদি না গোরা বাথরুমে যেত? যদি আমরা চা খেয়েই দরজায় তালা দিয়ে বাইরে যেতাম, তা হলে? তা হলে কী করত বেচারি? যাই হোক, আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা বাথরুমের কাজ সেরে যখন পোশাক পালটালাম তখন অন্ধকার দূর হয়ে ভোর হয়ে গেছে। চারদিকের প্রকৃতি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাখির ডাক আরও বেশি করে শোনা যাচ্ছে তখন। জানলার ফ্রেমে লাল মাটির প্রান্তর আর ঘন সবুজের শোভা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

আমরা ঘরে তালা লাগিয়ে বাইরে এলাম। তারপর একটা সাইকেল রিকশা ভাড়া করে গোটা বিষ্ণুপুর ঘুরে দেখব ঠিক করলাম। রিকশাওয়ালা তিন টাকার বিনিময়ে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাতে রাজি হল। আমরা মাঝেমধ্যে তাকে জলখাবার খাওয়াতে লাগলাম।

প্রথমেই আমরা মদনমোহন মন্দির দেখলাম। তারপর রাসমঞ্চ, দলমাদল কামান, লালদিঘি হয়ে গভীর বনের ভেতর গেলাম বিষ্ণুপুরের নূরজাহান লালবাঈ-এর নতুন মহলের ধ্বংসস্তূপ দেখতে। আমরা নতুন মহলের চারদিক ঘুরে দেখতে দেখতে পেছন দিকের বাগানে এসে অবাক হয়ে গেলাম। সেখানে ঘন ঘাসের ওপর শতরঞ্চি পেতে এক সুবেশা তরুণী টিফিন কৌটো খুলে খাবার ভাগ করছে। আমরা যেতে আমাদের চোখে চোখ পড়তেই হেসে বলল, "আপনারা কাল রাত্রে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে এসেছেন না?"

"হ্যাঁ। আপনি কী করে জানলেন?"

"আমরাও ওই গাড়িতে এসেছি। কোথায় উঠলেন? স্টেশনের সামনে ওই হোটেলে?"

গোরা বলল, "হ্যাঁ।"

তরুণী বলল, "আমরাও ওই হোটেলেই উঠেছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রথমে যে ঘর তাইতে। সাত নম্বর ঘর।"

"সে কী!"

"তারপর যেই না শুনেছি, এই ঘরে একবার একটা খারাপ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেই থেকে উপদ্রব হয়, অমনই পালিয়ে এসেছি ওখান থেকে। আমার স্বামীর আবার ভূতের ভয় খুব।"

গোরা আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আমি ওর হাতে টান দিলাম, "চল চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।" বলে বনের বাইরে এসে বললাম, "আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। ওই হোটেলে আমি আর ঢুকছি না ভাই। এবার বুঝতে পারছিস তো ভোরবেলা বাথরুম থেকে কে বেরিয়েছিল?"

গোরা চমকে উঠে বলল, "তাই তো! ওর কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম রে! ঠিকই তো। তবে আমরা হয়তো অহেতুক কল্পনা করছি। ও মেয়েটি ভূত না হয়ে মানুষও তো হতে পারে?"

আমার মন কিন্তু গোরার এই কথায় সায় দিল না। আমার ভূতের ভয় খুব। তাই ভয়ে বুক টিপ টিপ করতে লাগল আমার। আমরা বেশ বেলা পর্যন্ত চারদিক ঘুরে বেড়িয়ে স্নান খাওয়ার পর ঘরের দরজা বন্ধ করে তেড়ে একটা ঘুম দিলাম। বিকেলবেলা ঘুম থেকে

উঠে দেখলাম হোটেলের অন্যান্য ঘরে আরও অনেক যাত্রী এসেছে। দেখে খুব আনন্দ হল। আমরা চা-টা খেয়ে আশপাশের লোকেশানগুলো আরও একটু ঘুরে দেখতে চললাম।

সন্ধের পর হোটেলে ফিরে এসে রাতের খাওয়া খেয়ে অন্য ঘরের দু-একজন ভদ্রলোককে ডেকে এনে মেতে ওঠা হল জোর তাস খেলায়। আমি অবশ্য তাস খেলা জানতাম না। তাই শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়তে লাগলাম।

তাস খেলা শেষ হলে ওরা সবাই শুতে চলে গেলে আমরাও শয্যা গ্রহণ করলাম। তারপর আলো নিভিয়ে শুধুমাত্র ব্লু রঙের ডিমলাইট জ্বেলে রেখে দু'জনে শুয়ে শুয়ে ভোরের মেয়েটির কথা আলোচনা করতে লাগলাম।

গোরা বলল, "খুব ভুল হয়ে গেল। ভদ্রমহিলার মুখে এই ঘরের দুর্নাম শোনার পরও পঞ্চাননবাবুকে জিজ্ঞেস করা হল না তো ওই মেয়েটির কথা। মেয়েটি কে?"

আমি বললাম, "যেই হোক, আমাদের যা দেখার তা তো দেখা হয়ে গেছে। কাল সকালেই আমরা চলে যাচ্ছি। অতএব কিছুরই দরকার নেই আজ। কোনওরকমে রাতটা কাটাতে পারলে আর আমাদের পায় কে?"

রাত তখন কত তা কে জানে! হঠাৎ বাথরুমের ভেতর প্রচণ্ড একটা শব্দ। ঠিক মনে হল কে যেন একটা বালতিকে সশব্দে ফেলে দিল লাথি মেরে। অথবা শ্যাওলায় পা পিছলে বালতিসুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়ল কেউ।

সেই শব্দে আমরা দু'জনেই লাফিয়ে উঠে বসলাম। ডিমলাইটটা জ্বালাই ছিল। আমরা উঠে বসেই জোরালো আলোর সুইচটা অন করে দিলাম। আলোয় ভরে উঠল গোটা ঘর কী হল? ব্যাপার কী? উঠে বসেই শুনতে পেলাম বাথরুমের ভেতর কী যেন একটা ছটফট করছে।

আমি আতঙ্কে নীল।

গোরা উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজা ঠেলল। কিন্তু আশ্চর্য! দরজাটা সেই কালকের মতোই ভেতর থেকে বন্ধ।

গোরা সশব্দে ধাক্কা দিতে লাগল দরজায়, "কে আছ ভেতরে, শিগগির দরজা খোলো। খোলো বলছি।"

বাথরুমের ভেতর থেকে তখন নারীকণ্ঠের চাপা একটা আর্তনাদ ভেসে এল, "আঃ-আঃ-আঃ।"

আমরা দু'জনেই একসঙ্গে গায়ের জোরে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল দু'হাট হয়ে। আর তারপরেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে দু'জনেই শিউরে উঠলাম। দেখলাম বাথরুমের চৌবাচ্চায় ভর্তি জলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে এক তরুণী। ঘাড় মাথা জলের তলায়। অসহায় একটা হাত দেওয়াল ধরে আছে। পা দুটো বেঁকে মুড়ে স্থির। ক্ষীণ একটু রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে জলের স্রোতে। গোরা ছুটে গিয়ে তরুণীকে জল থেকে টেনে তুলতেই আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এ তো সেই। আজই দুপুরে লালবাঈয়ের নতুন মহলের বনের ভেতর যাকে দেখেছিলাম।

সে দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখতে পারলাম না আমরা। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বেরিয়ে এসে চেঁচামেচি করে হোটেলের সবাইকে ডেকে তুললাম। পঞ্চাননবাবুকে ডাকলাম। কিন্তু

কোথায় কী তখন? সব ফাঁকা।

আমাদের কথা শুনে পঞ্চাননবাবু বললেন, "কী আর বলি বলুন আপনাদের! এ ঘর তো আমি দিতে চাইনি। আপনারাই জোর করে নিলেন। বছর দুই আগে এক দম্পতি এখানে হানিমুনে এসেছিলেন। একদিন রাত্রে হঠাৎ এক দুর্ঘটনা হয়ে গেল। মহিলা মাঝরাত্তিরে বাথরুমে ঢুকেছিলেন। তারপর সম্ভবত পা পিছলেই হুমড়ি খেয়ে চৌবাচ্চায় পড়ে যান। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে লক করা ছিল। সেই থেকেই এই ঘরে কেউ থাকতে পারে না। আমরাও কাউকে ভাড়া দিই না। এটা সবসময় তালা দেওয়া থাকে। কিন্তু কাল ভোরে কে যে তালা খুলল—।"

যেই খুলুক, আমরা আর থাকিনি।

আমরা পঞ্চাননবাবুর টাকাপয়সা মিটিয়ে দিয়ে পরদিনই বিষ্ণুপুর ত্যাগ করেছিলাম।



সৈকত সুন্দরী

গোপালপুর অন সী। নাম শুনলেই অনেকের লালা ঝরে। আমার কিন্তু কেন জানি না খুব ভাল লাগেনি জায়গাটা। পুরী আমাকে যতখানি আকর্ষণ করে, ভারতের আর কোনও সমুদ্রতীর আমাকে সেভাবে আকর্ষণ করতে পারে না।

অবশ্য গোপালপুরের সমুদ্রতীর ভাল না লাগার আরও এক কারণ আছে। আমি যে সময় সেখানে গিয়েছিলাম তখন জায়গাটি ছিল একেবারেই সুনশান। সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস। মন্দির মসজিদ প্রসঙ্গ নিয়ে দেশ জুড়ে তখন রীতিমতো দাঙ্গা বেধে গেছে। যখন তখন কার্ফু হয়ে যাচ্ছে, সেই সময়। গোপালপুরে তখন বহিরাগত যাত্রীদের কেউ ছিলেন না।

যাই হোক, বিজওয়াড়া থেকে সারারাত ট্রেনজার্নি করে ভোরবেলা বেরহামপুরে নেমে লোক্যাল বাসে যখন গোপালপুরে এলাম, চারদিকে তখন আতঙ্ক আর আতঙ্ক। মানুষ ঘর থেকেও বেরোতে ভয় পাচ্ছে। ওই অসময়ে তখন আমিই বোধ হয় একমাত্র অতিথি। গোপালপুরে এসে খুঁজেপেতে সমুদ্রতীরে একটি লজে আশ্রয় নিলাম। লজের নামটা মনে পড়ছে না। তবে ব্যবস্থা ভাল ওদের। লজে মালপত্তর রেখে স্বাভাবিক নিয়মে বাইরে এলাম।

সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ বালুচরে আছড়ে পড়ছে। কী সুন্দর! সব সমুদ্রেরই একই রূপ। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। গোপালপুর এমনিতেই নির্জন জায়গা, তার ওপর এই পরিস্থিতিতে একেবারেই জনমানবহীন। বেড়ানোর জায়গায় নির্জনতা ভাল। তবে এইরকম নির্জনতা আবার গভীর বেদনাদায়ক। আমার বারবার মনে হত লাগল, বেড়াতে নয়, আমি যেন দ্বীপান্তরে এসেছি।

কোথাও কোনও খাবারের দোকান নেই কিনে খাওয়ার মতো। এককাপ চা পর্যন্ত নেই। সেসবের জন্য একটু দূরের বাজারে যেতে হবে। সেখানে গেলে অবশ্য পাওয়া যাবে সবকিছুই। আমি চায়ের নেশায় বাজারে গেলাম। শুধু চা নয়, চা-পর্বটাও সেরে নিলাম ওইসঙ্গে। দুপুরে স্নানের পর আহারের জন্য এইখানেই আসতে হবে আবার।

চা খেয়ে নির্জন সমুদ্রতীরে একা-একাই পদচারণা করতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম কেন যে এলাম গোপালপুরে! এর চেয়ে পুরী, চলে গেলেও ভাল হত। যাই হোক, এইভাবে অলস ভ্রমণে একসময় বিরক্তি ধরে গেলে ঠিক করলাম আজকের দিনটা এখানে নিঃসঙ্গভাবে কাটিয়ে কাল সকালেই পুরী রওনা হব। পুরীর কথা মনে হতেই লজে ফিরে এলাম। তারপর স্নানের জন্য তৈরি হয়ে আবার এলাম সমুদ্রতীরে। একা একা এই নির্জন সমুদ্রের ভয়ঙ্কর গর্জনে ভয় ধরে গেল স্নান করতে। তবু কোনওরকমে স্নানপর্বটা শেষ করে বাজারের হোটেলে এলাম দুপুরের খাওয়া খেতে। এখানে বেশ কিছু মানুষজনের দেখা মিলল। সবাই স্থানীয়। টুরিস্টের ভিড় নেই। ফলে দিব্যি মনের আনন্দে সুস্বাদু তরকারি ভাত মাছ খেয়ে নিলাম পেটভরে।

লজে ফিরে দুপুরবেলা তেড়ে ঘুম।

বিকেলে আবার সমুদ্রতীর, একজন ভ্রাম্যমাণ কফিওয়ালারও দেখা পেলাম। তার কাছ থেকে এক কাপ কফি খেয়ে সমুদ্রতীর ধরে এগিয়ে চললাম দূরের দিকে, কী করব একা একা বসে থেকে? বরং সময় কাটানোর জন্য একটু হাঁটা ভাল। ওই তো দূরে একটা লাইটহাউস দেখা যাচ্ছে। ওইদিকেই যাই।

জনহীন বালুচরে এ-বেলায় কিছু ধীবরের সাক্ষাৎ মিলল। তারা গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফিরছে সবে। মাছ খুব যে একটা পড়েছে তা নয়। তবু তাকে ঘিরেই ছেলে-বুড়ো অনেকের সমাগম।

আমি খানিকক্ষণ তাই দেখে আপনমনেই এগিয়ে চললাম। নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র এখন এক হয়ে গেছে। সন্ধ্যার সূর্য এখন অস্তাচলে। এক জায়গায় এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সেই অস্তরাগের ছটা দেখতে লাগলাম। সূর্য ডুবে যাওয়ার পরমুহূর্তেই দেখি এক তরুণী আমারই মতো নিঃসঙ্গ অবস্থায় সমুদ্রের কোল ঘেঁষে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে আমি যে পথ ধরে এসেছি সেই পথে।

তরুণীকে দেখে মন আমার আনন্দে ভরে উঠল। তা হলে এই গোপালপুরের সমুদ্রতীরে এখন আর আমি একা নই। আমি এদিক-সেদিক তাকিয়ে একমাত্র ওই তরুণীকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেলাম না। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর নির্জনে তরুণী কেন যে একাকিনী, তা কিছুতেই ভেবে পেলাম না।

যাই হোক, আমিও নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে ওঠার আশায় তরুণীকে অনুসরণ করে ফিরে আসাই স্থির করলাম। শুকনো বালি থেকে নেমে তাই ভিজে বালির পথ ধরলাম। মাঝে মাঝে সফেন ঢেউগুলো টুকরো টুকরো হয়ে তার অশান্ত স্রোতোধারায় আমারও পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিতে লাগল।

তরুণীর সাহস আমার চেয়েও বেশি। সে আরও নেমে সায়া শাড়ি বেশি করে ভিজিয়ে পথ চলতে লাগল। চলার গতিও বেশ দ্রুত। আমিও জেদের বশে ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলতে লাগলাম। একসময় খুব কাছাকাছি এসে বললাম, "আপনি একা বুঝি? এই নির্জনে এইভাবে একা আসতে আপনার ভয় করছে না?"

তরুণী তার চলার গতি না থামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। সেই তাকানোর মধ্যে এমন একটা বিরক্তির ভাব ছিল, যার অর্থ এই যে, গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসবেন না।

আমি মর্মাহত হয়ে ব্যবধান কমিয়ে দিলাম।

একসময় এসে থামলাম আমার সেই যাত্রা শুরুর কেন্দ্রস্থলে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম বাজারের দিকে। রাতের খাবার কিনেকেটে একসময় ফিরে এলাম লজে।

চারদিকে তখন লোডশেডিং চলছে।

টর্চের আলোয় পথ দেখে আমার ঘরের সামনে এসেই দেখি অন্ধকারে সেই তরুণী দূরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়।

আমি ওর পাশ কাটিয়েই আমার ঘরে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে মোমবাতিটা ধরালাম। তারপর সশব্দে বন্ধ করে দিলাম দরজাটা।

একটু পরেই টকটক শব্দ।

জানি, ও আসবে। এই অন্ধকারে আমার হাতের টর্চ অথবা একটা দেশলাই কাঠির

প্রয়োজন হতেই পারে ওর। কিন্তু আমি সাড়া দিলাম না।

আবার দরজায় শব্দ হল টক টক টক।

আমি দরজা খুলে দিতেই একটা জোরালো সামুদ্রিক বায়ু ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। দমকা হাওয়ায় নিভে গেল বাতির আলো। বাইরে কেউ কোথাও নেই। না তরুণী, না অন্য কেউ। তবে কি হাওয়ায় এইরকম শব্দ হচ্ছিল? তাই বা কী করে হবে? এখানটা তো ঘেরা। সেরকম হাওয়াও তো নেই। ওই একবারই যা দমকা বাতাস একটু ঢুকে পড়েছিল।

পরক্ষণেই আলো জ্বলে উঠল।

আমি অনেকক্ষণ ধরে জেমস হেডলি চেজের একটা বই পড়ে রাতের খাওয়া শেষ করে শয্যাগ্রহণ করলাম। ওই তরুণীর মিষ্টি অথচ রাগী মুখখানি বারবার আমার মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল।

রাত তখন কত, তা কে জানে?

দরজায় আবার টক টক শব্দ। ব্লু রঙের ডিমলাইটটা জ্বালাই ছিল। তাই উঠে বসে কান খাড়া করে রইলাম। আবার টক টক শব্দ।

আমি আলো জ্বেলে দরজা খুললাম।

সেই তরুণী। দেখলাম ছায়ান্ধকারে সে চকিতে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে গেল। এই লজে অ্যাটাচ-বাথ আছে কিনা জানি না, তবে আমারটা কমন। আমি মনে করলাম বাথরুমের দরজা ভেবে ও বোধ হয় ভুল করেই আমার দরজায় টোকা দিয়েছে। যাই হোক, আমি দরজা বন্ধ করে আবার শয্যাগ্রহণ করলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার আর ঘুম এল না। শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম শুধু। আর একভাবে ওই তরুণীর কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ও কি সত্যিই ভুল করে আমার দরজায় ধাক্কা দিয়েছে? না কি কোনও বদ উদ্দেশ্য আছে ওর! আমাকে একা পেয়ে হয়তো কোনও বিপদে ফেলতে চায়। যেহেতু মেয়েটি একা, তাই ওর ওপর এই সন্দেহটাই হল আমার।

খুব ভোরে আমি শয্যাত্যাগ করে চোখেমুখে জল দিয়ে টর্চ হাতে বাইরে এলাম। ইচ্ছেটা এই, নির্জন সমুদ্রতীরে পায়চারি করে সূর্যোদয় দেখব। তারপর এই হিমশীতল নির্জনতা ত্যাগ করে চলে যাব পুরীর দিকে।

সমুদ্রের বেলাভূমিতে না নেমে বিচ-এর পিচঢালা পথ দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ দেখি সেই তরুণীও আনমনা হয়ে একেবারে জলের ধার ঘেঁষে ধীরে ধীরে পথ চলছে। আমি এবার দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে সেই বেলাভূমিতে নেমে এলাম।

তরুণী দূর থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাকে।

আমি সম্মোহিতের মতো তরুণীর দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ কতকগুলো দেশি কুকুর বিকট চিৎকার করে আক্রমণের ভঙ্গিতে ছুটে গেল তরুণীর দিকে। আর তখনই অবাক বিস্ময়ে আমি দেখলাম, তরুণী একটুও ভয় না পেয়ে একটু একটু করে ঢেউ কেটে ছায়ামূর্তির মতো মিলিয়ে গেল সমুদ্রের জলে।

আমার তখন অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। আমি সংজ্ঞাহীন না হলেও দারুণ ভয় পেয়ে আবার এসে বড় রাস্তায় উঠলাম।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "বাবু, চা।" শিউরে উঠলাম আমি। এই আধো অন্ধকারে এ লোকটাও ভূত নয় তো? আমার হাত পা তখন ঠাণ্ডা হওয়ার উপক্রম।

অশরীরী

বর্ধমান সাহেবগঞ্জ লুপে গুসকরা নামে একটি স্টেশন আছে। ব্রিটিশ আমলে প্রথম যখন রেললাইন পাতা হয় এখানে—সেই সময়কার কথা। গুসকরা থেকে দশ-বারো মাইল দূরে এক গ্রামের নবগোপাল নামে এক ছেলে মিলিটারিতে চাকরি পেয়ে পাঞ্জাব অঞ্চলে চলে যায়। সেখান থেকেই মাসে মাসে মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠাত সে। চিঠিপত্র লিখত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইচ্ছে করলেই বাড়ি আসতে পারত না।

এ নিয়ে বাড়ির লোকেদের অভিযোগের আর অন্ত ছিল না! নবগোপালের বাবা ছিলেন, মা ছিলেন। নতুন বিয়ে করেছিল, তাই বউও ছিল। ভাইবোন এবং বাড়ির অন্যান্য লোকজন তো ছিলই।

এইভাবেই দিন কাটছিল।

নবগোপাল কিছুতেই বাড়ি আসার ছুটি আর পায় না। এদিকে বেশ কিছুদিন হল নবগোপালের বাড়ি থেকে চিঠি আসাও বন্ধ হয়ে গেল। নবগোপাল বুঝল বাড়ির লোকেরা তার দেশে না ফেরার জন্য রাগ করেই চিঠি লেখা বন্ধ করেছে। কেননা শেষ চিঠিতে বাবা লিখেছিলেন, 'আজ চার বছরেও যখন তুমি বুড়ো বাপ-মাকে একবার এসে দেখে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করলে না, নতুন বউমার জন্য যখন তোমার কোনও কর্তব্য আছে বলে মনে হচ্ছে না, তখন আমরা ধরে নিলাম নতুন পরিবেশে গিয়ে তুমি আমাদের ভুলে গেছ। শুধু মাসে মাসে টাকা পাঠালেই পরিবারের প্রতি কর্তব্যের শেষ হয় না। শ্রীশ্রী ভগবানের কৃপায় আমাদের বিষয়-সম্পত্তি কী আছে না আছে তা তোমার অজানা নয়। অতএব তোমার এই দান না পাঠালেও চলবে।'—এই চিঠি পাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই নবগোপালের মন কেঁদে উঠল। তারপর একদিন যখন সত্যি-সত্যিই মানিঅর্ডারও ফেরত এল তখন আর সে থাকতে পারল না।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে কাশ্মীর অঞ্চলে বদলি হয়ে যায় নবগোপাল। সেখানে গিয়ে সেনাবাহিনীর কিছু নতুন বন্ধুদের সাহায্যে উচ্চতর পর্যায়ে আবেদন করে বহুকষ্টে এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করাল এবং দেশে ফিরল। আসবার আগে একটা চিঠিও লিখল বাড়িতে। চিঠিতে লিখে দিল, অমুক দিন আমি গুসকরায় পৌঁছচ্ছি। স্টেশনে আবদুলকাকা যেন আমার জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে।

সেইমতোই নির্দিষ্ট তারিখে নবগোপাল যখন গুসকরায় ট্রেন থেকে নামল, রাত্রি তখন বারোটা।

ঘন অন্ধকারে স্টেশন এলাকা খাঁ খাঁ করছে।

দু-তিনজন মাত্র যাত্রী নামল ট্রেন থেকে।

নবগোপাল ভাবল, হয় বাড়ির লোকেরা ওর চিঠি পায়নি, নয়তো বাবা রাগ করেই গাড়ি পাঠায়নি। অথবা গাড়ি নিয়ে এসে ওর বিলম্ব দেখে আবদুলকাকা ফিরে গেছে। কেননা ও

শুধু আসবার তারিখটাই লিখেছিল। দিনে আসবে কি রাতে আসবে তা তো লেখেনি। কেননা তখনকার দিনে ওই দূর দেশ থেকে নির্দিষ্ট সময়সূচি নির্ধারণ করে ঠিক সময়টিতে আসা এত সহজ ছিল না। তাই স্টেশনে আবদুলকাকাকে না দেখে হতাশ হয়ে পড়ল সে।

নতুন স্টেশনমাস্টার নবগোপালকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, আপনি কারও জন্য অপেক্ষা করছেন নাকি?"

নবগোপাল বলল, "হ্যাঁ। আমার বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে লোক আসবার কথা ছিল। কেন এল না তাই ভাবছি। অথবা এসে ফিরে গেল কি না?"

স্টেশনমাস্টার বললেন, "না। এসে ফিরে যায়নি। কেননা আমি তো সবসময় এখানে আছি। আমি কোনও গাড়িকেই অপেক্ষা করতে দেখিনি।"

" তা হলে কি ওরা চিঠি পায়নি আমার?"

"তাই হবে। তা আপনার বাড়ি এখান থেকে কতদূর?"

নবগোপাল বলল, "অনেক দূর। দশ-বারো মাইল।"

"ওরে বাবা। তবে তো হেঁটে যাওয়াও চলবে না।"

"না। দিনমানে হলে যেতাম। এই রাত্রে কখনও নয়। ভূতের উপদ্রব আছে। চোর-ডাকাতের ভয় আছে। ঠ্যাঙাড়ের উৎপাত আছে।"

স্টেশনমাস্টার বললেন, "তা হলে এক কাজ করুন। আজ আর কোনও ট্রেন তো আসবে না। আমি অফিসঘরের চাবি দিয়ে আমার কোয়ার্টারে শুতে যাচ্ছি। আপনি বরং ওয়েটিংরুমে শুয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দিন। তারপর সকালে দেখি আপনার জন্য কী করতে পারি। যদি কারও গোরুর গাড়ি একটা পাই তো বলেকয়ে দেব।"

নবগোপাল বলল, "পেলে ভাল। নইলে হাঁটা দিতেও আমার আপত্তি নেই।" এই বলে সে ওয়েটিংরুমেই কাঠের বেঞ্চির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে ছারপোকার কামড় খেতে লাগল।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর সবে তন্দ্রাটি এসেছে, এমন সময়, "খোকাবাবু!"

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে উঠে বসল নবগোপাল, "আরে আবদুলকাকা!"

"কতক্ষণ এসেছেন আপনি?"

"তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হল। স্টেশনের বাইরে গাড়ি দেখতে না পেয়ে ভাবছিলাম তুমি আসোনি।"

"আসব না কী বলছেন? আপনার চিঠি পাওয়ার পর থেকে সবাই হানটান করছি। তবে গাড়ি তো আমি এখানে রাখিনি। গাড়ি ওই বাঁধের ওপর রয়েছে। আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু আপনি কখন আসবেন চিঠিতে তা লেখেননি! তাই এখানে জায়গা জোড়া না করে গাড়িটাকে বাঁধের ওপর রেখেছি। আমি ঠিক করেছিলুম লাস্ট ট্রেনটা দেখে তারপর ফিরে যাব। এই ভেবে গাড়িতে গিয়ে শুয়ে ছিলুম। কিন্তু এমন ঘুম এল যে, না ঘুমিয়ে থাকতে পারলুম না।"

নবগোপাল বলল, "ঠিক আছে। রাত যখন হল তখন রাতটা কাটুক। কাল একটু ভোর ভোর রওনা হওয়া যাবে।"

"সে কী খোকাবাবু? কর্তাবাবুর অবস্থা জানেন? মা, বউমা সবাই আপনার চিঠি পাওয়ার পর থেকেই ঘর-বার করছেন। রান্নাবান্না রেডি করেই আপনার জন্য পথ চেয়ে বসে আছেন সব।"

"কিন্তু আবদুলকাকা, পথঘাটের যা অবস্থা তাতে.. !"

"খোকাবাবু! আপনি কি ভুলে গেলেন, আমার নাম আবদুল। আমার শরীরে একফোঁটা রক্তও যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কারও সাধ্য আছে আমাদের কিছু করে? ওসব ভয় করবেন না খোকাবাবু, চলুন। উদো আর বুধোকে সঙ্গে এনেছি। গোরুর গাড়িকে আমি ঘোড়ার গাড়ির মতো ছোটাব।"

অতএব নবগোপাল আর দ্বিরুক্তি না করে আবদুলের সঙ্গে চলল।

আবদুল নবগোপালের সুটকেসটা মাথায় নিয়ে আগে আগে চলল। নবগোপাল চলল পিছু পিছু।

যেতে যেতে নবগোপাল দূর থেকেই দেখতে পেল সেই অন্ধকারে বাঁধের ওপর দুটো করে চারটে চোখ যেন ভাঁটার মতো জ্বলছে। চতুষ্পদ জন্তুদের চোখ রাত্রিবেলা জ্বলে। কিন্তু তাই বলে এইভাবে?

নবগোপাল কাছে যেতেই উদো আর বুধো গোরু দুটো বহুদিন পরে মনিবকে দেখে শিং নেড়ে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করল।

আবুদল বলল, "বাবু, গাড়িতে খড় বিছিয়ে গদির মতো করে আপনার বিছানা পেতে রেখেছি। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি জোর কদমে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি।"

নবগোপাল তাই করল।

দূরের ট্রেনভ্রমণে একেই সে ক্লান্ত ছিল, তার ওপর রাতও হয়েছিল অনেক। তাই গোরুর গাড়ির বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিল সে।

এদিকে আবদুল গোরুর গাড়ি নিয়ে বাঁধ থেকে মাঠের রাস্তা ধরল।

প্রথমটা বেশ একটু মন্থর গতিতে চলার পর গাড়ি এত জোরে ছোটাতে লাগল যে, ওর মনে হল ও যেন এখনও ট্রেনের মধ্যেই রয়েছে।

নবগোপাল ভয়ে ভয়ে বলল, "এ কী করছ! এইভাবে গাড়ি চালালে গাড়ি উলটে যাবে যে!"

আবদুল বলল, "কেন ঘাবড়াচ্ছেন খোকাবাবু? আমার নাম আবদুল। কোনও ভয় নেই আপনার। চুপচাপ শুয়ে থাকুন।"

নবগোপাল বলল, "না। আমার ভীষণ ভয় করছে।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

আবদুলের তখন জেদ চেপে গেছে। জোরে গাড়ি সে চালাবেই।

নবগোপাল বুঝতে পারল গোরুর গাড়ি এত জোরে ছুটছে যে, মাঝে মাঝে চাকা মাটি স্পর্শ করছে না। যেন হাওয়ায় উড়ে চলছে।

এইভাবে কিছুক্ষণ যাওয়ার পরই গ্রামে পৌঁছল ওরা। গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা খাল আছে। গোরুর গাড়িটা লাফিয়ে খাল পার হয়ে গেল।

নবগোপাল আর নবগোপালের মধ্যে নেই তখন। সে বুঝতেই পারল কার পাল্লায় সে পড়েছে। এখন ভালয় ভালয় বাড়ি পৌঁছলে হয়!

যাই হোক, গাড়ি এসে বাড়ির কাছে থামল। সাবেক কালের দোতলা মাঠকোঠা। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বেশ বড়সড়।

নবগোপাল গাড়ি থেকে নামলে আবদুল বলল, "অনেক রাত হয়ে গেল খোকাবাবু। আপনি ভেতরে যান। আমি গোরু দুটো গোয়ালে রেখে আসি।" এই বলে আবদুল চলে গেল।

ভীত সন্ত্রস্ত নবগোপাল দরজায় কড়া নাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে ওর মা-বাবা দু'জনেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

নবগোপাল প্রণাম করতে যেতেই বাবা বললেন, "থাক বাবা, তোমার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছি। কিন্তু এত রাত্রে তুমি কী করে এলে? তোমার আসার সময় জানতে না পারার জন্য আমি কোনও গাড়িই পাঠাইনি। জানি তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, কারও না কারও একটা গাড়ি ভাড়া নিয়েই আসবে। তবুও সারাদিন অপেক্ষা করে এই সবে শুয়েছি আমরা। এত রাতে এইভাবে আসাটা তোমার ঠিক হয়নি।"

নবগোপাল বলল, "আমাকে আবদুলকাকা নিয়ে এসেছে বাবা।"

"আবদুল! আবদুল নিয়ে এসেছে?"

"হ্যাঁ। আবদুলকাকা।"

"সে কী? ঠিক বলছ? আবদুল নিয়ে এসেছে তোমাকে? না অন্য কেউ?"

"না বাবা। অন্য কেউ নয়। আবদুলকাকাই নিয়ে এসেছে আমাকে। আমি কি ভুল দেখব?"

"কীসে এলে?"

"কেন, গোরুর গাড়িতে। উদো আর বুধো...।"

"থাক। আর বলতে হবে না। আবদুল আমাদের বহুদিনের পুরনো লোক। সে তার উপযুক্ত কাজই করেছে। তবে বাবা একটা কথা কী জানো? আবদুল আর বেঁচে নেই। উদো বুধোও না।"

"সে কী?"

"হ্যাঁ। যাক, ওসব কথা থাক এখন। পথে তোমার কোনও অসুবিধে হয়নি তো? রাত কিন্তু অনেক হয়েছে। এবার খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো। কেমন?" বলেই ডাক দিলেন, "বউমা!"

"যাই বাবা।" একগলা ঘোমটা দিয়ে নবগোপালের বউ এসে দাঁড়াল।

"নবুকে খেতে দাও।"

নবগোপাল হাত-মুখ ধুয়ে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর বউ ভাত-তরকারি ধরে দিলে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল সে। খেতে খেতে বলল, "ওরে বাবা! এতসব রান্না করলে কী করে?"

বউ নিরুত্তর।

নবগোপাল বলে, "অনেকদিন বাড়ি আসিনি বলে রাগ করেছ আমার ওপর? কিন্তু কী করব বলো। আমি কি ইচ্ছে করে আসিনি! আমি যে নিরুপায়।"

নবগোপাল দেখল বউয়ের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে।

যাই হোক, খাওয়া শেষ করে খাটের বিছানায় নবগোপাল শুয়ে পড়ল। ওর বউ পাশে বসে সযত্নে পাখার বাতাস করতে লাগল নবগোপালকে। সারাদিনের ক্লান্তির পর তৃপ্তির আহার এবং তার ওপর এই সুখশান্তির শয্যায় শোওয়ামাত্রই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল নবগোপাল।

ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে লোকজনের চেঁচামেচিতে। কে যেন নাম ধরে ডাকল, "নবা! এই নবা!"

ঘুম ভাঙতেই নবগোপালও হকচকিয়ে গেল। দেখল অর্ধভগ্ন ঘরে অপরিচ্ছন্ন ধূলি

ধূসরিত খাটের ছেঁড়া বিছানায় সে শুয়ে আছে। ঘরের চারদিকে ঝুল, মাকড়সার জাল। হতচকিত নবগোপাল জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওর পরিচিত লোকজনেরা পাশের মাঠ থেকে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "নবা, তুই! তুই কখন এলি?"

নবগোপাল জড়ানো গলায় বলল, "কাল রাত্রে।"

"ঠিক আছে। তুই ওখানেই থাক। আমরা গিয়ে তোকে নিয়ে আসছি।" এই বলে সকলে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে নবগোপালকে বাইরে নিয়ে এল।

নবগোপাল কান্নাধরা গলায় বলল, "আমার ঘরবাড়ির এরকম অবস্থা কেন? আমার মা বাবা, আমার ভাইরা, আমার বউ কোথায়?"

সবাই বলল, "তুই কি কিছুই বুঝতে পারছিস না?"

"না। আমার গা-মাথা ঘুরছে। ওরা যে কাল রাতেও এ বাড়িতে ছিল।"

"ওরা কেউ ছিল না রে পাগল, কেউ ছিল না। কাল রাত্রে যাদের দেখেছিস তারা ওদের প্রেতাত্মা। বেশিদিন নয়, মাত্র ছ'মাস আগে কলেরার মহামারিতে সব শেষ হয়ে গেছে। আমরা এই সামান্য ক'জন ছাড়া গোটা গ্রামই উজাড় হয়ে গেছে প্রায়। তোদের বাড়ির কেউই বেঁচে নেই। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি তোকে খবর দেওয়ার। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা না থাকায় চিঠি দিতে পারিনি।"

নবগোপাল সব শুনে ডুকরে কেঁদে উঠল একবার। তারপর গত রাত্রের ঘটনার কথা সবাইকে বলে দিন-দুই গ্রামে থেকে আবার কর্মস্থলে ফিরে গেল।



অবিশ্বাস্য

শিবপুর শ্রীদুর্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে শ্রাবণ মাসের এক সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে আটকা পড়ে আমরা কয়েকজন জোর তর্কে মেতে উঠেছিলাম। তর্কের বিষয়বস্তু ছিল ভূত। আমাদের মধ্যে একদল ছিল ভূতের স্বপক্ষে। এবং একদল ছিল বিপক্ষে। বিপক্ষদের মতে, ভয় থেকেই ভূতের জন্ম। ভূত আসলে কল্পনার আতঙ্ক ছাড়া কিছু নয়। ভূতের কোনও অস্তিত্বই নেই।

আলোচনার ঝড় যখন তুঙ্গে উঠেছে তখন সম্ভ্রান্ত চেহারার এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, যিনি আমাদেরই মতো পথচারী এবং দোকানে বসে ছিলেন, বললেন, "দেখুন, আপনাদের কথায় আমার নাক গলানো উচিত নয় যদিও, তবুও বলছি ভূত আপনারা কেউ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ভূত আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে উঠল, "তার আগে বলুন আপনি নিজে কখনও ভূত দেখেছেন কি না?"

"না। তার কারণ আমরা যে যুগের মানুষ সে যুগে ভূতের দেখা আর কখনও হয়তো কেউ পাব না। কিন্তু এমন একটা দিন ছিল যেদিন ভূতের উপদ্রবে মানুষে সন্ধের পর ঘর থেকে বেরোতে পারত না।"

"সেইসব ভূতেরা তা হলে গেল কোথায়?"

"উদ্ধার হয়ে গেছে। আসলে সব মানুষ মরেই যে ভূত হয় তা তো নয়। বিশেষ তিথি নক্ষত্রের অবস্থানে মানুষের অপঘাত মৃত্যু হলেই মানুষ সাধারণত প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এইরকম আত্মারা উদ্ধার হতে না পারলেই অযথা মানুষের আশপাশে উদ্ধারের আশায় অথবা নিজেদের দলভুক্ত করার জন্য ঘুরঘুর করে।"

একজন বলল, "তাই যদি হয়, তা হলে মানুষ তো অপঘাতে মরে এখনও ভূত হতে পারে। এখন যে হারে খুন-জখম চলছে তাতে সেইসব মানুষরা তো সবাই ভূত হয়ে উপদ্রব করতে পারত। কিন্তু করছে না কেন বলুন?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হেসে বললেন, "দেখুন, ওইসব মানুষদের কেউ কেউ যে ভূত হচ্ছে না বা হবে না, এমন কথা তো আমি বলিনি। তবে কিনা যেকালে মানুষ মরে ভূত হত সেকালে এত গয়ায় যাওয়ার ধুম ছিল না। কেননা ইচ্ছে থাকলেও মানুষ যেতে পারত না সহজে। কিন্তু এখন ট্রেন, বাস ইত্যাদির দৌলতে দলে দলে মানুষ গিয়ে শ্রীহরির পাদপদ্মে পিণ্ডদান করে প্রেতাত্মার উদ্ধার করে আসছে। কাজেই ভূতের দেখা আজকাল আর পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও ছিটকে-ছাটকে এইসব ব্যাপারগুলো কোথাও যে ঘটছে না তার খবরই বা কে রাখে বলুন?"

"তা হলে আপনার মতে ভূত এখন না থাকলেও একসময় ছিল? এবং ভূত আপনি বিশ্বাস করেন?"

"হ্যাঁ। আমার ধারণায় ছিল। যেমন, একটা ঘটনার কথা আমি বলছি। ঘটনাটা আমার

পিতৃদেবের মুখ থেকে আমি শুনেছিলাম। অন্য কারও মুখ থেকে শুনলে হয়তো অবিশ্বাস করতাম। কিন্তু বাবাকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না!"

আমাদের বিপক্ষ দলটি এবার একটু নরম হয়ে একটি নতুন ঘটনা শোনবার জন্য আগ্রহী হয়ে বলল, "এটা আপনার বাবার জীবনেই ঘটেছিল?"

"হ্যাঁ। তিনি ঠিক যেভাবে গল্পটা বলেছিলেন আমিও ঠিক সেইভাবেই আপনাদের বলছি। শুনতে তা হলে ভাল লাগবে।"

আমরা সবাই তর্ক-বিতর্ক বন্ধ রেখে একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগলাম।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন:

একশো বছর আগে হাওড়া শহর কিন্তু শহর ছিল না। চারদিকে বনজঙ্গল। মাঝেমধ্যে দু-একটি কোঠাবাড়ি—এই ছিল। মধ্য হাওড়ায় এইরকম একটি বাড়ি ছিল। সে বাড়িটাকে সবাই ভূতের বাড়ি বলত।

আমার বয়স তখন কুড়ি-বাইশ বছর হবে। আমি ছিলাম অত্যন্ত সাহসী এবং ডাকাবুকো। ভূত বিশ্বাস করা দূরের কথা, ভূতের নামে জ্বলে যেতাম। আমার বন্ধুরা কিন্তু একেবারে আমার বিপক্ষে ছিল। একবার আমি তাদের সঙ্গে বাজি ধরে ওই ভূতের বাড়িতে রাত কাটাবার কথা ঠিক করলাম। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, হাওড়া শহরে শিবপুর অঞ্চলে সেকালে আমরা অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলাম। কাজেই আমাকে ঘিরে যেসব বন্ধুবান্ধবের দল ছিল তারা সবসময়ই একটু স্বার্থ নিয়ে থাকত। এই অজুহাতে তারা আবদার ধরল, যদি আমি ওই বাড়িতে একা এক রাত্তির বাস করতে পারি তা হলে ওরা আমাকে দমভর খাওয়াবে। আব যদি আমি ভূত দেখে ভয় পাই বা রাত্রিবাস করতে না পারি তা হলে আমি ওদেব দমভর খাওয়াব। তবে এ ব্যাপারে ওদের কিন্তু দৃঢ় ধারণা ছিল যে ও বাড়িতে রাত্রিবাস করতে আমি কিছুতেই পারব না। এবং ওদের ভাগ্যেই জম্পেশ ভোজটা হবে।

যাক। কথামতো কাজ শুরু হল।

প্রথমেই আমি বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাড়িটা একবার ভাল করে দেখে এলাম। বড় রাস্তার গায়েই বাড়িটা। তখন রাস্তায় পিচ পড়েনি। চওড়া মাটির রাস্তা ছিল। এখন এই রাস্তাটির নাম হয়েছে নেতাজি সুভাষ রোড। তখন এটি রামকৃষ্ণপুর গ্রামের অন্তর্গত ছিল। যাক, বাড়িটা পুরনো, অব্যবহৃত এবং দোতলা। বাড়ির পেছনে পাঁচিলঘেরা বাগান। সামনেও পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এরই একপাশে একখানি টালির ঘর। এই ঘরটিতে রঘুয়া নামে একজন হিন্দুস্থানি দরোয়ান থাকত। বাড়ির মালিক থাকতেন দ্বাবভাঙায়। তাঁর নাম ভবতারণ বসু। প্রতি মাসে তিনি দশ টাকা মানিঅর্ডার পাঠাতেন রঘুয়ার নামে। রঘুয়া বাড়ি দেখাশোনা করত—যদিও বাড়ির ভেতর ঢুকত না। এবং তার সেই টালির ঘরে আরও দু-একজন দেশোয়ালি ভাইকে ডেকে এনে রাত কাটাত, তবুও দশটি টাকার লোভে এই বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব সে নিয়েছিল। যাক, আমরা এসে রঘুয়াকে দিয়ে বাড়ির তালা খুলিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ঘরগুলি ঘুরেফিরে দেখলাম। ওপরে উঠলাম। সিঁড়ির একাংশ ভাঙা। তাই মই দিয়ে উঠলাম। বহুদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে বাড়ির জানলা দরজাগুলোও সব এঁটে রয়েছে দেখলাম। সবকিছু দেখেশুনে ওই বাড়িতে আমি এক রাত থাকব এবং আমার বন্ধুরা রঘুয়ার ঘরে থেকে আমাকে পাহারা দেবে এই ঠিক করে চলে এলাম।

এই ব্যাপারে প্রথমেই আপত্তি জানালেন আমার বাবা। শুধু বাবা কেন, বাড়ির প্রায় সবাই

বাধা দিলেন, আমার এই গোঁয়ার্তুমি রোধ করবার জন্য। সবাই বললেন, "ভূত মানো না মানো আমাদের কথাটা অন্তত মানো। ওসব করতে যেয়ো না।"

আমি কিন্তু কারও কথাই শুনলাম না। কেননা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে পুনরায় মত পরিবর্তন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একে তো ভয় কাকে বলে জানতাম না, তার ওপর শরীরে শক্তিও ছিল খুব। বিশেষ করে আরও যেটা ছিল সেটা হল ভূত আছে কি নেই এ ব্যাপারে দারুণ কৌতূহল। কাজেই আমিই বা সহজে পিছপা হব কেন? অতএব কারও কোনও কথা না শুনে আমার জেদই আমি বজায় রাখলাম।

নির্দিষ্ট দিনে দল বেঁধে বেলাবেলি সেই বাড়িতে এসে হাজির হলাম আমরা। তখন গ্রীষ্মকাল। তাই ছাদে শুয়ে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলাম। রঘুয়ার খাটিয়াটা ম্যানেজ করেছিলাম। সঙ্গে ছিল একটি শতরঞ্চি, একটি মশারি ও একটি টর্চ। কিন্তু মুশকিল হল খাটিয়াটাকে ওপরে ওঠানো নিয়ে। একে তো সিঁড়িই ভাঙা, তার ওপর দোতলার দরজার পরিস্থিতি এমনই যে, সেটাকে না ভেঙে সেখান দিয়ে খাটিয়াটাকে ওপরে ওঠানো একেবারেই অসম্ভব।

আমাদের ভেতর থেকে দু'জন তখন মই লাগিয়ে ওপরে উঠে ছাদে গেল। তারপর সেখান থেকে দড়ি ঝুলিয়ে দিতে আমরা খাটিয়াটাকে বেঁধে দিলাম । এরা তখন সেই অবস্থাতেই অনায়াসে খাটিয়াটা তুলে নিল।

রঘুয়াও অবশ্য এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করল খুব। তবে সে এ-কথাও বলতে ছাড়ল না, "কেন এরকম বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন বাবু? আমি নিজে দেখেছি ভূত আছে। কখনও ঘরের ভেতর আলো জ্বালে, কখনও ছাদে পায়চারি করে। কখনও বাগানের ভেতর থেকে চিৎকার করে কাঁদে। এসব তো মিথ্যে নয়।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। দেখিই না একবার পরীক্ষা করে। আমার বন্ধুরা তোমার ঘরে সারারাত থাকবে। যদি ভয় পাই তা হলে চেঁচিয়ে ডাকব তোমাদের।"

রঘুয়া বলল, "হ্যাঁ বাবু, তাই ডাকবেন। তবে জোর করে যেন কোনও কিছু করতে যাবেন না ওদের সঙ্গে। কেমন?"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ছাদে উঠে খাটিয়ার পায়ায় চারটে ডগলা বাঁশ বেঁধে মশারি খাটিয়ে নিলাম। তারপর শতরঞ্চি বিছিয়ে শোওয়ার ব্যবস্থাটা পাকা করে বসে রইলাম গ্যাঁট হয়ে। বন্ধুরা ছাদ থেকে নেমে সব দরজাতে তালা দিয়ে নীচে বসে রইল।

আমি ছাদে পায়চারি করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলাম ওদের সঙ্গে। রাত দশটার পর ওরা রঘুয়ার ঘরে শুতে ঢুকল। আমি একা ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম ছাদময়।

চারদিকে গাছপালা। দূরে বনজঙ্গল। মাঝেমধ্যে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। ভরা অমাবস্যার রাত। কিন্তু যার জন্য অপেক্ষা করছি সে কোথায়? কোথায় ভূত? আমি সতৃষ্ণ নয়নে গাছপালাগুলোর দিকে তাকাচ্ছি। যদি ভূতের দেখা পাই! কিন্তু না। অনেক প্রতীক্ষার পরও কোনও ভূতই আমার সামনে এল না। আমি তখন হাতজোড় করে বলতে লাগলাম, "হে অশরীরী প্রেতাত্মা, যদি সত্যিই তুমি থাকো তা হলে একবার অন্তত আমার সামনে এসো। আমাকে দেখা দাও। যদি না দাও তা হলে কিন্তু জানব তুমি নেই। আমাব জেদেরই জয় হবে তা হলে। অতএব তোমার মহিমা প্রকাশ করতে দেখা দাও।"

কিন্তু কে দেবে? কেউ কোনও সাড়াশব্দই দিল না। ভূতের দেখাও পেলাম না। পকেটঘড়িতে দেখলাম রাত তখন একটা। বসে থেকে থেকে দু'চোখে ঘুম নেমে আসছে

আমার। আর অপেক্ষা করে লাভ কী। খাটিয়ার ওপরে মশারির ভেতরে ঢুকে দিব্যি লম্বা হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলাম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন ভোর হয়ে গেছে। মনের আনন্দে তখন আমি লাফিয়ে উঠলাম। সারারাত এই বাড়িতে একা থেকে প্রমাণ করেছি ভূত নেই। কিন্তু এ কী! এ কী কাণ্ড! খাটিয়ার ওপর উঠে বসে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ের অবধি রইল না আমার। দেখলাম আমি খাটিয়াসুদ্ধ বাড়ির বাইরে রাস্তার ওপর শুয়ে আছি। সেই না দেখেই তো ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে রঘুয়ার ঘর থেকে বন্ধুরা সবাই হইহই করে ছুটে এল। রঘুয়া এল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী ব্যাপার! আমি এই অবস্থায় কী করে এলাম এখানে?"

রঘুয়া বলল, "কী করে আবার। ভাগ্য ভাল যে, বেঁচে গেছেন। যারা নামাবার তারাই নামিয়ে দিয়েছে আপনাকে।"

বন্ধুরা বলল, "এবার ভূত বিশ্বাস করলি তো?"

আমি বললাম, "না। তোরাই কেউ বদমায়েশি করে এ কাজ করেছিস।"

"তা কী করে সম্ভব বল। তুই তো নিজের চোখেই দেখলি কীভাবে খাটিয়াটা ওপরে ওঠানো হল। আর এই রঘুয়াও সাক্ষী, সারারাত আমরা কীভাবে ঘুমোচ্ছিলাম।"

আমি আর কী বলি? এর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। তাই বললাম, "দ্যাখ ভাই, যাকে আমি চোখে দেখিনি তার অস্তিত্ব বিশ্বাস করলাম না। তবে অলৌকিক ব্যাপার কিছু যে একটা ঘটেছে তা স্বীকার করলাম। একে ভৌতিক বলো লৌকিক অন্য কিছু বলো অন্য কিছু।"

বন্ধুরা বলল, "তা হলে কি আমাদের খাওয়াটা মার যাবে?"

আমি বললাম, "না, তা যাবে না। দমভর লুচি মাংস দই মিষ্টি যে যত পারো খাও। তবে এটা ঠিক, তোমাদের এই ভুতুড়ে বাড়িতে ভয় তো আমি পেলামই না, উপরন্তু ভূতের দেখাও না। তাই ভূতের ভাবনা মনে আমার রয়েই গেল।"

যাই হোক. সেদিনই বন্ধুদের ইচ্ছামতো ওদের সবাইকে পেটভরে খাইয়ে দিলাম।

এর পর থেকে আমার যেন জেদ চেপে গেল বাড়িটা কেনবার এবং আগাগোড়া বাড়িটাকে সংস্কার করিয়ে দু'-চার ঘর ভাড়াটে বসাবার। এই মনে করে দ্বারভাঙার ভবতারণবাবুদের অনেক চিঠি লেখালেখি করে বাড়িটা প্রায় জলের দরেই কিনে নিলাম। তারপর বাড়িটাকে সংস্কার করার জন্য রাজমিস্ত্রি লাগাতে গিয়েই মুশকিলে পড়লাম। এখানকার কোনও মিস্ত্রিই ও বাড়ি সংস্কারের কাজে হাত দিতে রাজি হল না। শেষকালে গ্রামের দিক থেকে মিস্ত্রি আনিয়ে তাদের দিয়েই বাড়িটাকে প্লাস্টার করিয়ে দরজা জানলার জ্যাম ছাড়িয়ে গোটা বাড়িটা হোয়াইট ওয়াশ করিয়ে একেবারে নতুন করে তুললাম।

সবই হল। কিন্তু ভাড়াটে কই? ভাড়াটে পাব কোথায়? কেউ-ই ভাড়া আসতে রাজি হল না ও বাড়িতে।

এইভাবে প্রায় বছরখানেক কেটে যাওয়ার পর একদিন এক ভদ্রলোক বিয়েবাড়ির জন্য বাড়িটা ভাড়া নিতে এলেন!

আমি সানন্দে রাজি হলাম। বললাম, "বাড়িটা তো আমার এমনিই পড়ে আছে। কাজেই ভাড়া-টাড়া দিতে হবে না। আপনি যে ক'দিন ইচ্ছে ব্যবহার করুন।"

ভদ্রলোক খুব উৎসাহের সঙ্গে বাড়িটা কাজে লাগালেন। লোকজন পরিপূর্ণ হয়ে বাড়িটার

এমন অবস্থা হল যে কারও আর মনেই হল না এটা ভূতের বাড়ি, বা এ বাড়িতে কোনও আতঙ্ক আছে।

যাই হোক, বিয়েতে আমার ও আমার বন্ধুবান্ধবদেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। তাই বিয়ের দিন সন্ধের সময় আমরা সবাই কিছু কিছু আশীর্বাদী নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলাম।

আমরা এসে পৌঁছবার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তাই বর-কনে দেখে খেতে বসলাম আমরা। খাওয়া সবে শুরু করেছি এমন সময় তুমুল হট্টগোল। কী ব্যাপার! বর নাকি কীরকম করছে।

"খাওয়া তো মাথায় উঠল। কোনওরকমে নমো নমো করে উঠে পড়লাম। তারপর ভিড় কাটিয়ে ওপরের ঘরে যেতেই আমাকে দেখে বরের সে কী চোখরাঙানি, "আমাকে অবিশ্বাস? আমি নেই? এইবার দেখ আমি আছি কিনা?"

আমি বললাম, "কে তুমি?"

"তুই যাকে দেখতে চাস আমি সেই। এই দ্যাখ।"

আমি বললাম, "তাই যদি হবে তা হলে এইভাবে তুমি আমাকে দেখা দিলে কেন? এতদিন পরে? সেদিন রাতে আমার সামনে আসতে কী হয়েছিল?"

"আমি সেদিন ছিলাম না। একটু দূরে অন্য জায়গায় গিয়েছিলাম। শেষ রাতে যখন ফিরলাম তখন দেখলাম তুই ঘুমোচ্ছিস। তোকে তো আমি খাটিয়াসুদ্ধু ছাদ থেকে নামিয়ে দিয়েছিলাম। মনে নেই? তারপরেও তোর অবিশ্বাস?"

আমি চুপচাপ সব শুনে গেলাম।

বরের শরীরে তখন আসুরিক শক্তি ভর করেছে। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারছে না।

সবাই তখন আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। তুমি যে আছ তা আমি এবার বিশ্বাস করলাম। দয়া করে শুভ কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ো না। ও বেচারাকে ছেড়ে দাও।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে? বর মেঝেয় শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে তখন। ওর মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠছে। বাড়িতে কান্নার রোল উঠল।

আমি ওখান থেকে একটু তফাতে সরে এসে সবাইকে বললাম, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনারা ওকে সাবধানে রাখুন। আমি এলুম বলে!"

হাওড়া কৌঁড়ার বাগানে তখন পঞ্চা নামে এক রোজা ছিল। আমি কাউকে কিছু না বলে আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে গেলাম তার কাছে। তারপর সে রাত্রেই টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে ধরে আনলাম। কেননা ভূতের বাড়ির মালিক যখন আমি, তখন এ ব্যাপারে আমারও একটু কর্তব্য আছে তো!

পঞ্চা রোজা আমাকে খুব ভালভাবেই চিনত। তাই আমার অনুরোধ এবং তৎসহ টাকার লোভ কোনওটাকেই ঠেলতে না পেরে ওর প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্তর সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে চলে এল।

কিন্তু সর্বনাশ! বাড়িতে ঢোকার মুখেই একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। দোতলার কার্নিসের একটা অংশ এমনভাবে ভেঙে পড়ল যে, আর একটু হলে দু'জনেই শেষ হয়ে যেতাম আমরা।

তাই দেখে পঞ্চা আর ভেতরে ঢুকল না। পিছিয়ে এসে বলল, "এ ভূত আমি তাড়াতে পারব না দাদাবাবু। কিছু মনে করবেন না। আমার মন্ত্রে কোনও কাজই করবে না এর। এ

ভূতের রোজাও এখানে নেই।"

"কোথায় আছে তা হলে?"

"আসবেন কিনা জানি না। তবে এ ভূতের রোজা একজনই আছেন রশিদপুরে। মুসলমান রোজা। নাম করিমসাহেব। নাম বললে সবাই বাড়ি দেখিয়ে দেবে। আপনি কাল খুব ভোরে উঠে সেখানে চলে যান।"

অতএব তাই করলাম। আর বাড়ির ভেতর না ঢুকে বরকর্তা ও কন্যাকর্তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব বললাম। এবং বললাম এই রোজা ডাকতে যাওয়ার ব্যাপারটা কারও কাছে না বলতে। বলে আমি বাড়ি চলে এলাম এবং পরদিন খুব ভোরে রওনা দিলাম রশিদপুরের দিকে।

ভাগ্য ভাল। যাওয়ামাত্রই দেখা হয়ে গেল। আমার মুখে সব শুনে এবং আমার পরিচয় পেয়ে করিমসাহেব একটুও দেরি না করে সঙ্গে চলে এলেন। তাতেও দুপুরের আগে আসতে পারলাম না।

বর বেচারির প্রায় শেষ অবস্থা।

করিমসাহেব ঘরে ঢুকেই সর্বাগ্রে তার গায়ে ধুলোপড়া দিয়ে মন্ত্রপূত জল শিশি থেকে বার করে ছেটাতে লাগলেন। যেই না ছেটানো অমনই শুরু হল দাপাদাপি। সে কী প্রচণ্ড ছটফটানি। আর চেঁচানি—"ওরে বাবা রে, মরে গেলুম রে।"

করিমসাহেব বললেন, "আর একবার দেব নাকি?"

বর বলল, "না। আর না।"

"তা হলে ছেড়ে যা ওকে।"

"যাব। কিন্তু তার আগে কথা দে আমাকে তোরা গয়ায় দিবি?"

রোজার হয়ে আমি বললাম, "বেশ তো। এ আর এমন কী কথা। আমি তোমাকে গয়ায় দেব।"

"ঠিক দিবি তো?"

"নিশ্চয়ই দেব। তুমি তোমার পরিচয় দাও।"

"আমার নাম বিভূতি চক্রবর্তী। বাড়ি আন্দুলে। আমি অনেকদিন থেকেই এই বাড়িতে আছি। কিন্তু এখন দেখছি আর থাকা যাবে না।"

করিমসাহেব বললেন, "কিন্তু এত লোক থাকতে তুমি এই নিরীহ বর বেচারাকে ধরে শুভ কাজে বিঘ্ন ঘটালে কেন?"

"কী করব? আমি তো অযথা কারও ক্ষতি করি না। ও যে বন্ধুদের সঙ্গে ছাদে উঠে পান খেতে খেতে আমার গায়ে পানের পিক ফেলে দিয়েছিল।"

"বেশ, ঠিক আছে। এঁরা যখন তোমাকে গয়ায় দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলেছেন, তখন তুমি একে ছেড়ে দাও।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হল কে যেন হুড়মুড়িয়ে চলে গেল ঘরের ভেতর থেকে। যাওয়ার সময় দেওয়ালে টাঙানো একটা কুলোকে ফেলে দিয়ে গেল।

করিমসাহেব বললেন, "আর কোনও ভয় নেই। ও চলে গেছে।" তারপর আমাকে বললেন, "তবে আপনি কিন্তু ওর নামে গয়ায় একটা পিণ্ডি দিয়ে আসবেন, কেমন?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই দেব। খুব শিগগির যাচ্ছি আমি গয়ায়।"

এরপর করিমসাহেব আরও কিছু জলপড়া নুনপড়া দিয়ে কীসব তাবিজ কবজ বেঁধে

দিলেন হাতে। বরও রোজার গুণে সুস্থ হয়ে উঠে বসল এবং সেইদিনই বাড়ি খালি করে দিল ওরা।

পরদিন আমি আবার এলাম। এসে সারাদিন লোককে দিয়ে গোটা বাড়িটা পরিষ্কার করালাম। ধুয়েমুছে সাফ করিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে সন্ধের সময় তালা দিয়ে বেরোতে যাচ্ছি এমন সময় দেখি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

আমি বললাম, "কাকে চান?"

ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে বললেন, "আপনাকেই। ভেতরে যেতে পারি?"

ভদ্রলোককে দেখে বেশ বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে মনে হল। বললাম, "আসুন।"

ভদ্রলোক গেট পার হয়ে আমাব কাছে এলেন।

বললাম, "কী দরকার বলুন? বাড়ি ভাড়া নেবেন?"

ভদ্রলোক তেমনই হেসে বললেন, "আরে না না। আপনিই এই বাড়ির মালিক?"

"আঁজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এই বাড়িতে গতকাল একজনকে কি ভূতে ধরেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"ভূতে ধরার পর একজন রোজা এসে বিড়বিড় করে মন্ত্র বলতেই ভূতটা ছেড়ে পালাল, এই তো?"

"ঠিক তাই।"

"আচ্ছা, আপনাবা নব্য কালের ছেলেরা এখনও এইসব কী করে বিশ্বাস করেন বলুন তো?"

"বিশ্বাস আমি করতাম না। কিন্তু এমন গোটাকতক ঘটনা হল যাতে বিশ্বাস না কবে আমি থাকতে পাবলাম না।"

"তা হলে মশাই শুনুন, আমার খুব ভূত দেখবাব ইচ্ছে। আপনি যদি দয়া করে আজ রাত্রে এই বাড়িতে আমাকে একটু থাকার অনুমতি দেন তা হলে খুব ভাল হয়।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ভদ্রলোকের মুখের দিকে।

"হ্যাঁ গো, সত্যি বলছি। রসিকতা করছি না। আমার তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আজও মরব, কালও মরব! না হয় ভূতের হাতেই মরি।"

আমি চাবি খুলে ভদ্রলোককে বললাম, "বেশ, থাকুন। যদি কোনও অসুবিধে মনে করেন তা হলে ছাদে উঠে চেঁচাবেন। কেউ না কেউ এসে পড়বে।"

"তুমি থাকবে না?" ভদ্রলোক এই প্রথম আমাকে তুমি বললেন। বলুন। আমার বাপের বয়সি লোক। কোনও আপত্তি নেই।

"আমি? আমার থাকার দরকার কী?"

"আরে থাকো না। দু'জনে বসে বসে গল্প করে কাটিয়ে দেব একটা রাত। ভূত একজন থাকলেও আসবে, দু'জন থাকলেও আসবে।"

আমি বললাম, "তা হলে এক কাজ করুন। এই নিন চাবি। আমি একটু বাড়িতে বলেকয়ে খেয়েদেয়ে আসি। না হলে বাড়ির লোকেরা তো চিন্তা করবে। আমি না আসা পর্যন্ত আপনি বরং বাড়ির চৌহদ্দিটা ঘুরেফিরে দেখুন। বিশ্রাম করুন।"

"ঠিক আছে, তাই যাও। তবে বাবা, তুমি নিজেই একবার বাড়িটা বেশ ভাল কবে

আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যাও না কেন?"

আমি বললাম, "এ আর এমন কী? দেখুন তা হলে।" বলে ভদ্রলোককে বাড়ির ভেতরে এনে হারিকেন জ্বেলে নীচে-ওপর করে সব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখালাম।"

ভদ্রলোক বললেন, "কই, এবার ছাদটা একবার দেখিয়ে দাও।"

আমি আলো নিয়ে ছাদে ওঠামাত্রই হারিকেনটা হঠাৎ দপ দপিয়ে নিভে গেল। আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তখন। আর সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল সিঁড়ির দরজাটা। কোথায় ভদ্রলোক, কোথায় কে! কাউকেই আর দেখতে পেলাম না আমি। তাই বারবার ভয়ার্ত গলায় ডাকতে লাগলাম, "এই যে, ও মশাই! কোথায় গেলেন?"

এমন সময় নীচে বাগানের দিক থেকে সাড়া এল, "আমি এখানে। এই যে—।"

"কোথায় আপনি?"

"বাগানে।"

আমি তাড়াতাড়ি ছাদের আলসের কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক বাগানে একটা চাঁপাগাছের নীচে একমনে ফুল কুড়িয়ে চলেছেন।

ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপছে তখন। আমি ওপর থেকেই বললাম, "কী আশ্চর্য। আপনি ওখানে গেলেন কী করে?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার পিঠের ওপর একটা উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলাম আমি। পরক্ষণেই মনে হল, আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। মনে হল আমার কানের কাছে মুখ এনে কে যেন বলছে, "তুমি ভূত বিশ্বাস করো না, না? আমার নাম বিভূতি চক্রবর্তী। আজ তোমাকে বিশ্বাস করিয়ে তবে ছাড়ব।"

আতঙ্কে আমি শিহরিত হয়ে উঠেছি তখন।

দেখলাম সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছাদের এককোণে আলসেতে ঠেস দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই বললেন, "এবার বিশ্বাস হল তো? আমি বিভূতি চক্রবর্তী। আজ থেকে বছর কুড়ি আগে এই বাড়িতে আমার মৃত্যু হয়েছিল। মানে আমাকে জোর করে মেরে ফেলা হয়েছিল। আর ওই যে চাঁপাগাছটা রয়েছে বাগানে, একটু আগে যেখানে আমি ফুল কুড়োচ্ছিলাম, ওইখানেই আমার দেহটা পুঁতে রাখা হয়েছিল। তা যাক। তুমি ভাই দয়া করে গয়ায় গিয়ে আমার নামে একটা পিণ্ডি দেওয়ার আগে প্রেতশিলায় পিণ্ডি দিতে যেন ভুলো না। তা না হলে কিন্তু সব পণ্ড হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "আমি তো আপনাকে কথা দিয়েছি। আপনারা জন্য গয়ায় আমি যাবই এবং পিণ্ডি একটা দেবই।"

"হ্যাঁ, কথা অবশ্য দিয়েছ। তবে জেনে রেখো, কথা দিয়ে কথা যদি না রাখো তা হলে কিন্তু তোমার পেছনে আমি শনির মতো লেগে থাকব। কেননা আমার বড় কষ্ট। আমি অনেককে আমার কষ্টের কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। পাছে কেউ ভয় পায় তাই সচরাচর দেখাও দিই না কাউকে। কিন্তু তোমার সাহস ও জেদ দেখে থাকতে পারলাম না আর।"

আমি বললাম, "আপনার সব কথাই তো আমি শুনলাম। কিন্তু কে আপনাকে হত্যা করেছে তা তো বললেন না?"

"যার কাছ থেকে এই বাড়ি কিনেছ সেই ভবতারণ বসু। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে ও যে আমাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে

ডেকে এনে মেরে ফেলবে তা আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি। তুমি বিশ্বাস করো, মরবার সময় আমার বড্ড কষ্ট হয়েছিল।"

"আপনার সব কথা আমি বিশ্বাস করলাম। কিন্তু ভবতারণবাবু তো সম্প্রতি মারা গেলেন। মরণের পরে ভূত যখন হলেনই, তখন কেন আপনি সেই হত্যার প্রতিশোধ নিলেন না? এতবড় সুযোগটাকে আপনি কেন হাতছাড়া করলেন?"

"কে বললে প্রতিশোধ নিইনি? তার একটা ছেলে জাহাজে চাকরি করত। ডেক থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে জলে ফেলে ডুবিয়ে মেরেছি। আর এক ছেলেকে চলন্ত ট্রেনের চাকার তলায় ফেলে দিয়েছি। এই বাড়িতে সর্বক্ষণ ওদের এমনভাবে ভয় দেখিয়েছি যে, এখানকার পাট চুকিয়ে দিয়ে দ্বারভাঙায় পালাতে পথ পায়নি বাছাধনরা। আর ভবতারণবাবু? ওর মৃত্যুর কারণও তো আমি। অন্ধকার ঘরে একা পেয়ে সেদিন ওকে এমন ভয় দেখালাম যে, ভয়ে হার্টফেল করেই মরল বেচারি!"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "আমার ওপর আপনার কোনও রাগ নেই তো?"

"না না। তোমার ওপর রাগ থাকবে কেন?"

"আমি কথা দিচ্ছি, কালই আমি গয়ায় যাব।"

"হ্যাঁ যাও। তবে প্রেতশিলায় পিণ্ডি দিতে যেন ভুলো না। কেমন? আমার বড় কষ্ট। কী নৃশংসভাবে আমাকে মেরেছিল তা ভাবলেও তুমি আঁতকে উঠবে। দেখবে আমাকে কীভাবে মেরেছিল? এই দ্যাখো।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম দুটো রোমশ হাত একটা কাঁচা বাঁশ দিয়ে বিভূতিবাবুর গলা চেপে ধরেছে। বিভূতিবাবু ছাদের আলসের গায়ে চিলেকোঠার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। আপ্রাণ চেষ্টা করছেন নিজের হাতদুটি দিয়ে গলার ওপর থেকে সেই বাঁশের চাপ সরিয়ে নিজেকে রক্ষা করবার, কিন্তু সেই প্রচণ্ড শক্তির কাছে সব শক্তিই পরাস্ত হচ্ছে। উঃ, সে কী ভয়ানক দৃশ্য। দুটো চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। গালের কষ বেয়ে গড়িয়ে আসছে রক্তের ধারা। জিভটা এতখানি লকলকিয়ে ঝুলছে। সেই অমানুষিক দৃশ্য দেখা যায় না। ভাবা যায় না। কল্পনাও করা যায় না।

আমি জ্ঞান হারালাম।

পরদিন সকালে যখন জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকালাম, তখন দেখলাম আমি আমার বাড়িতে খাটের ওপর পুরু গদির বিছানায় শুয়ে আছি। আমার ফিরতে দেরি দেখে বাবা লোকজন নিয়ে কাল রাত্রেই ও বাড়িতে গিয়েছিলেন। তারপর ছাদে ওই অবস্থায় আমাকে দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছেন বাড়িতে।

যাই হোক, বিভূতিবাবুর কথামতো সেদিন রাতের গাড়িতে বাবা আর আমি গয়ায় গিয়ে যথাবিহিত ভাবে পিণ্ডদান করে এলাম। তারপর থেকে সত্যি-সত্যিই ও বাড়িতে আর কখনও ভূতের উপদ্রব হয়নি। এবং পরবর্তীকালে বাড়িটাও আমরা বেচে দিয়েছিলাম।

এই পর্যন্ত বলে মিষ্টির দোকানের প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর গল্প শেষ করলেন।

তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। আমাদের কারও মুখে কথা নেই। যে যার বাড়ির দিকে কেটে পড়লাম।

অদৃশ্য হাত

রাজহাটি গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি ছিটেবেড়ার ঘরে এক বুড়ি থাকত। বুড়ির কেউ কোথাও ছিল না। সারাদিন গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে সন্ধের পর ঘরে ফিরত। আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে গ্রামগুলোর যে কী চেহারা ছিল তা আশা করি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। গ্রাম তখন গ্রাম ছিল। গ্রামের বাইরে মাঠ ছিল, বন ছিল, জঙ্গল ছিল— দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল। এই ছিল তখনকার প্রকৃতি। সে যাক, বুড়ির ঘরের কাছে মস্ত একটি বটগাছ ছিল। আর সেই বটগাছের ছায়ার নীচে ছিল বুড়ির কুঁড়েঘর। খুবই দুঃখে দিন কাটত তার। ভোরবেলা উঠে মাঠে গোবর কুড়োত। কাঠ কুড়োত। তারপর দুটো শুকনো মুড়ি জল দিয়ে ভিজিয়ে খেয়ে ভিক্ষেয় বেরোত। ভিক্ষেয় বেরিয়ে দোরে দোরে ঘুরে যা জুটত তাই খেত। আর সারাদিনের ভিক্ষার সামগ্রী যা জুটত, রাত্রে ঘরে ফিরে সেগুলো কাঠকুটো জ্বেলে ফুটিয়ে ফাটিয়ে খেত। চাল ডাল আলু বেগুন সব একসঙ্গে খিচুড়ির মতো করে রেঁধে পেটভরে খেয়ে মাটির দাওয়ায় শুয়ে ঘুমোত বুড়ি।

হঠাৎ একদিন বুড়ির মনে হল সে যা কিছুই খায়, খেয়ে তার পেট আর ভরে না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে এক ঘুম দেওয়ার পরই খিদেয় চনচন করে পেটের ভেতরটা। এই না দেখে বুড়ি ক্রমশ তার খাওয়া বাড়িয়ে যেতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য! সে যত খেতে লাগল ততই তার খিদে বাড়তে লাগল। ক্রমে ভাতের হাঁড়ির চেহারাও বদল হতে লাগল। কিন্তু না। তাতেও কোনও সুরাহা হল না। চারজনের রান্না একসঙ্গে রেঁধে খেয়েও পেট ভরাতে পারল না বুড়ি। তাই মনের দুঃখে একদিন গ্রামের দু-চারজন লোকের কাছে কথাটা বলেই ফেলল। সবাই শুনে অবাক হয়ে বলল, "বলো কী! চারজনের রান্না একজনে খেয়েও পেট ভরাতে পারো না? তার ওপর তোমার মতো বুড়িমানুষ। এ হতে পারে না।"

নিরাপদ মাস্টার এই গ্রামেরই পাঠশালার গুরুমশাই ছিলেন। বললেন, "বেশ, দেখব বুড়ি তুমি কতবড় খাইয়ে। আজ তুমি ভিক্ষেয় বেরিয়ো না। আমার ঘরে এসো। আজ তোমার নেমন্তন্ন। দেখব তুমি কত খাও।"

বুড়ির তো আনন্দ আর ধরে না।

সে রাতে নিরাপদ মাস্টারের বাড়িতে খেতে এল বুড়ি। কিন্তু কী আশ্চর্য! চারজন কেন, একজন মানুষের খাবারও খেতে পারল না বুড়ি। সামান্য দু-চার গ্রাস মুখে দিতেই পেট ভরে গেল।

নিরাপদ মাস্টার বললেন, "আসলে কি জানো? তোমার এবার মতিভ্রম হয়েছে। বয়স কত হল?"

"তা ধরো না কেন, তিন কুড়ি দশ।"

"তা হলে এমন আর কী? সত্তর বছর। চোখে দেখতে পাও?"

"একেবারে কানা নই। তবে কখনও ঠাওর হয়, কখনও হয় না। কিন্তু বাবা, বিশ্বাস করো

আমার কিচ্ছু হয়নি। ঘরে আমার খেয়ে পেট ভরে না।"

"ভরবে ভরবে। আসলে তুমি বুড়িমানুষ। নিজের ঘোরে থাকো। চাল ডাল ঠিকমতো নাও না।"

"সে কী বাবা! আমার সারাদিনের ভিক্ষের চাল, সে বড় কম নয়! এতবড় একটা হাঁড়িতে করে সব রেঁধেও খেয়ে আমি পেট ভরাতে পারি না।"

"কিন্তু এই তো, আমার এখানে পোয়াটাক চালের ভাতও তুমি খেতে পারলে না।"

বুড়ি আর কী করে, ঘরে ফিরে এসে মাটির দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে নানারকম চিন্তাভাবনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে আবার মাঠে গিয়ে গোবর কুড়িয়ে দু'মুঠো শুকনো মুড়ি চিবিয়ে ভিক্ষেয় চলল বুড়ি। সারাদিন ভিক্ষে করে দিনের শেষে ঘরে ফিরে ভিক্ষার সমস্ত চাল ডাল আলু বেগুন একসঙ্গে বড় হাঁড়িতে ফুটিয়ে নিয়ে খেতে বসল। কিন্তু আশ্চর্য! দু-এক গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই খাবারও ফুরিয়ে গেল, পেটও ভরল না তার—।

আর যা ঘটল তা ভারী মজার!

বুড়ি যখন খাচ্ছিল আর মনে মনে কাঁদছিল তখন তার মনে হল একটা অদৃশ্য হাত যেন তার পাত থেকে মুঠো মুঠো করে খাবারগুলো তুলে খেয়ে নিচ্ছে। বুড়ি যতবার হাতটা ঠেলে দিতে লাগল, হাতটা ততবারই ওর পাত থেকে খাবার তুলে নিতে লাগল। বুড়ি বুঝতেও পারল না কেন এমন হল, আর কেই বা সব খেল।

এই কথাটা বুড়ি পরদিন গিয়ে বলল নিরাপদ মাস্টারকে।

নিরাপদ মাস্টার বললেন, "বলো কী! একটা হাত তোমার পাত থেকে খাবার তুলে খেয়ে নিতে লাগল, আর তুমি বসে বসে তাই দেখলে?"

"কী করব বাবা?"

"তা কে সে? চিনতে পারলে তাকে?"

"কী করে চিনব? অন্ধকারে কি কিছু দেখা যায়? আমার ঘরে লম্ফ পিদিম কিছুই নেই।"

"বুঝেছি। এ নিশ্চয়ই কোনও চোর ছ্যাঁচড়ের কাজ।"

"তা যদি হয় বাবা, তা হলে তো তার আসা-যাওয়ার বা মুখ নেড়ে নেড়ে খাবার শব্দ শুনতে পেতুম। কিন্তু শুধু একটা হাত ছাড়া আর কিছুই তো টের পেলুম না অন্ধকারে। হাতটাকে যত ঠেলে দিই, সেটা ততই এগিয়ে আসে।"

নিরাপদ মাস্টার বললেন, "দেখো বুড়ি, তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে তোমার খাবার সত্যিই কেউ খেয়ে নিচ্ছে। হয় কোনও চোর, নয়তো হনুমানে। তোমার বাড়ির পাশেই যে বটগাছটা আছে সেই বটগাছে নিশ্চয়ই একদল হনুমান আছে। এ তাদেরই কাজ।"

"না বাবা, হনুমান নয়। ও গাছে বাঁদর হনুমান মাঝেমধ্যে আসে বটে, তবে সন্ধে হলেই দিঘির পারে চলে যায়। এখানে থাকে না। তা ছাড়া আমি নিজে হাত দিয়ে ঠেলে দেখেছি ও মানুষের হাত।"

"বেশ। তবে তুমি এক কাজ করো, আমার চিমনিটা নিয়ে যাও। ওটা জ্বেলে রেখে আজ রাত্রে খেতে বসে দেখো দেখি কে কীভাবে আসে।"

বুড়ি তাই করল।

নিরাপদ মাস্টারের কথামতো সে রাতে চিমনি লন্ঠনটা জ্বেলেই খেতে বসল।

কিন্তু কই? কেউ তো এল না। না কোনও মানুষ, না বাঁদর হনুমান। এমনকী একটা কুকুরকেও আসতে দেখা গেল না। আর বুড়ি যে রান্না করেছিল তার প্রায় সবই ফেলা গেল। কেননা আলো জ্বেলে রাখার ফলে কেউই না আসায় যেমনকার খাবার তেমনিই রইল। বুড়ি আগে যেমন খেত তেমনই খেতেই পেট ভরে গেল তার। সে আর কত? সামান্য দু-এক মুঠো।

এর পর থেকে বুড়ি রোজই কম করে রাঁধতে লাগল। আর আলো জ্বেলে খেতে থাকল। ফলে কাউকেই আসতে দেখা গেল না।

তবে মুশকিল হল এই, তেলের অভাবে বুড়ি যেদিনই আলো জ্বালতে পারত না সেদিনই অনুভব করত একটা অদৃশ্য হাত তার পাত থেকে খাবার তুলে খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু যেদিন আলো জ্বেলে খেত সেদিন কিছুই হত না। বুড়ি তাই নিরাপদ মাস্টারের কথামতো রোজই আলো জ্বেলে খেতে লাগল।

এইভাবে প্রায় দিনদশেক কাটবার পর একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এক গভীর রাতে সবাই শুনতে পেল একটি করুণ কান্নার সুর। কে যেন ইনিয়ে বিনিয়ে গ্রামের পথে ঘাটে আনাচে কানাচে কেঁদে বেড়াচ্ছে এই কথা বলে, 'বুড়িকে এমন বুদ্ধি কে দিলি রে? খিদেয় আমি মরে গেলুম। তার সর্বনাশ হোক—তার সর্বনাশ হোক—তার সর্বনাশ হোক।'

গ্রামের লোকেরা সবাই তখন সচকিত হয়ে উঠল। কে! কে কাঁদে? কে ওই কেঁদে কেঁদে অভিশাপ দেয়। বিলাপ করে আর অমঙ্গলের কথা বলে?

এক জ্যোৎস্নারাতে নিরাপদ মাস্টার নিজেই দেখলেন দৃশ্যটা। রাত তখন একটা। কী একটা কাজে বাইরে বেরিয়েছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন একটা প্রকাণ্ড সাইজের কুলোর ওপর কালো কিম্ভূতকিমাকার বিচ্ছিরি চেহারার মানবাকৃতি কী যেন একটা বসে আছে। চেহারার তুলনায় হাত দুটো তার বিশাল। কুলোটা বাতাসে ভেসে ভেসে গ্রামের পথ পরিক্রমা করছে। আর সেই কিম্ভূতকিমাকার তার হাত দুটো দুলিয়ে কখনও নৌকো বাওয়ার মতো করে, কখনও কপাল চাপড়ে সুর করে কেঁদে কেঁদে বলছে, 'বুড়িকে এমন বুদ্ধি কে দিলি রে? খিদেয় আমি মরে গেলুম। তার সর্বনাশ হোক—তার...।'

এই দৃশ্য শুধু নিরাপদ মাস্টার নয়, ওই গ্রামের আরও অনেকেই প্রত্যক্ষ করল। নিরাপদ মাস্টারের বউ অনেক ঠাকুর-দেবতা ওঝা-বদ্যি করতে লাগলেন যাতে তাঁদের সংসারে কোনও অমঙ্গল না হয়। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হল না। শাপ-শাপান্তও কমল না। তাই দেখে অনেকেই অবশ্য বলল, 'ওর কথায় কান দিয়ো না। আসলে ওটা একটা উজবুক তাই ওইসব বলে বেড়াচ্ছে। তোমরা তো ওর কোনও ক্ষতি করোনি। তবে ভয় কী। শকুনির শাপে গোরু মরে না। ওর যা ইচ্ছে বলুক।"

এইভাবে আরও দু-তিন মাস কেটে যাওয়ার পর এক ঝড়জলের রাতে বটগাছের একটি ডাল ভেঙে পড়ল বুড়ির কুঁড়েঘরের ওপর। ঘুমন্ত বুড়ি ঘরচাপা পড়ে মরে গেল। আর বলতে নেই, সে রাত থেকেই সেই বিচ্ছিরি চেহারার কিম্ভূতকিমাকারটাকে কুলোয় চেপে গ্রামের আনাচে-কানাচে ভেসে বেড়াতে দেখা গেল না। এমনকী তার শাপ-শাপান্ত কান্নাকাটি সবকিছুই থেমে গেল চিরতরে। তবে সেই ঘটনার পর থেকে রাজহাটি গ্রামের লোকেরা আজ পর্যন্ত সন্ধের পর আলো না জ্বেলে কখনও খেতে বসে না কেউ।

অদ্ভুতুড়ে

একবার হুগলি জেলার মৌবাসিয়া গ্রামের হরিপদ কী একটা কাজে কলকাতা গিয়েছিল। ট্রেনের গোলমালে ফিরতে রাত হয়ে গেল। তখন তো এখনকার মতো এমন ইলেকট্রিক ট্রেন ছিল না। কয়লার ইঞ্জিন দেওয়া কাঠের বগি গাড়ি দু' ঘণ্টার পথ পাঁচ ঘণ্টায় যেত। একে অবেলার ট্রেন। তার ওপর ইঞ্জিনটা কামারকুণ্ডুতে বিগড়ে যাওয়ায় নতুন ইঞ্জিন জুড়ে ট্রেন যখন গুরোপ স্টেশনে এল, রাত্রি তখন দশটা। যাই হোক, হরিপদ যখন ট্রেন থেকে নামল তখন গোরুর গাড়ি, পালকি কিছুই নেই। অগত্যা স্টেশনেই রাতটা কাটিয়ে দেবে ঠিক করে প্ল্যাটফর্মে কাঠের বেঞ্চিতে আরাম করে বসল।

ট্রেন থেকে আরও দু-চারজন যাত্রী নামল। তবে তারা সব কাছাকাছিই থাকে। বীরপুর কোটালপুর, বালিদহ এইসব গ্রামে। তাই তারা যে যার পায়ে হেঁটেই চলে গেল। গেল না শুধু হরিপদ এবং এক বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ হরিপদর কাছে এসে বললেন, "আপনি কোন গ্রামে থাকেন ভাই?"

হরিপদ বলল, "আমি থাকি মৌবেসেয়। এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল দূর। আপনি?"

"আমি এখানে থাকি না। আমার মেয়ের বাড়ি চোপায়। সেখানেই যাব বলে এসেছিলাম। কিন্তু কপালের ফের।"

'চোপা' নাম শুনেই উৎসুক হয়ে হরিপদ বলল, "চোপা! ও তো আমাদের পাশের গ্রাম। ও গ্রামে কোথায় আপনার মেয়ের বাড়ি? জামাইয়ের নাম কী?"

"তুমি কি চিনবে? আমার জামাইয়ের নাম লালমোহন দাশ।"

"লালমোহনকে চিনব না? ওর বিয়েতে, বউভাতে দমভর খেয়েছিলাম। তা আপনি লালমোহনের শ্বশুর যখন, তখন আমার সঙ্গেই যাবেন। কিন্তু মুশকিল হল এই রাতে আরও দু-একজন সঙ্গী থাকলে ভাল হত। মাত্র দু'জনে কী করে যাই?"

"তা হলে কি সারারাত এখানেই পড়ে থাকতে হবে?"

"তা ছাড়া? তা আপনি বুড়োমানুষ, একা-একা এলেন যখন, সকালের গাড়িতে কেন এলেন না?"

"আমার আজকে আসার কোনও ঠিক ছিল না। অনেকদিন মেয়েটাকে দেখিনি তাই ওর জন্য মনটা খুব ছটফট করছিল।"

"সেইজন্যই হঠাৎই বেরিয়ে পড়লেন, এই তো?"

"হ্যাঁ। ঠিক ধরেছ ভায়া। তা চলো না একটু সাহস করে এগোনো যাক।"

হরিপদ বললে, "সাহস করে না হয় এগোলাম। কিন্তু অত পথ আপনি হেঁটে যেতে পারবেন?"

"কী যে বলো? জানো না মরা হাতি লাখ টাকা। বিশ মন পঁচিশ মন ঘি খাওয়া হাড় আমার। হাঁটাকে আমি ভয় করি না। তবে অন্য কিছুর ভয় করি। তাই একা হেঁটে যেতে

সাহস হচ্ছে না।"

হরিপদ বলল, "ওই একই কারণে আমিও তো যেতে চাইছি না। তবে অন্য কিছু বলতে আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন তা জানি না, চোর ডাকাত ঠ্যাঙাড়ে এদের ভয়টাই আমার কাছে বড় ভয়। কেননা ভূতের চেয়ে মানুষ আরও বেশি ভয়ঙ্কর। ভূত আছে কি নেই তা জানি না । কিন্তু মানুষ আছে জানি। আর মানুষ পারে না এমন কোনও কাজ নেই।"

"সে কী হে ছোকরা! তুমি শুধু মানুষকেই ভয় করো, ভূতকে ভয় করো না?"

"না।"

"ভাল, ভাল। ভূতের ভয় না করাটাই ভাল। আমি কিন্তু ভূতের ভয়েই একা যেতে সাহস করছি না।"

ওঁরা যখন এইভাবে কথা বলছিলেন তেমন সময় হঠাৎ দূরের একটি চালাঘরে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলতে দেখা গেল।

হরিপদ বলল, "চলুন তো! মনে হচ্ছে বালিদহের চায়ের দোকানটা এখনও খোলা আছে। গিয়ে দেখি এক-আধকাপ চা পাই কি না।"

এই বলে বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে হরিপদ দোকানের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু বিধি বাম। গিয়ে দেখল দোকানের ছেলেটি সবকিছু গুছিয়ে গাছিয়ে চলে যাওয়ার জন্য দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করছে।

হরিপদ বলল, "আচ্ছা মুশকিল তো! সারারাত পড়ে থাকতে হবে এখানে, অথচ একটু চা-ও পাওয়া যাবে না?"

বৃদ্ধ বললেন, "শোনো ভাই, যা বলি। যা আছে কপালে, হাঁটতে তো শুরু করি।"

হরিপদ বলল, "হাঁটতে আমি পিছপাও নই। তবে আপনি তো জানেন না এখানকার ব্যাপারস্যাপার। ওই ঘিয়ারপুল জায়গাটা ভাল নয়। এখানকার নামকরা ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা ওখানে।"

"হোক। কথা না বলে চুপিচুপি হাঁটা শুরু করি চলো।"

"চলুন তবে।" বলে আর কোনওরকম কথাবার্তা না বলে সেই অন্ধকারে নিঃশব্দে বৃদ্ধকে নিয়ে হাঁটা শুরু করল হরিপদ। বৃদ্ধ সত্যিই হাঁটতে পারেন। এত বয়সেও বেশ শক্তসমর্থ কর্মঠ। হাঁটতে যেন একটুও ক্লান্তি নেই। মাঝে মাঝে হাঁটাতে তিনি হরিপদকেও ছাড়িয়ে যান।

এইভাবে হেঁটে হেঁটে কত পথ গেছেন দু'জনে তার খেয়াল নেই। হঠাৎ স্টেশনের দিক থেকে একটি মোটরের জোরালো আলো ওদের গায়ে এসে পড়ল। ওরা দু'জনেই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল রাস্তার পাশে। দেখা গেল একটি হুড খোলা মোটরগাড়ি হর্ন বাজিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

বৃদ্ধ বললেন, "গাড়িটাকে কোনওরকমে থামানো যায় না? দেখো না একটু চেষ্টা করে।"

হরিপদ বলল, "না। দিনকাল খারাপ তো। ইচ্ছে থাকলেও ভয়ে কেউ গাড়ি থামাবে না। কার মনে কী আছে কে জানে?"

বলতে বলতেই মোটরটা সজোরে এসে ব্রেক কষল ওদের সামনে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি খেয়ে থেমে গেল গাড়িটা। গাড়ির ড্রাইভার ব্রেক কষেই ওদের দু'জনের দিকে বড় বড় চোখ করে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

গাড়ির পেছন দিকের সিটে বেশ জাঁদরেল চেহারার একজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন।

ওদের দেখে একটু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে আপনারা?"

হরিপদ বলল, "আজ্ঞে আমরা কোনও মন্দ লোক নই। নিরীহ পথচারী। ট্রেনের গোলমালেব জন্য ফিরতে রাত হয়ে গেছে। তাই হেঁটে বাড়ি ফিরছি।"

"অ। কোন গ্রামে যাবেন আপনারা?"

হরিপদ বলল, "আমি যাব মৌবাসিয়া, উনি যাবেন চোপায়।"

"তা হলে আমার গাড়িতে আপনারা উঠে আসতে পারেন। আমি যাব মাহিন্দর। আপনার গ্রাম ছাড়িয়ে জৌগ্রামের দিকে।"

হরিপদ এবং বৃদ্ধ দু'জনেই ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠল।

ভদ্রলোকের চেহারায় আভিজাত্য আছে। দেখে বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলেই মনে হয়।

হরিপদ বলল, "আপনি কি মাহিন্দরে থাকেন? আমি কিন্তু এর আগে দেখিনি আপনাকে?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমি এখানকার লোকই নই তো আমাকে দেখবেন কী করে? আমি থাকি চুঁচুড়াতে। একজন মরণাপন্ন রোগীর কল পেয়ে তাকে দেখতে যাচ্ছি।"

"আপনি তা হলে ডাক্তারবাবু। মাহিন্দরে কাদের বাড়ি যাচ্ছেন?"

ডাক্তারবাবু এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "অত কৈফিয়ত আপনাকে দিতে পারব না মশাই। যেমন বসে আছেন তেমনই চুপচাপ বসে থাকুন।"

এর ওপর আর কথা চলে না। হরিপদ চুপ হয়ে গেল।

গাড়ি তখন ঝড়ের গতিতে ছুটছে। এত বেশি স্পিডে যে, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এখনই বুঝি ছিটকে পড়ে যাবে রাস্তা থেকে। কিন্তু সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হল, এমন তীব্র গতি সত্ত্বেও পথের আর শেষ হচ্ছে না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, যে পথ একবার পার হয়ে এসেছে আবার সেই পথেই ছুটছে গাড়িটা।

তাই না দেখে বৃদ্ধ একটু রাগত স্বরে বললেন, "ডাক্তারবাবু, আপনার ড্রাইভারকে বলুন গাড়িটা একটু আস্তে চালাতে। না হলে যে কোনও মুহূর্তে উলটে যেতে পারে।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ওলটালেই হল? গাড়িটা কতক্ষণ ছুটছে তার খেয়াল আছে? ওলটাবার হলে এতক্ষণে উলটেই যেত।"

"কিন্তু কী অসম্ভব রকমের লাফাচ্ছে। মাথায় ঝাঁকনি লাগছে না? তার ওপর বুড়ো মানুষ আমি। এত কষ্ট সহ্য হয়?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "বুঝলাম। তবে একটু কষ্ট সহ্য করতে হবে বইকী! বহুদিনের পুরনো গাড়ি। তার ওপর একটিও চাকা নেই। রাস্তার ধারে ভাঙা-চোরা অবস্থায় পড়ে ছিল বলে মাথার হুডটাকেও কারা যেন খুলে নিয়ে বেচে দিয়েছে। ইঞ্জিনও লোপাট। না আছে তেল, না আছে জল। এই গাড়ি যে ছুটছে এটাই আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি? আমার ড্রাইভার খুব পাকা তাই, না হলে—"

হরিপদর তো চোখ কপালে উঠে গেছে। সে বেশ বুঝতে পারল কাদের পাল্লায় পড়ে গেছে।

বৃদ্ধ কিন্তু ভয় পেলেন না। বেশ গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, "চোপা কতদূর?"

ড্রাইভার এতক্ষণে কথা বলল, "এই তো এসে গেছি।"

"আমাকে আমার মেয়ের কাছে আজ যেতেই হবে। অতএব বেশি কেরামতি না দেখিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও। না পারো গাড়ি থামাও, নেমে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধর কথা শুনে ডাক্তারবাবু হো হো করে হাসতে লাগলেন। ড্রাইভারও অমনই তার বড় বড় চোখ দুটো ঠেলে বার করে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল।

হরিপদর হাত-পা কাঁপছে তখন।

বৃদ্ধ বললেন, "ভয় নেই। আমার ওপর ভরসা রাখো। আমি ব্যবস্থা করছি।" বলেই ড্রাইভারকে বললেন, "এই ড্রাইভার! গাড়ি থামাও, আমরা নেমে যাব।"

ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "এ গাড়ি থামতে জানে না মশাই। ভোর না হওয়া পর্যন্ত এ গাড়ি থামবে না।"

বৃদ্ধ বললেন, "থামতে জানে না যদি তো আমাদেব গাড়িতে ওঠাবার সময় এটা থেমেছিল কী করে?"

"তখনকার কথা আলাদা। এখন আর থামবে না। যদি পারেন তো চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামুন। একবার লাফ দিলেই আপনারাও আমাদের মতো হয়ে যাবেন।"

"আপনাদের মতন?"

"হ্যাঁ। দেখুন, একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখুন। আমরা কিন্তু এখন আর আগের মতো নেই।"

সত্যিই তো! ওরা আর আগের মতো নেই। হরিপদ তাকিয়ে দেখল ডাক্তারবাবু এবং ড্রাইভারের আসনে দুটো আস্ত কঙ্কাল বসে আছে।

সেই দৃশ্য দেখে বৃদ্ধ তো ভয় পাওয়ার জায়গায় রেগে গেলেন খুব। বললেন, "তবে রে। পাজি নচ্ছারগুলো, আমিও খেল দেখাচ্ছি দাঁড়া। আজ সকালে ভাত খাওয়ার সময় মাছের কাঁটা গলায় আটকে মরে গেছি আমি। মেয়েটার জন্য খুব মন কেমন করছিল ক'দিন ধরে, তাই মেয়েটাকে একবার দেখতে যাচ্ছিলুম। ভেবেছিলুম আজ প্রথম দিনটা অন্তত একটু ভাল হয়ে থাকব। এসব কিছু করব না। তা কিছুতেই ঠিক থাকতে দিলি না তোরা। নিজমূর্তি ধরিয়েই ছাড়লি। এবার দ্যাখ তবে আমার দৌড়টা। আমি যদি সত্যি-সত্যিই মরে ভূত হয়ে থাকি তবে এ গাড়ি আমি থামাবই।" বলেই ইয়া বড় বড় দুটো হাত বার করে একটা বটগাছের ডাল শক্ত করে ধরে ফেললেন বৃদ্ধ। আর অসম্ভব রকমের লম্বা ঠ্যাং দিয়ে টিপে ধরলেন স্টিয়ারিংসুদ্ধু ড্রাইভারকে। অতএব গাড়িটা প্রচণ্ড গতিবেগ থাকা সত্ত্বেও বেকায়দায় পড়ে আটকে গেল।

বৃদ্ধ ওই অবস্থাতেই চেঁচাতে লাগলেন, "নামো নামো। শিগগির নেমে পড়ো। আর দেরি কোরো না হরিপদ। আমি বেশিক্ষণ গাড়িটাকে এইভাবে ধরে রাখতে পারব না। তবে লক্ষ্মী ভাই আমার, মনে করে আমার দুঃসংবাদটা আমার মেয়ের বাড়িতে একটু পৌঁছে দিয়ো। জানাজানি যখন হয়েই গেল তখন আর তো সেখানে আমার যাওয়া উচিত হবে না।"

হরিপদ তখন একলাফে নেমে এল গাড়ি থেকে।

হরিপদ নেমে যেতেই বৃদ্ধ গাছের ডাল ছেড়ে দিলেন। আটকে থাকা গাড়িটা মুক্তি পেয়ে হু হু শব্দে ছুটে চলল। হরিপদ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখল, সেই অন্ধকারে মাঠের ওপর দিয়ে এমন একটা গাড়ি ছুটে চলেছে, যে গাড়ির একটিও চাকা নেই।

যাই হোক, হরিপদ সে রাতে চোপায় ওর বন্ধু লালমোহনের বাড়িতে দুঃসংবাদটা পৌঁছে দিয়ে মৌবেসেয় নিজ গ্রামে ফিরে এসেছিল। ভাগ্য ভাল যে, গাড়িটা চোপার মোড়েই থেমেছিল। না হলে কী হত কে জানে।

অকল্পনীয়

আমাদের এই লাইনে লাস্ট ট্রেন রাত সাড়ে এগারোটায়। নেহাত দৈব দুর্বিপাক না হলে লাস্ট ট্রেনে আমরা কেউ চাপি না। তা সেবার মধ্যমগ্রাম থেকে আমার এক বন্ধুর বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিলাম। তখন শীতকাল। তার ওপর ফিরতেও রাত হয়ে গেল অনেক। স্টেশনে এসে দেখি লাস্ট ট্রেন সবুজ সংকেত পেয়ে ছাড়বার উপক্রম করছে। আমি ছুটে গিয়ে একটা বগিতে উঠে পড়তেই ছেড়ে দিল ট্রেন।

আমি রামরাজাতলায় নামি। হাওড়া থেকে মাত্র দুটি স্টেশনের পরেই রামরাজাতলা। এমন কিছু দূরও নয়। কিন্তু মুশকিল হল, ট্রেনে উঠে সহযাত্রী হিসেবে কাউকে না পেয়ে। পুরো বগিটা একেবারে সুনশান। ভয় করতে লাগল খুব। কেননা দিনকাল খারাপ। বিশেষ করে টিকিয়াপাড়ায় সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য খুব। যদি কেউ সেখানে ওঠে এবং বদ মতলব প্রয়োগ করে তা হলে উপায়? একা আমার পক্ষে তাদের প্রতিহত করা কখনওই সম্ভব নয়।

এই লাইনের ট্রেনে সময় বলে কিছু নেই। তার ওপর ধীরে চলো নীতিতে চলে। তাই ধীর শ্লথ গতিতে চলতে লাগল ট্রেন। যেতে যেতে খানিক পরেই আলো নিভে অন্ধকার হয়ে গেল। সে কী ভীষণ অন্ধকার! দুটি পাওয়ার স্টেশনের আউট অব কানেকশনের জন্য এইখানে প্রতিদিনই এইরকম হয়। খানিক যাওয়ার পর আবার আপনা থেকেই আলো জ্বলে ওঠে। এবারও তাই হল। আলো জ্বলতেই আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সাদামাঠা পোশাক পরে কামরার মাঝামাঝি জায়গায় জানলার ধারে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। ভদ্রমহিলার বয়স খুব বেশি হলেও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের ওপরে কখনও না। এই প্রচণ্ড শীতে খোলা জানলার ধারে উনি যে কী করে বসে আছেন তা ভেবে পেলাম না। সবচেয়ে রহস্যের ব্যাপার, উনি উঠলেনই বা কখন? না কি আমারই চোখের ভুল? তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ট্রেন ধরেছি বলে আদৌ ওঁকে লক্ষ করিনি। হয়তো তাই। তবুও আমি একা থাকায় নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য আমার সিট ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁর মুখোমুখি বসলাম।

ভদ্রমহিলা একবার ফিরেও তাকালেন না আমার দিকে।

অবশেষে আমি নিজেই আলাপ জমাতে গেলাম তাঁর সঙ্গে। বললাম, "কী ব্যাপার! আপনার সঙ্গে কেউ নেই? এত রাতে একা কোথায় চলেছেন?"

ভদ্রমহিলা একই ভাবে বসে রইলেন। কথার উত্তরই দিলেন না আমাব। এমনকী আমার দিকে চেয়েও দেখলেন না পর্যন্ত।

আমি আবাব বললাম, "কিছু মনে করবেন না। দিনকাল খারাপ, তাই বলছি। আমারই একা যেতে ভয় করছে। অথচ আপনি...!"

ভদ্রমহিলা এবারও নিশ্চুপ। ফলে আলাপ আর জমল না। দরকারই বা কী?

ট্রেন টিকিয়াপাড়ায় থামল।

একবার ভাবলাম, নেমে গিয়ে গার্ড কম্পার্টমেন্টের পাশে উঠি। আবার ভাবলাম, আর তো মাঝে একটা স্টেশন। তারপরই রামরাজাতলা। একেবারে সেখানেই নামব। তাই চুপচাপ বসে রইলাম। বসে বসে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে নানারকম চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম। মনে মনে আহতও হলাম একটু। কারও সঙ্গে যেচে কথা বলতে গেলে তিনি যদি উত্তর না দেন বা এড়িয়ে যান, তা হলে খুবই অসম্মান বোধ হয়। যাই হোক, উনি কথা বলুন আর নাই বলুন আমার কী আসে যায়? আমি তো মনের মধ্যে কোনও বদ উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলতে যাইনি। একা কোনও মহিলাকে রাতের গাড়িতে এইভাবে দেখলে কৌতূহল একটু হয় বইকী! বিশেষ করে উনি যখন একজন ভদ্রমহিলা।

সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেন দাশনগরে ঢোকবার মুখেই থেমে গেল। সেও প্রায় দশ মিনিট। তারপর দাশনগরে। দাশনগর পেরিয়ে রামরাজাতলায় ঢোকবার মুখে বেলতলা ক্রসিং-এ আবার একবার। তারপর রামরাজাতলা। রামরাজাতলা পার হতেই সাঁতরাগাছি। সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ামাত্রই আমার খেয়াল হল, এ কোথায় চলেছি আমি? আমার তো রামরাজাতলায় নামবার কথা! ওই মহিলার দিকে মনোনিবেশ করায় এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম যে, নিজের স্টেশনই ছেড়ে এলাম! আমি আর কোনওরকম ভাবনাচিন্তা না করে চলন্ত ট্রেন থেকেই লাফিয়ে নামতে গেলাম। যেই না নামতে যাব অমনই হঠাৎই সেই ভদ্রমহিলা উঠে এসে একটা হাত ধরে টান দিয়েছেন আমায়।

ট্রেন তখন প্ল্যাটফর্মের বাইরে। আমি খুবই বিরক্ত হয়ে বললাম, "দিলেন তো আমার নামার সুযোগটা নষ্ট করে! এখন আমি কী করব? সাঁতরাগাছিতে নামলে যেভাবেই হোক পাড়ার ভেতর দিয়ে কুকুরের তাড়া খেয়ে হেঁটেও আমি বাড়ি পৌঁছতে পারতাম। এখন আমার সে উপায়টুকুও রইল না।"

ভদ্রমহিলা আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আবার গিয়ে বসলেন সেই জানলার ধারে।

আমি প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে মৌড়িগ্রামে নেমে পড়লাম। ট্রেন চলে গেলে আপ প্ল্যাটফর্ম থেকে ডাউন প্ল্যাটফর্মে এসে স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে গেলাম। আজ রাতে হাওড়া যাওয়ার আর কোনও ট্রেন নেই। ফলে বাধ্য হয়েই এখানে রাত কাটাতে হবে। একেবারে শেষ রাতে একটা লোক্যাল আছে অবশ্য, সেও তো তিন-চার ঘণ্টার ব্যাপার। আমার চোখ ফেটে যেন জল এল। আমি স্টেশনমাস্টারের কাছে গিয়ে আমার অবস্থার কথা জানিয়ে রাতটুকুর মতো তাঁর কাছে আশ্রয় চাইলাম। ভদ্রলোক আমাকে বিমুখ করেননি। তাঁর ঘরে একটু বসবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

সারারাত সেই দুঃসহ শীতে মশার কামড় খেয়ে কী করে যে কাটল তা আমার মতো অবস্থায় যিনি পড়েছেন একমাত্র তিনিই জানেন। বহুকষ্টে তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর শেষরাতে একটা মেচেদা লোক্যাল পেয়ে গেলাম। এই ট্রেনে অবশ্য লোকজন যথেষ্টই ছিল। এদের মধ্যে ব্যাপারিই বেশি। তাই আর কোনও অসুবিধে হল না।

মৌড়িগ্রাম থেকে রামরাজাতলা মাত্র ন' মিনিটের পথ। ট্রেন থেকে নেমে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। তারপর স্টেশন থেকে বাড়ি যখন ফিরলাম তখন দেখলাম বাড়ির লোকেদের চোখমুখে রীতিমতো দুশ্চিন্তার ছাপ। সারারাত একজন মানুষ বাড়ি না ফিরলে যা হয় আর কি!

যাই হোক, আসল ব্যাপারটা বাড়িতে আমি সম্পূর্ণ চেপে গেলাম। বললাম, কাল রাতে ফিরতে দেরি হওয়ায় লাস্ট ট্রেনটা একটুর জন্য মিস করি। তাই সারারাত হাওড়া স্টেশনে পড়ে থেকে ভোরের প্রথম ট্রেনেই আসছি। এই বলে বিছানায় শুয়ে তেড়ে একটা ঘুম দিয়ে শরীরটাকে ঝরঝরে করে নিলাম।

এই কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি ঘটলে এটা আর গল্প হত না। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই টিকিয়াপাড়ার কাছে নটবর পাল রোডের একটা বাড়িতে আমার ভাগিনেয়র জন্য মেয়ে দেখতে গেলাম। মেয়েটি সুন্দরী না হলেও চলনসই। আমাদের পছন্দ হওয়ার ব্যাপারটাও ওঁদের জানিয়ে দিলাম।

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমাদের মতামত জেনে কন্যাপক্ষের লোকেরা পরমানন্দে দোতলায় নিয়ে গেলেন মিষ্টিমুখ করাতে। এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং। অন্ধকারে ভরে গেল চারদিক। আর ঠিক তখনই যা দেখলাম তাতে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। ঘরের দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছবি টাঙানো ছিল। সেই অন্ধকারেও ছবিটা যেন হঠাৎ কীরকম স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখলাম এই ছবি আর কারও নয়, সে রাতে ট্রেনের কামরায় দেখা সেই ভদ্রমহিলার। সবচেয়ে আশ্চর্য! ছবির মুখ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার চোখে পাতা পড়ছে। ঠোঁট দুটো নড়ছে। আর—

আর কিছুই আমার মনে নেই। সামান্য কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম। পরে অবশ্য খবর নিয়ে জেনেছিলাম, ওই ভদ্রমহিলা মেয়েটির মা। বছরখানেক আগে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে টিকিয়াপাড়ার কারশেডের কাছে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। বলা বাহুল্য, এর পরে ওই বাড়িতে আমার ভাগিনেয়র বিয়ের ব্যাপারটা আমরাই বাতিল করে দিয়েছিলাম।



করিম ফকিরের বন

বেহালার পরুই দাস পাড়া রোডে, পরুই মৌজায় আমাদের এক বন্ধু থাকে। তার নাম সুভাষ। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের প্রাণবন্ত এই ছেলেটি আমাদের সহকর্মীও। একই অফিসে চাকরি করি আমরা। ওর বউ ফোর্ট উইলিয়ামে চাকরি করে। বেশ সুখী পরিবার ওদের।

তা একদিন হচ্ছিল কি, বৃষ্টি-বাদলার জন্য সেকশনে স্টাফেদের অনুপস্থিতির ফলে মাত্র কয়েকজন আমরা নানারকম গল্পগুজবে মেতে উঠেছিলাম। অশোকবাবু, নিমাই, মুকুলদা, বাচ্চুদা এইরকম কয়েকজন ছিলাম। নানারকম মুখরোচক গল্প করতে করতে একসময় ভূতের প্রসঙ্গে চলে এলাম। এইখানে একটু বলে রাখি, নিমাই থাকে হুগলি জেলার রূপরাজপুর গ্রামে। ও ওইসব জায়গা থেকে লোকমুখে শোনা কিছু অবাস্তব বা ভৌতিক ঘটনার কথা আমাদের কাছে গল্প করে। আর আমরা তা কানখাড়া করে শুনি। সেদিনও সে ওইরকমই কিছু একটা যেন বলছিল। এমন সময় সুভাষের আবির্ভাব।

সুভাষ খুব আমুদে ছেলে। কাজেই ও যখন ঘরে ঢোকে সবাই তখন টের পায় যে একজন এল। রোজের মতোই ঘরে ঢুকে সুভাষ একটা চেয়ার টেনে সবার মাঝখানে বসে বলল, "কীসের এত মজলিশ হচ্ছে জানতে পারি কী?"

বাচ্চুদা বলল, "গাঁজা না খেয়েও গাঁজাখুরির গল্প হচ্ছে আমাদের। নিমাইটা তো বিয়ে-থা করল না, এখন রোজই নাকি ভূত দেখছে।"

সুভাষ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তোমরা ভূতে বিশ্বাস করো?"

মুকুলদা বলল, "ভূত যদিও দেখিনি, তবুও কেউ যদি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে সে নিজে ভূত দেখেছে তা হলে হয়তো বিষয়টা বিবেচনা করে বিশ্বাস করে দেখতে পারি।"

সুভাষ বলল, "তোমরা কেউ করো না করো, আমি করি। তার কারণ এই ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে আমার।"

"বলো কী!"

"ঠিকই বলছি। যদি শোনো, তোমরাও বিশ্বাস না করে পারবে না।"

সুভাষের এই কথায় সকলেই প্রায় চমকে উঠল। কেননা সুভাষকে যারা চেনে তারা কিছুতেই ওর কথা অবিশ্বাস করবে না। সব ব্যাপারে অবিশ্বাসী এমন কেউ যদি বলে যে বিশেষ ওই ব্যাপারটা সে বিশ্বাস করে, তাকে অবিশ্বাস করবে কে? সুভাষ যেমন বেপরোয়া, তেমনই ডাকাবুকো। কথায় কথায় সব ব্যাপারকে নস্যাৎ করে দেওয়ায় ওর জুড়ি নেই। যা ধ্রুব সত্য তাকেও এককথায় গুলতাপ্পি বলতে ওর আটকায় না। এহেন সুভাষ কিনা ভূতের মতো অদ্ভুত এবং অলীক একটা ব্যাপারকে বিশ্বাস করে? বলা যায় না কার দুর্বলতা কোথায়!

মুকুলদা বলল, "তা হলে বলো দেখি ভৌতিক বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতাটা কীরকম?

ভূত তো আমরা দেখিনি। বর্ষার দুপুরে ভূতের গল্পটাই শুনি।"

সুভাষ বলল, "তোমরা হয়তো মনে মনে হাসছ, তা হাসো। কেউ বিশ্বাস করো না করো আমি করি। তার কারণ, ছোটবেলায় নিজেই আমি একবার ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম।"

সুভাষের এই কথায় সবাই আমরা নড়েচড়ে বসলাম। চোখে ঔৎসুক্য নিয়ে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

বাচ্চুদা বনবিহারীকে চায়ের অর্ডার দিতে সুভাষ ওর গল্প শুরু করল।

গল্পটা ওর মতো করেই বলছি :

আমার বয়স তখন বারো। আমি পূর্ববাংলার ছেলে। আমাদের বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ সাব ডিভিশনে (থানা-মগ্‌সিদপুর) লখাইয়ের চর নামে একটি গ্রামে। তোমরা তো এদেশি ছেলে, পূর্ববাংলায়, মানে এখন যাকে বাংলাদেশ বলা হয়, সেখানকার গ্রাম সম্বন্ধে তোমাদের কীরকম ধারণা তা জানি না। তবে তখনকার সেই গ্রাম ছিল কবির কল্পনার গ্রাম। মাটির ঘর। খড়ের চালা। তার ওপর গজিয়ে ওঠা লাউপালার লকলকানি—সে যে কী সুন্দর তা বলে বোঝানো যাবে না। আর ছিল নারকেল, সুপারি ও কলাবউয়ের ঘোমটা টানা ছায়াশীতল আঙিনা। যেন স্বপ্নের দেশ ছিল। তা একবার হল কি, আমার মা আমাকে খেতের কিছু ডাল দিয়ে দূরের বাউসখালির হাটে পাঠালেন সেই ডাল বেচে কিছু মাছ কিনে আনতে। বাউসখালির হাট আমাদের গ্রাম থেকে অনেকদূর। প্রায় চার-পাঁচ মাইল তো হবেই। পথে একটা সাঁকোও পার হতে হয়। ভারী সুন্দর জায়গাটা। সেখানে একটা নদীও আছে। নদীর নাম কুমার নদী। সেই কুমার নদীর পাড়ে উঁচু বাঁধের ওপর বাউসখালির হাট বসে। সপ্তাহে একবার। কত কী যে বিক্রি হয় সেই হাটে, তা বলার নয়! হাটবারে সেই জায়গাটা যেন ছোটখাটো একটা মেলার রূপ নেয়। নদী পুকুরের টাটকা মাছ, কাঁচা আনাজ, বেতের বোনা ধামা-কুলো, গোরুর গাড়ির চাকা, লাঙল, তেলেভাজা, মিষ্টি, এমনকী দরজা-জানলা পর্যন্ত বিক্রি হয় সেই হাটে। অন্ধ ভিখারি গান গেয়ে, যাযাবরী মেয়েরা নাচ দেখিয়ে পয়সা নেয়। তা ছাড়া বায়োস্কোপের বাক্সয় ছবি দেখা, বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে বেলুন ফাটানো সবকিছুই হত সেই হাটে।

যাই হোক. আমি সেই ডাল বেচে যে পয়সা পেলাম তাতে বড় বড় কয়েকটা গলদা চিংড়ি কিনে হাট ঘুরতে লাগলাম। এই হাটের মজা ছিল এই যে, কোনও কিছু কেনবার না থাকলেও লোকে মেলা বেড়ানোর মতো এই হাটে বেড়াতে আসত। তা এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে বেলা গড়িয়ে গেল । সন্ধে হয় হয়। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সর্বনাশ! বাড়ি ফিরব কী করে? অনেক দূরের পথ। তাই সাহসে বুক বেঁধে কয়েকজন লোকের সঙ্গ নিয়ে পথ হাঁটতে লাগলাম।

কিছু পথ আসবার পর সেই লোকগুলোও আবার অন্যদিকে বেঁকে গেল। তখন তো এত মানুষজন ছিল না যে, সবসময়ই কোথাও না কোথাও লোক থাকবে! চারদিকে তখন বনজঙ্গল, ধানের খেত। মাঝে মাঝে বড় দিঘি। ছোটখাটো পুকুরও দু-একটা চোখে পড়ত। তা কী আর করি, আমি নিজের মনেই গান গাইতে গাইতে পূর্ণ উদ্যমে পথ চলতে লাগলাম।

যেতে যেতেই সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হল। আমাদের গ্রামে যাওয়ার সহজতম পথটি ধরেই আমি চলা শুরু করলাম।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎ একসময় গায়ের ওপর কেমন যেন এক ধরনের

শিরশিরিনি অনুভব করলাম আমি। প্রথমে ব্যাপারটায় ততটা আমল দিইনি। পরে যখন মনে হল কেউ যেন আমার ঘাড়ের পাশ দিয়ে মুখ এনে গায়ে নিশ্বাস ফেলছে তখনই কেমন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বেয়ে গেল আমার সারা দেহে। সেই নিশ্বাস বরফের মতো শীতল। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকেই যখন দেখতে পেলাম না, তখন রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। ভয় পেলেও ভেঙে পড়লাম না একেবারে। কেননা ভেঙে পড়ে তো লাভ নেই। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতেই হবে। তাই সাহসে বুক বেঁধে আরও জোরে এগিয়ে চললাম।

যেতে যেতে একসময় আচানিপুকুরের পাড়ে এসে উঠলাম। এই পুকুরটা আবার ভীষণ দোষাস্ত পুকুর । কত ছেলে, মেয়ে, লোক যে স্নান করতে এসে ডুবে মরেছে এখানে, তার কোনও লেখাজোখা নেই। এই পুকুরের পাড়ে বাঁশবন। তার ভেতর দিয়ে এই রাতদুপুরে পথচলা একটা অসম্ভব ব্যাপার। আবার বাঁশবন বাদ দিলেও পুকুরের ধার ঘেঁষে করিম ফকিরের তালবাগান। সেও অতি সাংঘাতিক জায়গা। তবু আমি বাঁশবনে না ঢুকে করিম ফকিরের তালবনেই ঢুকে পড়লাম। ফাঁকা মাঠের বুকে সারিবদ্ধ তালগাছের ঘন সমারোহ। তারই ফাঁকে ফাঁকে পায়েচলার পথ। এই করিম ফকিরের তালবাগানকে নিয়েও অনেক রোমহর্ষক ঘটনার কথা শুনেছিলাম। এখানে আসামাত্রই এবার সেইসব কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। ভূতের উপদ্রবের জন্য এই তালবাগানও কুখ্যাত ছিল খুব।

অজানা ভয়ে সারা শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমাট বেঁধেছে তখন আমার মুখে। হাত পা কাঁপছে। বুক ঢিপ ঢিপ করছে। আসলে ভয়ের ব্যাপারটা মনের মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে তাকে আর তাড়ানো মুশকিল। আমি 'রাম রাম' করতে করতে এগিয়ে চললাম। কিন্তু গেলে কী হবে, কিছু পথ আসার পরই বুঝতে পারলাম রাম নামেও সবসময় ভূত পালায় না। যেতে যেতেই আমার চোখে পড়ল ঠিক আমার পাশে-পাশেই দুটি কালো পা অস্পষ্টভাবে আমার সঙ্গে হাঁটায় পাল্লা দিচ্ছে। ওই দৃশ্য দেখে একবার মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাব। পরক্ষণেই নিজেকে শক্ত করে নিলাম। ছেলেমানুষ হলে কী হবে, বরাবরই আমার মনোবল ছিল প্রবল। আমি চলেছি আর আড়চোখে দেখছি। শুধু দুটি কালো পা আর হাঁটুর ওপরে ধুতির একাংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উপরিভাগ সম্পূর্ণই অদৃশ্য।

এইবার শুরু হল আর এক ঝামেলা। আমি যাচ্ছি আর যেতে যেতে বুঝতে পারছি আমার থলির ভেতর থেকে এক-একটি গলদা মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে মাটিতে পড়ছে। আর মজার ব্যাপার এই যে, যতবার আমি সেই মাছ কুড়িয়ে থলিতে ভরতে যাচ্ছি ততবারই একটা অদৃশ্য হাত এসে আমার আগেই মাছ কুড়িয়ে থলিতে ভরে দিচ্ছে। আমি যে এবার সত্যি-সত্যিই ভূতের পাল্লায় পড়েছি, তা বুঝতে আর দেরি হল না।

এই মাঠ পেরোলেই আমাদের গ্রাম। অথচ এতবড় মাঠ পেরোতেও সময় লাগে । কিন্তু এইভাবে কতক্ষণ যাওয়া যায়! আমি থলিটাকে মুঠো করে ধরে বুকের কাছে এনে প্রাণপণে দৌড় লাগালাম এবার। অমনই সে কী ফোঁসফোঁসানি। করিম ফকিরের বনে যেন ঝড় উঠল। আকাশে মেঘ নেই। তারার ফুল ফুটে আছে। আর তালবনে ঝড়। সেই ছোটার সময়ই দেখলাম, যে কালো পা দুটি আমার সঙ্গে হাঁটায় পাল্লা দিচ্ছিল সে দুটি ক্রমশ বড় হতে হতে বিশাল এক মানুষের আকার নিল। তালগাছ সমান চেহারা। তারপর একসময় মিলিয়ে গেল। আর আমি ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের ঘরের উঠোনে ধড়াস করে পড়লাম।

সবাই 'কী হল, কী হল' করে এসে ধরল আমায়। চোখেমুখে জল দিতে লাগল। কিন্তু, আমি তখন কেমন যেন বোবা হয়ে গেলাম। সকলের মুখের দিকে অপরিচিতের মতো

তাকিয়ে রইলাম ফ্যালফ্যাল করে।

ইতিমধ্যে আমার দেরি দেখে বাড়ির লোকেরা দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এমনকী আর একটু দেরি হলে আমার খোঁজে লোক পাঠানোর ব্যবস্থাও হচ্ছিল। তা নিজের থেকেই এসে যখন পড়লাম, তখন নিশ্চিন্ত হল সকলে।

আমার ঠাকুরমা আদর করে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, "ছেলেটা কেমন যেন হয়ে গেছে দ্যাখো। আসলে রাতদুপুরে মাছ নিয়ে আসছিল তাই করিম ফকিরের বনে ঠিক ভূতের পাল্লায় পড়েছিল। শিগগির তোমরা রোজা ডেকে আনো। না হলে সারাজীবন এইরকম কালাভোলা মেরে থাকবে।"

মা বললেন, "ওইজন্যই তো একা-একা ওকে কোথাও পাঠাই না। যা আড্ডাবেজে ছেলে। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু হাঁ করে দেখছিল, বা কারও সঙ্গে খেলছিল। না হলে এত রাত হওয়ার তো কথা নয়!"

ঠাকুরমা আবার বললেন, "তুই কি পথে কিছু দেখেছিলি?"

আমি অতিকষ্টে বললাম, "হ্যাঁ।"

"করিম ফকিরের বন দিয়ে এসেছিলি নিশ্চয়ই?"

আমি কোনওরকমে হ্যাঁ বলে মুখ নামালাম। তারপর ঠাকুরমার নির্দেশে বাড়ির লোকেরা একজন ওঝাকে ডাকিয়ে আনল। ওঝা এসে অনেক ঝাড়ফুঁক করল আমাকে। পাটকাঠি পুড়িয়ে ধোঁয়া দিল। জলপড়া খাওয়াল। এর পর প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে আমি একটু সুস্থ হলাম।

এদিকে হয়েছে কি, আমার সেই থলিভর্তি মাছ যা ছিল, তার দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তবে দুঃখের বিষয়, সেই মাছগুলির মধ্যে শাঁস বলে কোনও পদার্থ ছিল না।

এই বলে সুভাষ ওর গল্প শেষ করল।

ওর কথা আমরা কেউ অবিশ্বাস করলাম না। তার কারণ, সুভাষের মুখে কথার খই ফোটে। মুখে যা আসে তাই বলে, তবে কিনা ও কখনও মিথ্যে বলে না।



কালো সেনের ক্ল্যারিওনেট

হাওড়ার বিখ্যাত কালো সেনের নাম কে না শুনেছে? অতবড় একজন যাত্রাদলের ক্ল্যারিওনেট বাদক তখনকার দিনে আর কেউ ছিল না। কালো সেনের ক্ল্যারিওনেট ছাড়া জমতই না কোনও যাত্রার আসর। তা সেই কালো সেন একবার ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন। কীরকম? শোন তা হলে গল্পটা! আমি শুনেছিলাম আমার মামা, যাত্রা জগতের এক দিকপাল অভিনেতা, চণ্ডী ব্যানার্জির কাছ থেকে।

সেবার মছলন্দপুরের কাছে কোনও এক গ্রাম থেকে যাত্রার বায়না এসেছিল আমাদের। কোনও এক গ্রাম বলছি এই কারণে যে, গ্রামের নামটা আমার ঠিক মনে নেই। তখন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস।

প্রচণ্ড গরমের দিন। সেই গ্রামে চব্বিশ প্রহরার হরিসভা উপলক্ষে যাত্রা। আমরা সবাই শিয়ালদা থেকে ট্রেনে রওনা হলাম মছলন্দপুরের দিকে। কয়লার ইঞ্জিনের গাড়ি। ঝিকি ঝিকি ঝিকি ঝিকি করে ছুটে চলল গাড়িটা। আমাদের দলের সমস্ত অভিনেতা এবং অন্যান্য কলাকুশলীরা আছেন। নেই শুধু কালোদা। কালোদা আমাদের অনেক আগে সকালের গাড়িতে চলে গেছেন। তার কারণ এই লাইনেই কোথায় যেন তাঁর মেয়ের বাড়ি। তার সঙ্গে একটু দেখা করে মছলন্দপুর স্টেশনে হাজির হবেন এইরকমই কথা ছিল। তা ট্রেনে যেতে যেতে আমরা দেখতে পেলাম ঘন কালো একটা মেঘ ধীরে ধীরে আকাশটা ছেয়ে ফেলছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে তখন। কিন্তু সেই বিকেলেও যেন সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। তবে যে প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছিলাম আমরা, তার থেকে কিন্তু অব্যাহতি পেলাম। খানিক বাদেই ঝড় উঠল। কালবৈশাখীর ঝড়। ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দে মনে হল, ট্রেনটাকেও উড়িয়ে নেবে বুঝি! আমরা ধুলোর হাত থেকে বাঁচবার জন্য ট্রেনের জানলার কাচ উঠিয়ে দিলাম। একটু পরেই শুরু হল বৃষ্টি। সেইসঙ্গে ন্যাপথলিনের মতো শিল। যতদূর চোখ যায় শুধু বরফের আস্তরণ। তবু তারই মধ্যে আমরা সন্ধের মুখে মছলন্দপুরে ট্রেন থেকে নামলাম।

অত জল ঝড়েও দুটি গোরুর গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমরা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে গিয়ে বসতেই যাত্রার আহ্বায়করা এসে দেখা করলেন আমাদের সঙ্গে।

বৃষ্টি তখনও পড়ছিল এবং বেশ ঝমঝমিয়ে। কাজেই সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরনোর কোনও প্রশ্নই ছিল না। তবুও ওদের আহ্বায়ক দয়ালবাবু বললেন, "মহাশয়গণ! আপনারা যে সেই কলকাতা থেকে এতদূরে গাওনা গাইতে এসেছেন এতে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তবে দোহাই আপনাদের, এই দুর্যোগ দেখে ফিরে যাবেন না যেন। আজ রাতে না হয় কাল রাতেও গাওনা আমাদের হবেই। দুর্যোগের ব্যাপারে আমাদের তো কোনও হাত নেই। এসব হচ্ছে গিয়ে বিধির বিধান। তাই—"

আমরা বললাম, "না না। ফিরে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সে ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমাদের কালোদাকে নিয়ে। কালো সেনের ক্ল্যারিওনেট ছাড়া আমাদের যাত্রা তো জমবে না। তা সেই কালোদাই যে নেই।"

"আসেন নাই তিনি!"

"না। এইখানেই কোথায় যেন তাঁর মেয়ের বাড়ি। উনি সকালের গাড়িতে মেয়ের বাড়িতে এসেছেন। কথা ছিল এই গাড়িতেই উনি আমাদের সঙ্গে এসে একসঙ্গে যাবেন।"

"তা। তার জন্য অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। যা দুর্যোগ গেল তাতে মনে হয় উনি ঠিক সময়ে এসে ট্রেন ধরতে পারেননি।"

"পরের গাড়ি কখন?"

"সে তো রাত বারোটায়।"

"সর্বনাশ! এখন তা হলে কী করা যাবে?"

"চিন্তার কিছু নাই আপনাদের, বৃষ্টি থামলে আপনারা এগিয়ে চলুন। তারপর যদি উনি রাত বারোটার গাড়িতে আসেন তা হলে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করে রাখব।"

আমরা বললাম, "তা না হয় হল। কিন্তু যদি তিনি বারোটার গাড়িতেও না আসেন তা হলে? তা হলে কী হবে?"

"কী আর হবে বাবু? মানুষের সুখ অসুখ তো আছেই। একান্ত উনি আসতে না পারেন ক্ল্যারিওনেট বাজাবার লোক আমরা আশপাশের গ্রাম থেকেই ধরে আনব। মনের মতো হয়তো হবে না আপনাদের, তবু কাজটা তো চালিয়ে দেবে।"

আমরা এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কেননা কালো সেনের ক্ল্যারিওনেট ছাড়া আমাদের যাত্রার দলকে কেউ যে মেনে নেবে তা কিন্তু ভাবতেই পারিনি।

বেশ একটু রাত করেই বৃষ্টি থামল। বৃষ্টি থামলে আমাদেরও যাওয়ার পালা।

তা আমরা যখন যাওয়ার তোড়জোড় করছি তখন আমাদের অধিকারী মশাই বললেন, "দেখুন মশাইরা, রাত যখন হয়েই গেল, আর আজ রাতে যাত্রা হওয়ার যখন কোনও সম্ভাবনাই নেই, তখন আর একটু অপেক্ষা করে কালোদার জন্য বারোটার গাড়িটা দেখেই যদি রওনা দিই তো ক্ষতিটা কী? আমার মনে হয় সেটা করাই ভাল! তাতে কালোদার কাছে আমাদের আন্তরিকতাটা বেশ ভালভাবেই প্রকাশ পাবে।"

অধিকারীর কথায় আমরা সবাই একমত। কেননা হাজার হলেও এটা একটা মানসিকতার ব্যাপার। এই দূর দেশে ভিন গাঁয়ে দুর্যোগের রাতে একজন মানুষের জন্য অপেক্ষা না করে তাকে একা রেখে স্বার্থপরের মতো চলে যাওয়াতে কারও সায় ছিল না। তাই বারোটার গাড়ি পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলাম।

কিন্তু না। অপেক্ষা করাটাই সার হল আমাদের। বারোটার গাড়িতেও কালোদা এলেন না। এটা কিন্তু একটা অঘটন। কেননা কালোদার অনুপস্থিতি এবং মধ্যরাতে সূর্যোদয় দুটোই অসম্ভব ব্যাপার। তবে কি কালোদার কিছু হল? শরীর খারাপ করল না তো? হাই প্রেসারের রোগী। বলা তো যায় না!

এমন সময় হঠাৎই এক চমকপ্রদ সংবাদ। এই ট্রেন থেকে এমন এক যাত্রী স্টেশনে নামলেন যিনি আমার পূর্বপরিচিত। আমাকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, "আরে চণ্ডীদা! এত রাতে চললে কোথায়?"

বললাম, "দেখতেই তো পাচ্ছ ভাই, যাত্রা গাইতে যাচ্ছি। তা জল ঝড়ের জন্য আটকে

গিয়ে দেরি হয়ে গেল।"

"কী আশ্চর্য! ঝড় জল তো অনেকক্ষণ থেমে গেছে।"

"তা গেছে। তবে এর আগের গাড়িতে আমাদের সঙ্গে কালোদার আসার কথা ছিল। তিনি আসেননি। তাই লাস্ট ট্রেনের অপেক্ষায় কালোদার জন্য বসে ছিলাম আমরা।"

"হায় কপাল! কালোদা আর আমি তো একসঙ্গেই এলাম। একই বগিতে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে একটুর জন্য আগের গাড়িটা ধরতে পারেননি উনি। তাই দারুণ আফসোস করছিলেন। এমন সময় সানকিভাঙার মাঠে গাড়িটা সিগন্যাল না পেয়ে থেমে গেলে একজন সহযাত্রীর কথা শুনে নেমে পড়লেন উনি। তোমরা যে গ্রামে যাচ্ছ সেই গ্রাম নাকি ওখান থেকে মাত্র মাইল দুই দূরে।"

আমরা হায় হায় করতে লাগলাম।

কর্মকর্তারা বললেন, "সর্বনাশ হয়ে গেছে মশাই।"

অধিকারী বললেন, "কেন? কেন?"

সানকিভাঙার দু'মাইল দূরে আমাদের গ্রাম ঠিকই, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যতসব ঠ্যাঙাড়ে আর ডাকাতের ঘাঁটি ওইদিকে। ও-পথে গেলে ওদের নজর এড়ানো অসম্ভব। ভদ্রলোক তো দেখছি বেঘোরে মরবেন।"

আমি এবার ট্রেনের ভদ্রলোককে বললাম, "আপনি তো মশাই স্থানীয় লোক। কালোদা যখন পরের কথা শুনে নামলেন ওখানে, তখন আপনি কেন বাধা দিলেন না তাঁকে?"

"অনেক বারণ করেছিলাম চণ্ডীদা। কিন্তু উনি শুনলেন না। কী বললেন জানো? বললেন, আজই হবে আমার শিল্পীজীবনের পরীক্ষা। মৃত্যুর দূত যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায় আর আমার এই ক্ল্যারিওনেটের জাদুতে যদি তাকে মোহিত করতে না পারি, তা হলে বৃথাই আমার সাধনা। আমি এইখানেই নামব।"

কর্মকর্তারা বললেন, "বলেন কী মশাই! উনি তো দেখছি মহানুভব লোক। নিজের শিল্প সত্তার প্রতি এত বিশ্বাস? একটু ভয়ডর নেই?"

অধিকারী বললেন, "জাত শিল্পী কি ওসব ভয়ে ভীত হয় মশাই? আসলে এটা একটা গড্‌পাওয়ার।"

কর্মকর্তারা বললেন, "তবে আমাদের মনে হয় যে লোকটি ওঁকে সানকিভাঙায় নামিয়েছে সে নিশ্চয়ই ডাকাতের লোক। ডাকাত না হলে এত রাতে কেউ ওখানে নামবে না, বা কাউকে নামতেও বলবে না। আর এই ডাকাতদের জন্যই রোজ রাতের গাড়িগুলো ওখানে থামে। না থামানো ছাড়া উপায়ও নেই। ওদের কথা না শুনলে রেল কর্মচারীগুলোই আচমকা যখন-তখন মারধোর খেয়ে মরবে।"

যাক, কালোদার কপালে কী আছে তা ভগবানই জানেন, এখন আমরা ভালয় ভালয় গ্রামে গিয়ে পৌঁছতে পারলে বাঁচি! আমরা সবাই গোরুর গাড়িতে চাপলাম। এবং কাদামাটির পথ পার হয়ে অতিকষ্টে গ্রামেও পৌঁছলাম। চাঁদ ও তারায় আকাশ তখন ঝলমল করছে। দুর্যোগের চিহ্নমাত্র আর নেই। তবে এও সত্যি, কালোদা গিয়ে পৌঁছতে পারেননি।

আমাদের সকলেরই মনে একটা আতঙ্ক জেগে উঠল। কালোদা কি তা হলে সত্যিই ডাকাতের হাতে পড়লেন? তা যদি না পড়েন তা হলে এতক্ষণ কী করছেন কালোদা? যে পথে উনি এসেছেন সেই পথে আমরা পৌঁছবার অন্তত ঘণ্টা দুই আগে ওঁর পৌঁছে যাওয়ার কথা!

যাই হোক, সে রাত দেখতে দেখতে কেটে গেল।

পরদিন সকালে কালোদার খোঁজে লোক গেল সানকিভাঙার দিকে। কিন্তু না। কেউ কোনও খবরই দিতে পারল না কালোদার।

আমরা দুঃখভরা মনে সে রাতে যাত্রার আসরে নেমে পড়লাম। অদ্ভুত ব্যাপার! কনসার্ট বেজে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই শোনা গেল কালো সেনের ক্ল্যারিওনেট। কী আশ্চর্য! কালো সেন নেই কিন্তু তার ক্ল্যারিওনেট বাজে কোত্থেকে? ক্ল্যারিওনেট অবশ্যই বাজছে! বাজাচ্ছে এক গ্রাম্য লোক। সে বলল, "মশাই বেসুরো বাজনদার বলে নেহাত নিরুপায় না হলে আমায় কেউ ডাকে না। কিন্তু এই আসরে বসে ক্ল্যারিওনেটে মুখ দেওয়ামাত্রই সুর যে কীভাবে বেজে উঠছে তা আমি বুঝতে পারছি না। আসলে এটা শুধু আমি আমার ঠোঁটেই ছুঁইয়ে রেখেছি কিন্তু আমি বাজাবার আগে আপন মনেই বেজে চলেছে ও।"

আমরা সত্যিই অবাক হলাম।

শুরু হল যাত্রা।

বাজতে লাগল ক্ল্যারিওনেট। সে কী অনবদ্য সুর! যেন মধু ঝরছে সুরে সুরে।

ভোরবেলা যাত্রা শেষ হল।

আমরা সে দিনটাও সেই গ্রামে বিশ্রাম নিলাম। তাই যাত্রা শেষ হওয়ার পর আমরা দু-তিনজন বন্ধু মিলে নিজেরাই একবার কালোদার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। সেই সানকিভাঙার মাঠের দিকে। এটা আমাদের কর্তব্য। আমরা তাঁর খোঁজখবর না নিয়ে ফিরে যাই কী করে?

সানকিভাঙার আশপাশের গ্রামের লোকেরা বলল, "বাবু! আমরা কুখ্যাত লোক। চুরি ডাকাতি আমরা করি বটে, তবে একজন শিল্পী লোককে আমরা শুধু শুধু মেরে ফেলব কেন? সে রাতে আমরা সবাই যাত্রার আসরেই ছিলাম। তারপর ঝড় জলে যে যেদিকে পেরেছি পালিয়েছি। আমাদের মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই পথ ভুল করে অন্য কোথাও চলে গেছেন। কেননা সে রাতে ওঁকে পথ বলে দেওয়ার মতো লোকও তো কেউ এ গ্রামে ছিল না।"

কথাটা অবিশ্বাস্যও নয়। কিন্তু পথ ভুল করে কোথায়ই বা যেতে পারেন কালোদা?

তবে কি কালোদা মারা গেছেন। তাঁর প্রেতাত্মাটা ট্রেনের ওই ভদ্রলোককে দেখা দিয়ে অন্যের কথা শুনে সানকিভাঙায় নেমে যান। এবং কালোদার প্রেতাত্মাই ওই আনাড়ি গ্রাম্য ক্ল্যারিওনেট বাদকের বংশীতে ভর করেন।

এইরকম ভেবেচিন্তে ফিরে আসছি। হঠাৎ—

হঠাৎই কানে এল সেই সুর। বেশ ভাল করে কান পেতে শুনলাম দূরাগত সেই বংশীধ্বনি।

আমার সঙ্গীদের বললাম, "শুনছিস?"

"শুনছি। কালো সেনের ক্ল্যারিওনেট।"

ডাকাত গ্রামের লোকেরা বলল, "বাবু, এই বাঁশিটা কিন্তু পরশু ঝড়জলের রাত থেকেই একভাবে বেজে চলেছে। আমরা ভাবছি আপনাদের যাত্রাদলেই কেউ বোধ হয় বাজাচ্ছে।

"কিন্তু শব্দটা আসছে কোনদিক থেকে?"

অনেক চেষ্টার পর সেই অস্পষ্ট সুরের উৎসের যখন দিকনির্ণয় করলাম তখন ওরা বলল, "বাবু ওদিকে তো ডহর। গভীর বন। ওদিকে যাবেন কী করে? ও বড় বিপজ্জনক জায়গা। সাপকাটি হয়ে মরবেন যে!"

আমরা বললাম, "তবু যাব।"

"তা হলে চলুন, শ্মশানের পাশ দিয়ে ঘুরে যাই।"

তা ভাগ্য ভালই বলতে হবে। হোগলার বন পার হয়ে সাপের কামড় এড়িয়ে শ্মশানের দিকে বাঁক নিতেই ক্ল্যারিওনেটের সুর প্রকট হল। আর শ্মশানের কাছাকাছি যেই না গেছি অমনই আনন্দে উল্লসিত হলাম আমরা।

সে কী অপূর্ব সুর!

কালো সেনের ক্ল্যারিওনেটের জাদুতে সেই বনাঞ্চলে নিভৃত শ্মশানে যেন মরা গাছে ফুল ফুটেছে।

আহা-হা। এই না হলে কালোদা!

আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি এক অদ্ভুত কাণ্ড! শ্মশানের পরিত্যক্ত একটি মাটির ঘরে দামি কার্পেটের আসনে রাজার পোশাক পরে বসে আছেন কালোদা। মাথায় উষ্ণীষ। কপালে চন্দন টিপ। গলায় গন্ধরাজের মালা! কালোদা মুদিত নয়নে এক মনে তাঁর ক্ল্যারিওনেট বাজিয়েই চলেছেন।

আমরা বিস্ময়ে হতবাক!

সবাই একজোটে ডাকলাম, "কালোদা?"

কালোদা শুনতেই পেলেন না আমাদের কথা।

আমরা আবার ডাকলাম, "কালোদা, আপনি এখানে বসে কী করছেন? আমরা যে চারদিকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! কালো সেনের ক্ল্যারিওনেট আরও মধুর সুরে বাজতে থাকে।

অবশেষে আমিই এগিয়ে গিয়ে গায়ে হাত দিলাম। আদর করে ডাকলাম, "কালোদা!"

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেলেন কালোদা।

আর কী আশ্চর্য! আমি স্পর্শ করামাত্র সেই উষ্ণীষ, রাজপোশাক, দামি কার্পেটের আসন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। রইল শুধু গলায় গন্ধরাজের মালাটা।

কালোদা হতভম্ব হয়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ কী! তোমরা! তোমরা এখানে কেন?"

"আপনি এখানে কেন?"

"আমি কোথায়?"

"আপনি শ্মশানে।"

"শ্মশানে! আমি মরে গেছি নাকি?"

"না। এখনও মরেননি। তবে আমরা না এলে মরে যেতেন।"

কালোদাকে আমরা ধরাধরি করে তুলে দাঁড় করালাম।

কালোদা বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো? কী থেকে কীসব হয়ে গেল যেন! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আর বুঝে কাজ নেই। আপনাকে যে আমরা ফিরে পেয়েছি এই আমাদের বাপের ভাগ্যি! এখন চলুন আমাদের সঙ্গে। একটু চান খাওয়া করে সুস্থ হবেন।"

কালোদা বললেন, "খাওয়া আমার যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু...!"

"পরে সব শুনব। এখন চলুন তো।"

আমরা কালোদাকে নিয়ে গ্রামে ফিরলাম। কালোদাকে ফিরে পেয়ে আমরা যত না খুশি তার চেয়ে বেশি খুশি যেন গ্রামবাসীরা। কেননা তারা সবাই একটা মস্তবড় বদনামের হাত থেকে বাঁচল।

কালোদাকে ফিরে পেয়ে ওঁর একটু সেবা-শুশ্রূষা করে জিজ্ঞেস করলাম, "একটু মনে করে দেখুন তো কালোদা, কী থেকে কী হল! মানে, আপনি কীভাবে ওই ভাঙা চালাঘরে গিয়ে ঢুকলেন?"

কালোদা বললেন, "হ্যাঁ! সব মনে পড়ছে আমার।" বলে তিনি যা বললেন তা হল এই:

সেদিন আমি যখন মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরছি তখন পথে হঠাৎ ঝড় জলে আটকে গেলাম। সে কী দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সেই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে যখন আমি স্টেশনে পৌঁছলাম তখন সবে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কী আর করি? পরের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরের গাড়ি তিন ঘণ্টা পর। তবু বসেই রইলাম। তা গাড়ি এল। চাপলাম। সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ হতে তাঁরা বললেন, "আপনি বৃথাই চিন্তা করছেন। আজ রাতে এই পরিস্থিতিতে যাত্রা অসম্ভব! আপনি ধীরেসুস্থে নিশ্চিন্তে যান।"

আমি তাই চললাম।

হঠাৎ এক জায়গায় ট্রেনটা সিগন্যাল না পেয়ে থেমে গেল।

একজন সহযাত্রী বললেন, "এখান থেকে মাত্র দু' মাইল হেঁটে গেলেই আপনার গন্তব্যস্থল। তবে কিনা জায়গাটা ভাল নয়। ডাকাতের আড্ডা এখানে। রাতে এ পথে যাওয়া অসম্ভব।"

আমি বললাম, "তা হলে আমি এইখানেই নামব।"

আমাকে অনেকেই ওখানে বারণ করলেন। কিন্তু আমি কারও কথাই শুনলাম না। আমি সেই অন্ধকারেই মাঠের মাঝখানে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম।

সবে দু-এক পা এসেছি এমন সময় দেখি মাঠের ওপর দিয়ে মশাল জ্বেলে একটা পালকি বেহারা সমেত এসে হাজির হল আমার সামনে। তারা বলল, "এত রাতে আপনি কোথায় যাবেন?"

আমি আমার পরিচয় দিতেই আনন্দে লাফাতে লাগল তারা। বলল, "আরে! আমরা তো আপনাকে নিতেই এসেছি।"

আমি বললাম, "কিন্তু আমি যে এখানে নামব তা আপনারা জানলেন কী করে?"

"জানতাম। কেননা ট্রেন তো এখানে থামে। তাই ভাবলাম যদি আপনি বুদ্ধি করে নেমে পড়েন তা হলে খুব ভাল হয়। আসুন, বসুন।"

আমি নির্ভয়ে চেপে বসলাম তাতেই!

এর পর ওরা আমাকে ওই বাড়িতে নিয়ে গেল। তারপর কত কী যে খেতে দিল তার ঠিক নেই। খাওয়াদাওয়া হলে ওরা বলল, "আপনি অত্যন্ত গুণী লোক। আমাদের খুব ইচ্ছে যে প্রাণভরে আপনার একটু বাঁশি শুনি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আপনারা কারা?"

"আমরা যেই হই না কেন, আপনার কোনও ভয় নেই। আমরা কেউ কোনও ক্ষতি করব না আপনার। আপনি বাজান।"

আমি ক্ল্যারিওনেটে ফুঁ দিলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে দেখি কী এক অদ্ভুত কাণ্ড! শ্মশানের শ' থেকে, গাছের ডাল থেকে, অন্ধকারের ভেতর থেকে দলে দলে সব ছায়ামূর্তিরা বেরিয়ে এসে নাচ শুরু করল। আমার পোশাক-পরিচ্ছদ সব পালটে গেল আর আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম। সারারাত ওরা নেচে নেচে ভোরবেলা মিলিয়ে গেল। এর পর দিনের আলোতেও আমি না পারলাম চোখ মেলতে, না পারলাম বাঁশি থামাতে। শুধু মাঝে মাঝেই শুনতে পেলাম, 'বাজিয়ে যাও কালো সেন, বাজিয়ে যাও। এমন আমরা কখনও শুনিনি।' এর পর দিন-শেষে সন্ধে হতেই আবার ওরা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে নাচ শুরু করল। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা সবকিছু ভুলে গেছি ভাই। তা এভাবে ক'দিন কেটেছে বলো তো?

আমরা সব বললাম। তারপর বললাম, "যে ক'দিনই কাটুক, ভগবানের দয়ায় আপনাকে যে ফিরে পেয়েছি এই ঢের! এখন ভালয় ভালয় পালাই তো চলুন।"

গ্রামবাসীদের সহায়তায় আমরা সেদিনই বিকেলের গাড়িতে কলকাতায় ফিরে এলাম, তবে এর পর থেকে কালোদা দল ছেড়ে একা একা কোথাও বাজাতে যাননি।



কাঞ্চনকন্যা

বাংলা ছায়াছবির যখন সুবর্ণযুগ তখন অধিকাংশ বাংলা ছবিরই শুটিং হত বল্লভপুরে। তা আমার আশৈশবের সঙ্গী রমেনদের বাড়ি ছিল সেখানে। ওই আমাকে ওদের গ্রামের একজনের মারফত জানিয়েছিল, "যদি নামকরা সব সিনেমা আর্টিস্টদের দেখতে চাস তো শিগগির আমাদের এখানে চলে আয়। প্রায় দশ-বারোদিন ধরে একটানা একটি ছবির শুটিং হবে এখানে।"

তখন আমার বয়স চোদ্দো বছর। স্কুলে পড়ি। কাজেই লাফিয়ে উঠলাম এই খবর শুনে। অনেক কষ্টে বাড়িতে রাজি করিয়ে এক সকালে হাওড়া ময়দানে এসে চেপে বসলাম মার্টিন কোম্পানির ট্রেনে। ছোটবেলায় এই ট্রেনে চাপার আনন্দ যে কী ছিল তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। যাই হোক বেলা দশটা নাগাত বল্লভপুরে এসে যখন পৌঁছলাম, রমেন তখন ওর বন্ধুদের নিয়ে স্টেশন সংলগ্ন একটি বটগাছের ঝুরি ধরে দোল খাচ্ছিল। আমাকে দেখেই হইহই করে ছুটে এল আমার দিকে।

অনেকদিন পর বন্ধুকে পেয়ে আমিও আনন্দে আত্মহারা হলাম। তারপর সবাই মিলে কলবল করতে করতে ওদের বাড়িতে যখন এলাম, তখন ওর মা-বাবাও আমাকে দেখে খুশি হলেন খুব।

দুপুরে একটা স্কুলবাড়ির সামনে শুটিং হল। স্কুলের ছেলেরা দেবদারু পাতা দিয়ে গেট তৈরি করছে, তারই শুটিং। ছবির নাম 'কাঞ্চনকন্যা'। ছবিতে ছেলেদের দলে রমেনও অংশ নিল। ওর অনুরোধে আমিও অংশ নিতে গিয়ে বাধা পেলাম। কিছু ছেলে আপত্তি করে বলল, "ও কি আমাদের স্কুলের ছেলে যে, ও অংশ নেবে? ওকে নিলে আমাদেরও সবাইকে নিতে হবে। তা না হলে ওকেও বাদ দেওয়া হোক।" মনটা আমার খুবই খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম এদের দলে থাকলে নিজের মুখটা বড় পর্দায় বেশ বড় আকারে দেখতে পাব আমি। আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে কত কদর হবে আমার। তার জায়গায়—। চোখে আমার জল এসে গেল। এই নিয়ে তো রমেনের মাথা গরম। আমাকে বাদ দেওয়ার কথা শুনে অন্য ছেলেদের সঙ্গে হাতাহাতি লাগিয়ে দিল সে। এই ছবির পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান দু'জনেই খুব ভালমানুষ। তাঁরা বললেন, "হলই বা বাইরের ছেলে। তবু একজন থাকলে ক্ষতি কী? তা ছাড়া বেশ তো ফুটফুটে ছেলেটি। থাকুক না আমাদের ছবিতে।" কিন্তু বললে কী হবে? রমেন তখন মারামারির দায়ে স্যারেদের আপত্তিতে নিজেই বাদ। ও তখন দারুণ রেগে 'ধ্যুৎ তেরি' বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল সেখান থেকে। আশাহত হয়ে মনটা আমার খুবই খারাপ হয়ে গেল।

পরদিন দুপুরে কানা দামোদরের তীরে আমরা দু' বন্ধুতে বসে প্রকৃতির শোভা দেখছি হঠাৎ সেখানে শুটিং পার্টি গিয়ে হাজির। ক্যামেরাম্যান আমাদের দেখেই বললেন, "এই তো,

তোমরা দু'জনেই আছ দেখছি। আমাদের এখনকার দৃশ্যে তোমরাই থাকবে। আর কাউকেই নেওয়া হবে না।"

পরিচালকেরও ওই একই মত। তাঁর নির্দেশে একজন মেকাপম্যান আমাদের দু'জনকে একটু ঠিকঠাক করে দিলেন। এই ছবির নায়িকা ছিলেন একজন নামকরা চিত্রাভিনেত্রী। তিনি এসে আমাদের দু'জনের মাঝখানে বসে কত গল্প করতে লাগলেন। সেই অভিনেত্রীকে দেখে বা তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমাদের জীবন তো ধন্য হয়ে গেল।

এদিকে ক্যামেরা রেডি করে পরিচালক আমাদের বুঝিয়ে দিলেন ছবির দৃশ্যটা কেমন হবে। রমেনের কাজ হবে গুলতি হাতে নদীর ভাঙন বেয়ে জলের দিকে নেমে যাওয়া আর আমার কাজ হবে অভিনেত্রীর ছেলে সেজে একটি পুঁটুলি হাতে নিয়ে বনের পথ ধরে অভিনেত্রীর সঙ্গে চলা। আমার ডায়লগ ছিল, "মা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?" অভিনেত্রী বলবেন, "কথা বলিস না, চুপ।" সেই মর্মে শুটিং হল। অতবড় একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে শুটিং, এ কী কম কথা? আমার আনন্দের আর অবধি রইল না।

তখনকার মতো শুটিং তো হল। কিন্তু গণ্ডগোল হল পরের শুটিং-এ।

পরের শুটিং হল অন্ধকার নেমে আসার পর। অভিনেত্রী আলুথালু বেশে ছুটে আসছেন "খোকা খোকা" করে। কৃত্রিম আলোয় আলোচিত করা হয়েছে বনপথ। ক্যামেরা রেডি। শুটিং স্টার্ট। অভিনেত্রী ছুটে আসছেন। উদ্বিগ্ন মুখে ডায়লগ, "খোকা খোকা!"

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "আমি এখানে মা।"

পরিচালক চেঁচিয়ে উঠলেন, "কাট—কাট—কাট।"

কে বলল এই কথা? ধারেকাছে কেউ তো নেই। তা হলে! অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর কাউকেই যখন পাওয়া গেল না, তখন আবার শুরু হল শুটিং।

কিন্তু আবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ক্যামেরাম্যান ও পরিচালক মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

কিছুক্ষণ পর ফের শুটিং শুরু হতেই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। অভিনেত্রী "খোকা! খোকা!" বলে ছুটে আসতেই দেখা গেল যেন মাটি ফুঁড়ে ফুটফুটে একটি শিশু উঠে এসে "মা আমি এখানে। মা!" বলে পিছু নিল।

অভিনেত্রী দারুণ ভয় পেয়ে আছড়ে এসে পড়লেন ক্যামেরার সামনে। ভয়ে কাঁপতে লাগলেন থরথর করে।

আবার শুরু হল খোঁজাখুঁজির পালা। কাদের শিশু? কোথা থেকে এল? কিন্তু না। কারও অস্তিত্বও পাওয়া গেল না সেখানে।

ক্যামেরাম্যান কিছুক্ষণ ক্যামেরায় চোখ রেখে একসময় বললেন, "এখানে আর শুটিং করা সম্ভব নয়।"

অভিনেত্রী বললেন, "সম্ভব হলেও আমি আর রাজি নই ওই দৃশ্যে অভিনয় করতে।"

পরিচালক গম্ভীর মুখে বললেন, "ব্যাপারটা কী হচ্ছে বলো তো?"

ক্যামেরাম্যান ইশারায় ডাকলেন পরিচালককে। তারপর ক্যামেরায় চোখ রাখতে বললেন।

পরিচালক ক্যামেরায় চোখ দিয়েই দেখতে পেলেন অগ্নিদগ্ধা এক ভয়ঙ্করী নারীমূর্তি একটি মৃত শিশুকে বুকে নিয়ে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। সেই দৃশ্য দেখেই জ্ঞান হারালেন তিনি।

শুটিং বন্ধ হল।

অনেক পরে পরিচালকের সংবিৎ ফিরলে উনি ওঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতেই অভিনেত্রীও বললেন, ওই একই দৃশ্য তিনিও দেখে খুব ভয় পেয়েছিলেন।

অতএব নীরবে প্রস্থান।

পরদিন সকাল হতেই শুটিং পার্টি বিদায় নিল গ্রাম থেকে। এই অলৌকিক এবং অবাস্তব ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ল লোকের মুখে মুখে। সবাই দিনের আলোয় চারদিক তোলপাড় করেও এই রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারল না।

আমিও দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে এলাম বাড়িতে। ব্যর্থতার কারণে মনটা দারুণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে রইল কয়েকটা দিন। সেই ছবির কাজও অসমাপ্ত রয়ে গেল পরিচালকের আকস্মিক মৃত্যুতে। তবুও সেদিনের সেই ঘটনার কথা মনে হলে আজও আমার ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। যদিও ক্যামেরায় চোখ রেখে ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখার মতো দুর্ভাগ্য আমার হয়নি।



চাঁপাডাঙার বাঁধ

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

সেকালে হুগলি জেলার চাঁপাডাঙায় দামোদর নদের বাঁধের ওপর দিয়ে সন্ধের পর চলাফেরা করবে অমন বুকের পাটা কারও ছিল না। কেননা ওইসব অঞ্চলের আশপাশের গ্রামগুলোতে তখন লোকবসতিও যেমন কম ছিল তেমনই ছিল ঠ্যাঙাড়ে ও ডাকাতের উপদ্রব।

তা একবার হল কি, তালপুকুর গ্রামের বিধুভূষণ নামে একটি ছেলে বাড়িতে বাবার অসুখের খবর পেয়ে কলকাতা থেকে চাঁপাডাঙায় এল। হাওড়া চাঁপাডাঙা লাইনে মার্টিন রেলের তখন সুবর্ণযুগ। তা সে যাই হোক, বিধুভূষণ যখন এল তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সঙ্গে ঘড়ি আংটি টাকাপয়সা সবকিছুই ছিল তার। চাঁপাডাঙা থেকে ওদের গ্রাম তালপুকুর হচ্ছে তিন-চার মাইলের পথ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই পথ সে পাড়ি দেবে কেমন করে?

গ্রামের ছেলের কাছে ওই পথ এমন কিছু নয়। তার ওপর সঙ্গে টর্চও আছে। কিন্তু এই পথ পাড়ি দিতে সে ডাকাতের পাল্লায় পড়বে না তাই-বা কে বলতে পারে? অথচ বাড়ির এত কাছাকাছি এসে স্টেশনে পড়ে থাকতেই কি মন চায় কারও?

অবশেষে অনেক ভাবনাচিন্তার পর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে মনে করে ভগবানের স্মরণ নিয়ে বাঁধের পথ ধরল বিধুভূষণ।

বেশ আসছে, বেশ আসছে, এইভাবে বেশ কিছুটা পথ আসার পরই ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল তার।

বিধুভূষণ দেখল, একজন লোক লণ্ঠন হাতে ওকে পথ দেখিয়ে ওর আগে আগে চলেছে।

সে কী নিকষ অন্ধকার।

শুধু কয়েক মুঠো জোনাকির আলো আর ওই লণ্ঠনের আলোটি ছাড়া কিচ্ছুটি নেই। ওর হাতে টর্চ থাকলেও সেই টর্চের আলো জ্বলছে না। অথচ দেশে আসবার আগে নতুন ব্যাটারি ভরে নিয়েছে। সেই ঘন অন্ধকারে লোকটির সারা শরীর ঢাকা। শুধুমাত্র লম্বা লম্বা পা দুটি ছাড়া তার শরীরের কোনও অংশই দেখা যাচ্ছে না।

বিধুভূষণের এবার ভয় করল খুব। তাই সে চলার গতি মন্থর করে একসময় চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চলমান পা দুটোও থমকে দাঁড়াল।

অন্ধকারের ভেতর থেকেই একটা কেমন যেন খ্যানখেনে গলার স্বর ভেসে এল, "আয় না রে! আয়।"

বিধুভূষণ বুঝতে পারল এই অন্ধকারে যাদের ভয় সে করেছে এ তারা নয়। বরং যাদের কথা বারেকের তরেও মনের মধ্যে উঁকি দেয়নি সেই ভূতের পাল্লাতেই পড়েছে সে।

ওর শিরদাঁড়া বেয়ে একটি হিমস্রোত নেমে এল।

বিধুভূষণ বলল, "কে তুমি! আমার সঙ্গ নিয়েছ কেন? আমার খুব ভয় করছে তোমাকে।"

অন্ধকারে কে যেন হেসে উঠল খিলখিল করে। সে কী হাসি! যেন সর্দি বসা ঘড়ঘড়ে গলা। বলল, "ভয় নেই রে। আয় আমার সঙ্গে।"

বিধুভূষণ সম্মোহিতের মতো আবার চলতে লাগল তার পিছু পিছু।

বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর দেখল অন্ধকারে রাস্তার মাঝখানে কয়েকটা ছায়াশরীর পথ আগলে বসে আছে। তাদের চোখের ভেতর থেকে লাল-নীল টুনির মতো আলো জ্বলছে।

তারা বলল, "এই অসময়ে এখান দিয়ে কে যায়?"

উত্তর হল, "ওকে যেতে দে।"

"কাল সকাল হতে তর সইল না? এখন আমাদের রাজত্বে এই অন্ধকারে ও কেন এল ওকে জিজ্ঞেস কর।"

"ওর বাবার খুব অসুখ রে। সেই শুনে ও দেখতে এসেছে। ওর দোষ নেই।"

বিধুভূষণের গায়ে কাঁটা দিল। ওর বাবার অসুখের কথা ও কী করে জানল?

সেই ছায়াশরীরগুলো বিশ্রী গলায় হেসে উঠল এবার, "ওর বাবার অসুখ তো তোর কী? তুই ওর কে?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই লণ্ঠনধারীর মুখ থেকে আগুনের একটা হলকা ছুটে গেল ছায়াশরীরগুলোর দিকে।

ব্যস। চোখের পলকে সব উধাও।

আবার নিঃশব্দে পথচলা।

যেতে যেতে হঠাৎই একসময় দেখতে পেল মশাল হাতে ভয়ঙ্কর চেহারার কিছু লোক বনজঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁধের পথ ধরে এগিয়ে আসছে। যারা আসছে তাদের শরীর আছে। আর কী ভীষণ চেহারা তাদের! বিধুভূষণ বুঝতে পারল আজ আর নিস্তার নেই তার। কালীচরণের পাল্লায় পড়ছে সে। ওরই দলবল এসে আক্রমণ করবে এবার। ভয়ঙ্কর ডাকাত কালীচরণ। যার প্রাণে কোনও মায়ামমতা নেই।

দলের পুরোভাগেই তখন কালীচরণ ছিল। গম্ভীর গলায় হাঁক দিল, "কে ও? কে আসে?"

লণ্ঠনধারী তখন উধাও।

বিধুভূষণ বলল, "আমি তালপুকুর গ্রামের ছেলে। আমার বাবার অসুখের খবর পেয়ে আসছি। আমাকে যেতে দাও কালীচরণ।"

কালীচরণ বিকটভাবে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আশপাশ থেকে পৈশাচিক কণ্ঠস্বরে সে কী হাসি! সে এমন হাসি যে, হাসি আর থামতেই চায় না।

"কে হাসে? কারা হাসে? কে?" ধমকে উঠল কালীচরণ।

হাসিও থেমে গেল।

কালীচরণ বলল, "ওরে দুগ্ধপোষ্য বালক, নিয়তির ডাক না পেলে এই দামোদরের বাঁধে রাতদুপুরে কেউ আসে না। তোব মরণ যে ঘনিয়েছে বাবা।"

অমনি ফ্যাঁসফেঁসে গলায় অন্ধকার থেকে কারা যেন বলে উঠল, "তোর মরণ যে ঘনিয়েছে বাবা, তোর মরণ যে ঘনিয়েছে, তোর মরণ যে—।"

গর্জে উঠল কালীচরণ, "কে! কে বলে এই কথা? কে?"

আবার সব চুপ।

বিধুভূষণ এবার মিনতি করে বলল, "শোনো কালীচরণ! আমার সঙ্গে যা কিছু আছে সবই তোমাকে দিয়ে দেব। শুধু দয়া করে আমাকে প্রাণে মেরো না। একবার অন্তত ঘরে যেতে দাও। বাবা আমার মৃত্যুশয্যায়, তাঁকে একবার শেষ দেখাটা দেখতে চাই।"

কালীচরণ আবার হাসল। বলল, "ওরে সাপের লেখা আর বাঘের দেখা, জানিস তো? আমি সেই বাঘ। ডাক তোর বাবাকে। ডাক তোর ভগবানকে। আমার নাম কালীচরণ।" বলেই বল্লমটা উঁচিয়ে সজোরে ছুড়ে দিল বিধুভূষণের দিকে।

বল্লমটা বিধুভূষণের বুকে লেগেই ভেঙে দু' টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ঠং করে একটা শব্দ হল শুধু।

বিধুভূষণ তখন লোহার মতো কঠিন হয়ে গেছে। ওর দু' চোখে ক্রোধের আগুন। সে রেগে বলল, "তবে রে শয়তান! এবারে আমার খেলাটা দেখ।" বলেই সে বজ্রবাহু নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কালীচরণের দিকে।

বিধুভূষণের সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে লাঠি বল্লম ফেলে ওর দলের লোকেরা যে যেখানে ছিল পালাল। পারল না শুধু পালিয়ে যেতে কালীচরণ।

বিধুভূষণ তখন রোবটের মতো হয়ে গেছে। সে দু' হাতে কালীচরণকে ধরে তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে ধড়ের ওপর মুণ্ডুটা পাকিয়ে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলল।

অন্ধকারের ভেতর থেকে কারা যেন বলে উঠল, "সাব্বাশ। সাব্বাশ বিধুভূষণ।"

বিধুভূষণ সেইরকম লৌহকঠিন অবস্থাতেই গ্রামের কাছাকাছি চলে এল। এই চেহারা নিয়ে কী করে ঘরে যাবে সে? ওর বাড়ির লোকেরা এই অবস্থায় ওকে দেখলে চিনতে পারবে কী? এইসব চিন্তা করতে করতেই গা মাথা ঝিমঝিম করে উঠল তার। দাঁড়িয়ে থাকতেই-থাকতেই হঠাৎ সেইখানে মাথা ঘুরে পড়ে গেল বিধুভূষণ।

পরদিন সকালে গ্রামের লোকজন এসে উদ্ধার করল ওকে। ঘরে নিয়ে গিয়ে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরল ওর। বাবা ঠাকুরের কৃপায় ভালই আছেন। আর বিধুভূষণও যেমন ছিল তেমনই আছে। ওর শরীরে কোথাও কোনও বিকৃতি নেই। তবে কিনা দুর্ধর্ষ কালীচরণ কাল রাতে কোনও দুষ্টচক্রের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। পুলিশ এসে ডেডবডিও নিয়ে গেছে তার।

গতরাতের ওই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা বিধুভূষণ তখনকার মতো কারও কাছে বলল না। এমনকী বাড়ির লোকেদের কাছেও নয়। বলা যায় না, কী থেকে কী হয়! সকলকে ভূতের গল্প শোনাতে গিয়ে শেষকালে খুনের দায়ে ধরা পড়বে কী? তবে সেই থেকে বিধুভূষণ আর কখনও ভুলেও রাত্রিবেলা ওই পথে আসেনি।



ছায়াশরীর

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি। আমার বয়স তখন তেইশ বছর। তিন বছর একটানা রেলে চাকরি করার পর চাকরিটা বাধ্য হয়েই ছেড়েছি। একজন বদমেজাজি অফিসারের দাপট তখন সহ্য হয়নি, সেই বয়সে ধৈর্য এবং অপমান হজম করবার ক্ষমতা খুব কম থাকে বলেই অবলীলায় চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি।

বাঁধা একটা মাইনে ছিল, সেটা গেল। মনমেজাজ তাই ভাল ছিল না। হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে একটা চিঠি এসে হাজির হল। চিঠিটা এল নলহাটি থেকে। লিখেছে দীপক নামে আমার এক বন্ধু।

বছর তিনেক আগে আমরা একবার ভাদ্র-আশ্বিন মাসে নলহাটিতে গিয়েছিলাম স্বাস্থ্যোদ্ধারে। নলহাটির পাহাড়ে একটি বহুদিনের পুরনো বাড়িতে আমরা ভাড়া ছিলাম। ওই একই বাড়িতে দীপকরাও থাকত। ফলে দু'জনের মধ্যে বেশ ভাল একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই দীপক আমাকে নলহাটি ও তার আশপাশের গ্রামগুলো খুব ভালভাবে চিনিয়ে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণী নদীর ধারে জগধারী আশ্রমে গিয়ে বসে থাকতাম আমরা। নলহাটি পাহাড়ে বনে বনে ঘুরে আতাফল খেতাম।

যাই হোক, সেই থেকেই দীপকের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। আমার চাকরি ছাড়ার পর হঠাৎই চিঠি। চিঠিতে লেখা ছিল, 'শুনলাম রেলের চাকরিটা ছেড়েছ। বেশ করেছ। তুমি বলেই পারলে। আমি হলে ছাড়তাম না। পত্রপাঠ এখানে যদি চলে আসো তা হলে আর বেকার বসে থাকতে হবে না।'

নিশ্চয়ই কোনও একটা কাজের ব্যবস্থা হয়েছে। কী কাজ তা জানি না। আবার সেই লালমাটির দেশ, আবার সেই সবুজ বনশ্রী, আবার সেই ব্রাহ্মণী নদী—মন যেন নতুন করে মেতে উঠল আবার।

পরদিন সকালেই হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলাম।

দীপকের বাবা-মা, ওর ভাই, দীপক, কী যে করবে আমাকে পেয়ে তা ভেবে পেল না।

দুপুরে স্নানাহারের পর দীপক আর আমি পাহাড়ের মাঝখানে বিশাল একটি নিমগাছের ছায়ার নীচে এসে বসলাম।

আমরা যেখানে বসে ছিলাম তার চারদিকে অসংখ্য ঝোপঝাড়। পাহাড়ের উচ্চস্থান থেকে দূরের বনানীর শোভা বড়ই সুন্দর। প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে একসময় আমরা কাজের প্রসঙ্গে এলাম। বললাম, "এবার বল কী কাজের জন্য ডাকিয়ে এনেছিস আমাকে?"

দীপক বলল, "এর আগের বারে যখন এসেছিলি তখন আমার সঙ্গে একবার ভবানন্দপুর গ্রামে গিয়েছিলি মনে আছে?"

"হ্যাঁ। ওইখানে চন্দ্রময়ী সিদ্ধপীঠে এক সাধুবাবাকে দেখতে গিয়েছিলাম।"

"ঠিক। ওই গ্রামে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য একজন শিক্ষকের দরকার।

সেই দায়িত্বটা তোকেই নিতে হবে। কোনও স্কুল বা পাঠশালা নয়, কোচিং ক্লাসের মতো। মাস গেলে আশি টাকা মাইনে পাবি। থাকার জন্য ঘরও পাবি একটা। আর গ্রামের ব্যাপার তো, চালটা, কলাটা, মুলোটা, তরিতরকারি, হাঁস মুরগির ডিম—এসবের অভাব হবে না। কিনেও খেতে হবে না ওগুলো। এখন করবি কিনা বল?"

আমি তো এককথায় রাজি। সে আমলে আশি টাকার দাম অনেক। তার ওপর থাকা-খাওয়ার খরচ তো লাগছেই না প্রায় বলতে গেলে। তবু মাসে পঞ্চাশ টাকার মতো খরচ হলে বাকি টাকাটা পোস্ট অফিসের বইতে জমে যায়। এ সুযোগ কেউ ছাড়ে? বিশেষ করে অমন সুন্দর গ্রামের পরিবেশে থাকতে পাওয়া।

পরদিন সকালেই 'দুর্গা দুর্গা' বলে আমরা রওনা হলাম। ওই গ্রামেরই একজন মাতব্বর ছিলেন আবদুল হালিম। নলহাটিতে ওঁর মস্ত দালান। তাঁরই দেওয়া গোরুর গাড়িতে চেপে রওনা হলাম আমরা। ভবানন্দপুর এখান থেকে প্রায় পাঁচ-সাত মাইল দূরে। তাই অনেক সময় লাগল যেতে। তবু বেশ ভালভাবেই পৌঁছে গেলাম।

গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে একটি বুনো পাহাড়ের কোলে চালাঘর। তারই লাগোয়া ছোট্ট একটি মাটির ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। ঘরে একটি তক্তাপোশ পাতা ছিল। মাদুর বিছানা মশারি সবেরই ব্যবস্থা ছিল দেখলাম। গ্রামের মানুষজনও খুবই ভাল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ বসবাস করেন এই গ্রামে। তাঁরা আমাকে দেখে বললেন, "এ যে একেবারেই ছেলেমানুষ!" বলে বললেন, "তা হোক, ছোট ছোট ভাইবোনগুলোকে একটু দেখাশোনা কোরো বাবা। আমরা চাষিভুষি মানুষ। এ গাঁয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে গড়ে তোলবার মতো তেমন কেউ নেই। ছেলেরাও স্কুল পাঠশালার ধারেকাছে ঘেঁষতে চায় না। অথচ আজকালকার দিনে মুখ্যু হয়ে থাকাটাও তো ঠিক নয়। একটু চেষ্টা করে দ্যাখো যদি এদের মানুষ করতে পারো।"

আমি বললাম, "আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। ওরা যদি নিয়মিত আসে আমার কাছে, তা হলে ঠিক আমার মনের মতো করে ওদের আমি গড়ে তুলবই।"

গ্রামবাসীরা বললেন, "তবে বাবা, একটা ব্যাপারে তোমাকে আমরা সাবধান করে দিই। সন্ধের পর একটু সতর্ক থেকো, আর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ো না। তার কারণ জঙ্গল থেকে প্রায়ই এখানে বুনো জন্তু, মানে ছোটখাটো বাঘ বা ভালুক হঠাৎ করে বেরিয়ে আসে।"

আমি বললাম, "বেশ। সতর্ক থাকব।"

এর পর আমি আমার ঘরের দখল নিলে দীপকও ফিরে গেল নলহাটিতে।

এইখানকার এই সুন্দর পরিবেশে মন আমার আনন্দে ভরে উঠল। আমি বহাল তবিয়তেই ওই গ্রামে রয়ে গেলাম এবং মনপ্রাণ দিয়ে শুরু করে দিলাম শিক্ষকতার কাজ। পাঁচ থেকে দশের মধ্যে ছেলেমেয়ে সব। সকাল-বিকেলে দু'ঘণ্টা করে ওদের পড়ানোর দায়িত্ব ছিল আমার।

ছাত্রছাত্রীরা চলে গেলে একটু বেলায় কাঠের জ্বাল দিয়ে ভাতেভাত একটু ফুটিয়ে নিতাম। সিদ্ধ ডিম বা রান্না করা অন্য তরকারি প্রায় সব বাড়ি থেকেই একটু না একটু আসত আমার জন্য। তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি থেকে দুধ-কলা গুড়-মুড়ি যা আসত তা-ও খেয়ে শেষ করতে পারতাম না।

মোট কথা, বেশ ভালভাবেই দিনগুলো কাটছিল আমার।

আমি যে ঘরটাতে থাকতাম তার পেছনদিকে একটি কামিনীগাছ ছিল, আর ছিল বেশ বড়সড় একটি গোলঞ্চগাছ। একপাশে ছিল মস্ত একটি টিলা। সেখানে দেবী চন্দ্রময়ীর থান। প্রতি শনি-মঙ্গলবারে দলে দলে আদিবাসীরা এখানে এসে পায়রা বলি ছাগ বলি ইত্যাদি দিত। নাচগান করত।

এইরকমই এক শনিবারে চাঁদনি রাতে সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে আদিবাসীদের ধামসা মাদলের তালে তালে নাচগান দেখে ফিরছি, হঠাৎই দেখলাম আমার বাড়ির পেছনে যে কামিনীগাছটা ছিল তার ডালে দোলনা বেঁধে বছর পাঁচেকের একটি ফুটফুটে মেয়ে মনের আনন্দে দোল খাচ্ছে। আর তাকে দোলা দিচ্ছে এই গ্রামেরই রোজিনা নামের একটি মেয়ে।

আমাকে দেখেই শিশুটি দোলনা থেকে লাফিয়ে কোথায় যে পালাল তার ঠিক নেই। কিন্তু ধরা পড়ে গেল রোজিনা।

রোজিনাকে আমি চিনি। চোদ্দো-পনেরো বছরের এক নওল কিশোরী। মাজা কালো গায়ের রং। অপূর্ব সুন্দর ওর মুখশ্রী। বনে বনে ঘুরে কাঠ কুড়িয়ে বেড়ায়। ওর সঙ্গে আমি কথাও বলেছি অনেকবার। মাঝে মাঝে আমাকেও কিছু শুকনো কাঠ জোগান দিয়েছে ও। আমি বললাম, "এ কী! রোজিনা! এই রাতদুপুরে তুমি এখানে? ও মেয়েটি কে? কাকে দোল খাওয়াচ্ছিলে তুমি?"

রোজিনা আমার কথার উত্তর না দিয়ে মাথা নত করেই দ্রুত স্থানত্যাগ করল।

পরদিন সকাল থেকে নতুন এক ভাবনাচিন্তা এসে উপস্থিত হল আমার মনে। কে ওই শিশুটি? এই গ্রামে রোজিনাকে তো চিনি। কিন্তু ওই শিশুকে তো দেখিনি কখনও? অমন সুন্দর চাঁদের মতো ফুটফুটে শিশু যে বিরল।

তাই একটু বেলায় ছাত্রদের পড়িয়ে শুকনো কাঠের খোঁজে টিলায় উঠে খোঁজ করতে লাগলাম রোজিনার। সে তখন একমনে কাঠ সংগ্রহ করছিল। আমি ওর খুব কাছে গিয়ে বললাম, "কী ব্যাপার রোজিনা, কাল আমার কথার উত্তর না দিয়েই চলে এলে যে?"

আমার কথা শুনে অবাক হয়ে রোজিনা বলল, "কাল! কখন?"

"কেন, রাত্রিবেলা!"

"আপনি তা হলে আর কাউকে দেখেছেন। আমি নই। সন্ধের পর আমি ঘর থেকে বেরোই না। আব্বাজান কড়া নজর রাখেন আমার দিকে।"

আমি তখন যা দেখেছি সবই বললাম ওকে।

রোজিনা দূরের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "আশ্চর্য তো! এ কী করে হয়? তা ছাড়া আপনিই বলুন না, রাত্রিবেলা কামিনীগাছের ডালে বসিয়ে ওইটুকু বাচ্চাকে কেউ দোল খাওয়ায়?"

কথাটা ঠিক। আমি তবে কী দেখলাম? কাকে দেখলাম? ভয়ে আমার সারাগায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এই ঘটনার কথা আমি আর কাউকেই না বলে বেমালুম চেপে গেলাম।

তবে কিনা এর পর থেকে রোজিনা আমাকে অত্যন্ত সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে লাগল।

এইভাবে বেশ কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা রোজিনা এসে বলল, "আপনি আর এ গাঁয়ে থাকবেন না মাস্টারমশাই। যত শিগগির সম্ভব চলে যান। পারলে কালই চলে যান আপনি।"

দারুণ বিস্মিত হয়ে আমি বললাম, "কেন?"

কঠিন গলায় রোজিনা বলল, "প্রশ্ন করবেন না।"

আমি আহত হয়ে বললাম, "বেশ! তোমরা আমাকে না চাইলে আমি চলেই যাব।"

রোজিনার চোখ দুটি ছলছল করে উঠল এবার। বলল, "কিছু মনে করবেন না মাস্টারমশাই। আপনার ওপর দৃষ্টি পড়েছে।"

আমি সভয়ে বললাম, "কার?"

"সে-কথা বলা যাবে না।" বলে আর একমুহূর্তও না থেকে রোজিনা চলে গেল।

মনটা আমার খুবই খারাপ হয়ে গেল। কেননা এই ক'দিনে এই গ্রামকে আমি এমনই ভালবেসে ফেলেছিলাম যে, এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। এমন সুন্দর ও লোভনীয় পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে মন আমার চাইছে না। অথচ ও আমাকে এমন ভয় ধরিয়ে দিল যে—।

সে রাতে হঠাৎই আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পর আমার মনে হল ঘরখানি যেন কামিনী ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে আছে। আঃ, কী সুবাস! কী উগ্র সেই গন্ধ! শুধু কামিনী নয়, আরও অনেক সুগন্ধি ফুলের গন্ধ আমার নাকে আসতে লাগল। তখন পৌষের শেষ। এই সমস্ত ফুল এই অসময়ে ফোটবার নয়। মনের মধ্যে তাই কেমন যেন একটা ভয়ের ভাব জেগে উঠতে লাগল। তার ওপরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যেন কেঁপে উঠতে লাগল সর্বাঙ্গ।

ঘরের বাইরে পেছনদিকে কেমন যেন একটা পাতা খসখস মচমচ শব্দ। কেউ যেন আমার জানলার ধার ঘেঁষে অনবরত যাওয়া-আসা করছে। নিশ্চয়ই ভালুক এসেছে ওখানে। তবুও ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য নিঃশব্দে জানলার কাছে গিয়ে আলতো করে পাল্লাটা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। দেখি কিনা সেই সেদিনকার মতো রোজিনা সেই শিশুটিকে কামিনীগাছের ডালে দোলনায় বসিয়ে দোল খাওয়াচ্ছে। আমি একভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। রাত তখন একটা। এত রাতে এ কী কাণ্ড! হঠাৎ আমার চোখে চোখ পড়ে গেল শিশুটির। যেই না পড়া, আর সে রইল না। এক লাফে দোলনা থেকে নেমে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। দেখতে দেখতে শূন্য দোলাটাও মিলিয়ে গেল একসময়।

আর ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে এক-পা এক-পা করে খানিক এগিয়ে এসে রোজিনা কঠিন গলায় বলল, "কাল সকালেই আপনি চলে যাবেন। আর একদিনও থাকবেন না।" বলে অন্ধকার জঙ্গলে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আমার সামান্য যা কিছু ছিল তাই গোছগাছ করে রোজিনাদের বাড়িতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে চলে যাওয়ার কথা বলতেই রোজিনা অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! আমি আবার কখন আপনাকে চলে যাওয়ার কথা বললাম? আপনি আমাদের গর্ব। আপনাকে কখনও এ-কথা আমি বলতে পারি মাস্টারমশাই?"

রোজিনার মা-বাবা, এমনকী গ্রামবাসীদেরও সবাইকে আমি খুলে বললাম সব কথা।

শুনে সবাই অবাক!

রোজিনা দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে বলল, "আপনি যে শিশুকে দোল খেতে দেখেছেন সে আর কেউ নয়। আমারই ছোট বোন। কয়েক বছর আগে ওই কামিনীগাছের ডালে দোল খেতে খেতে সাপের কামড়ে সে মারা যায়। ওরই পেছনদিকের মাঠে কবরও দেওয়া হয়েছে তাকে। তারই অশরীরী আত্মাটা আপনাকে দেখা দিলেও বারবার কেন যে আপনি তার সঙ্গে আমাকে দেখছেন তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।"

আমার মুখে এই কথা শোনার পর গ্রামবাসীরা আমাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

বললেন, "অশুভ আত্মার কথা অমান্য না করাই উচিত। তুমি চলেই যাও বাবা। বলা যায় না সত্যিই যদি খারাপ কিছু হয় তখন আফসোসের আর শেষ থাকবে না।"

এর পর সবাই মিলে আমার চোখের সামনেই কেটে ফেলল সেই কামিনীগাছটিকে। বহুদিনের পুরনো গাছ। কী শক্ত আর মোটা তার ডালপালা। কামিনীগাছ সাধারণত এত বড় হয় না। সরু ডালের অপলকা গাছ। অথচ টিলা পাহাড়ের কোলে এই গাছটা যেন প্রকৃতির এক বিস্ময়।

যাই হোক, আমি ভয়ে ভয়ে সেইদিনই গ্রামবাসীদের সাহায্যে গ্রামত্যাগ করে নলহাটিতে ফিরে এলাম। কিন্তু একটা রহস্য আমার কাছে রহস্যই রয়ে গেল, ওই শিশুটি না হয় রোজিনার বোনের প্রেতাত্মা। কিন্তু রোজিনার শরীর নিয়ে যে আমাকে দু'-দু'বার দেখা দিল সে তা হলে কে? তবে কি রোজিনা তার অজান্তেই ওই প্রেতাত্মার অশুভ প্রভাবে সম্মোহিত হয়ে ওর অবচেতনে এই কাজ করে থাকে? যা এতদিন কারও নজরে পড়েনি এবং আমি দেখে ফেলতেই এই বিপত্তি? হবেও বা! আমি অবশ্য পরবর্তীকালে ও নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাইনি।



জ্যোৎঘনশ্যামের বিপদ

গ্রামের নাম জ্যোৎঘনশ্যাম। যেমন দূর তেমনই নিবান্ধাপুর। এখনও দিনমানেও ওইসব গ্রামে যেতে গা ছমছম করে । তা আমার আশৈশবের বন্ধু মণিশঙ্করের বিয়ের চিঠি পেয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করতেই হল। অনেকদিন ধরেই বিয়ের কথাবার্তা চলছিল ওর। চলছিল আর ভেঙে যাচ্ছিল। এবারে একেবারে পাকাপাকি। সব ঠিকঠাক। রেজেস্ট্রি চিঠিতে সবকিছু গুছিয়ে লিখেছ ও, কীভাবে যেতে হবে না হবে তার ম্যাপ এঁকে। আর এও লিখেছে, যেন দিনমানে যাই। সকালের দিকে রওনা হয়ে দুপুরের মধ্যে পৌঁছই। না হলে কিন্তু পথে দুর্ভোগের শেষ থাকবে না।

একে মণিশঙ্করের বিয়ে, তায় আবার পথ নির্দেশিকায় অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ। আমার সহকর্মী পরেশকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালাম আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য। প্রথমটায় ও যেতে রাজি হয়নি। পরে আমার জেদাজেদিতে হল। রাজি না হওয়ার কারণও ছিল অবশ্য। মণির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় দূরের কথা, মণিকে ও চোখেও দেখেনি কখনও। তায় আবার এমনি বেড়াতে যাওয়া নয়, বিয়েবাড়ি বলে কথা। তাই সংকোচ একটু হচ্ছিল। পরে যখন ওকে বুঝিয়ে বললাম, এটা শহর বাজার হলে আলাদা ব্যাপার ছিল। যেহেতু এটি সুদূর গ্রামে এবং নিমন্ত্রণপত্রেও লেখা আছে 'সবান্ধবে' তখন না যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। বিশেষ করে ও জায়গায় একা যাওয়ার ঝক্কি অনেক। কাজেই পরেশ না গেলে আমাকেও হয়তো যাত্রা স্থগিত রাখতে হবে। তাই শুনে একটু কিন্তু-কিন্তু করেও রাজি হয়ে গেল ও।

যাওয়ার আগের দিন রাত্রে পরেশ এসে আমার কাছে রইল। পরদিন খুব ভোরে আমরা দু'জনে রওনা হলাম জ্যোৎঘনশ্যামের দিকে। রামরাজাতলা স্টেশনে এসে কোলাঘাটের দুটো টিকিট কেটে ট্রেনে উঠেই মেজাজটা গেল বিগড়ে। ট্রেনের বগিতে একটা ভিখারি চারদিক নোংরা করে মরে পড়ে আছে। দেখে মনে হল মরবার আগে ভীষণ যন্ত্রণা পেয়েছে বেচারি! আমি তো থুঃ থুঃ করে ঘেন্নায় থুতু ছেটালাম। পরেশ বলল, 'যাত্রা শুভ।' যাই হোক, আমরা পরের স্টেশন সাঁতরাগাছিতে নেমে অন্য বগিতে চলে এলাম।

যাত্রা যে কতটা শুভ তা টের পেলাম হাতেনাতে কোলাঘাট স্টেশনে নেমেই। কাঁসাই নদীর তীর পর্যন্ত বেশ কয়েক মাইল যে-বাসে আমরা যাব, গিয়ে শুনলাম কোনও একটি অজ্ঞাত কারণে সেই বাসটি নাকি আজ কয়েকদিন যাবৎ বন্ধ আছে।

শুভ কাজে যাত্রার শুরুতেই এইরকম ঘটে যাওয়ায় মনটা অত্যন্ত দমে গেল।

পরেশ বলল, "তা হলে উপায়? এতদূর এসে কি শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হবে?"

"না না। ফিরে যাব কেন? বাস না থাকে সাইকেল রিকশা তো আছে। তাতেই যাব। তবে ভাড়া একটু বেশি পড়বে।"

"কত?"

"তা ধরো না কেন কুড়ি-পঁচিশ টাকা তো নেবেই।"

"একটা রিকশাকে ধরো তা হলে।"

"দাঁড়া। আগে কোথাও বসে একটু জলযোগের ব্যাপারটা সেরে নিই। কেননা শুনেছি এ পথে কোথাও কিছু পাওয়া যায় না।" এই বলে রূপনারায়ণের বাঁধের ধারে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একটি খাবারের দোকানে বসে বেশটি করে দই মিষ্টি খেয়ে নিলাম।

তারপর অনেক দরদাম করে ত্রিশ টাকা ভাড়ায় রাজি করালাম একজন রিকশাওয়ালাকে। রিকশা আমাদের নিয়ে তিরতিরিয়ে গ্রামের পথ ধরে চলতে লাগল। চলেছি তো চলেছি। পথের আর যেন শেষ হয় না। একসময় কাঁসাই নদীর বাঁধের কাছে এসে থামলাম। রিকশা যেখানে আমাদের নামালো সেখানটা দারুণ নির্জন। এই নির্জনতা আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে যেমন আনন্দ দিল তেমনই ভাবতে লাগলাম এই সমস্ত অঞ্চলে যেসব গ্রাম আছে সেইসব গ্রামের মানুষরা কীভাবে বেঁচে আছেন? ডাক্তার বদ্যি, ওষুধপত্তর, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর কীভাবে সংগ্রহ করেন এঁরা! এইসব ভাবতে ভাবতে যখন যাচ্ছি তখন হঠাৎই এক জায়গায় একটি দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম দু'জনে। রাত্রি হলে হয়তো দু'জনেই জ্ঞান হারাতাম কিন্তু যেহেতু এটি প্রকাশ্য দিবালোক, তাই ভয়ে এবং বিস্ময়ে দু'জনের চোখের পাতা নড়ল না।

পরেশ বলল, "এও কি সম্ভব!"

"অসম্ভব কী? চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি যা দেখবার।"

আমরা দেখলাম বাঁধের ঢালে একটি ঘনপত্রবিশিষ্ট বটগাছের ছায়ায় রামরাজাতলা স্টেশনের ট্রেনের কামরায় দেখা মৃত ভিখারিটা সেই একই ভাবে সেইরকম যন্ত্রণাকাতর মুখে মরে পড়ে আছে। আমি আবার থুঃ করে থুতু ছেটালাম। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আর এক মুহূর্তও সেখানে না দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে চললাম নদীর ঘাটের দিকে। আমাদের দু'জনের সমস্ত আনন্দই তখন ম্লান হয়ে গেছে।

এক সময় আমরা ঘাটে এসে পৌঁছলাম। এখানে দু'-একটি চায়ের দোকান আছে। আমরা একটি চায়ের দোকানে চা খেতে বসলাম। একটি নৌকা লোকজন নিয়ে তখন ওপারের দিকে রওনা হয়েছে। সেটি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা ওপারে যেতে পারব না। চা খেতে খেতে দোকানদারের সঙ্গে সামান্য একটু আলাপ জমালাম। শুনলাম নৌকোয় ওপারে গিয়ে আবার রিকশা নিতে হবে। আরও দশ মাইল পথ গেলে তবেই সেই গ্রাম।

দোকানদার জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন বাবা?"

বললাম, "রামরাজাতলা থেকে।" তারপর বললাম, "আচ্ছা ভাই, তোমাদের এখানে শ্মশান কোথায়?"

দোকানদার অবাক হয়ে বলল, "এত কিছু থাকতে হঠাৎ শ্মশানের খোঁজ নিচ্ছেন কেন বাবু? আমাদের এখানে শ্মশান বলে কিছু নেই। কেউ মরেটরে গেলে এই নদীর ঘাটেই যেখানে হোক একটি সুবিধেমতো জায়গায় তাকে পোড়ানো হয়।"

"গরিব দুঃখী লোকেরা কী করে? তারা কি পোড়ানোর অভাবে নদীর জলে ফেলে দেয়?"

"কী যে বলেন বাবু! এখানে নদীতে কেউ মড়া ফেলে না।"

"বিশ্বাস করলাম না।"

"কেন ফেলবে বলুন তো বাবু? এখানে কি কাঠকুটোর অভাব আছে, না মানুষজন নাই?

দরকার হলে পাঁচজনে চাঁদা তুলেও সৎকারটা করিয়ে দেয়।"

"তা যদি হয় তা হলে এই একটু আগে আমরা দু'জনে ঘাটে আসবার পথে বটতলায় যে মানুষটাকে মরে পড়ে থাকতে দেখলাম তার কোনও ব্যবস্থা হয়নি কেন এখনও? দেখে তো মনে হল অনেকক্ষণ মরেছে। হয়তো একদিন আগেই মরেছে। এইভাবে রাস্তার ধারে মড়াটাকে ফেলে রাখা কি ঠিক? কিছু না হোক, লোকজন এনে নদীর গাবায় অন্তত সরিয়ে রাখুন। যাতে পচন ধরে দুর্গন্ধ না ছড়ায়।"

দোকানদার আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কীসব আবোল তাবোল বকছেন বলুন দেখি আপনারা? কে এখানে বটতলায় মরে থাকবে। এই একটু আগে আমি এলাম, কিছু দেখলাম না, আর আপনারা বলছেন মড়া দেখলেন?"

"আপনার কি ধারণা আমরা মিথ্যে কথা বলছি?"

"না না তা কেন?" বলেই ডাকলেন, "বিশে! এই বিশে!" দোকানের পেছনদিকের খেতে একটি ছেলে আগাছা নিড়োচ্ছিল, দোকানদারের ডাকে এগিয়ে এসে বলল, "কী হয়েছে?"

"বাবুরা বলছেন এই বটতলায় কে নাকি মরে পড়ে আছে। যা তো একবার দেখে যায় তো ব্যাপারটা কী।"

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে মাথায় গামছা বেঁধে ছুটল। এবং পরক্ষণেই ফিরে বলল, "কই না তো! কেউ তো নেই।"

আমরা দু'জনে দু'জনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

দোকানদার বলল, "ঠিক আছে। বিশে, তুই একটু দোকানে বোস। আমিই বাবুদের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসছি ব্যাপারটা কী। এমন তো হয় না কখনও?"

আমাদের কৌতূহল তখন সীমাছাড়া হয়ে গেছে। তাই যেখানে ভিখারিটাকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, দোকানদারকে নিয়ে সেইখানে এলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! বটতলা তো ফাঁকা। সে মড়া তো সেখানে নেই।

দোকানদার বলল, "কী যে বলেন বাবু!"

আমরা তখন রামরাজাতলার ট্রেনের ঘটনাটার ব্যাপারও দোকানদারকে বললাম। দোকানদার বয়স্ক লোক। আমাদের কথা সব সব শুনে বলল, "এইবার বুঝেছি। তা বাবু ও সবে আজকাল কেউ বিশ্বাস করে না। তবে আমরা গ্রামের মানুষরা কিন্তু করি। আসলে আপনারা ভূত দেখেছেন।"

পরেশ তো লাফিয়ে উঠল, "ভূত! এইরকম দিনের বেলায় ভূত দেখা যায় নাকি?"

"দেখলেন তো। তা যদি না হবে আর গাঁজাটাঁজাও যদি না খেয়ে থাকেন তা হলে আপনারা আমায় মড়া দেখাতে পারলেন না কেন? আর একই মড়া দু'বার কেন দেখলেন বলুন? আমি তো মুখ্যু লোক। কিন্তু আপনারা শিক্ষিত লোক হয়ে এইরকম কেন দেখলেন? আপনারাই এর একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিন। বুঝিয়ে দিন যে, ওটা অন্য কিছু।"

আমরা কী যে বলব তা ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলাম।

দোকানদার বললে, "ওই আপনাদের নৌকো আসছে। তাড়াতাড়ি পার হয়ে ওপারে নেমেই একটা রিকশা ধরে গ্রামে চলে যান। জ্যোৎঘনশ্যামও ভাল জায়গা নয়। তাই সন্ধের আগেই পৌঁছতে চেষ্টা করবেন। আর কোনওদিকে বেশি তাকাবেন না। রাতভিত একা একা কেউ বেরোবেন না। ও জিনিস দিনের বেলায় যখন আপনাদের পিছু নিয়েছে তখন রাত্তিরেও দেখা দেবে। যেখানে-সেখানে দেখবেন ওইরকম অবস্থায় পড়ে থাকবে। তখন

কিন্তু দারুণ ভয় পেয়ে যাবেন, বলে দিলাম।"

আমরা আর আমাদের মধ্যে নেই তখন। দোকানদারকে চায়ের দাম দিয়ে ভাঙন বেয়ে নেমে এসে নৌকোয় চাপলাম। তারপর ওপারে পৌঁছেই রিকশা। একটিই মাত্র রিকশা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। কাজেই কোনওরকম দরদাম না করে সেই রিকশায় চেপে বসলাম। আলোছায়ার পথে পথে নদীর বাঁধ ধরে রিকশা এগিয়ে চলল জ্যোৎঘনশ্যামের দিকে। প্রকৃতির দৃশ্য উপভোগ করা মাথায় উঠে গেছে তখন। কেবলই ভয় হচ্ছে, এই বুঝি আবার ওই দৃশ্য দেখতে পাই।

যাই হোক, এক সময় ভর্তি দুপুরবেলায় আমরা জ্যোৎঘনশ্যামে রিকশা থেকে নামলাম। ওদের বাড়ির কাছ পর্যন্ত রিকশা গেল না। একটি উঁচু জায়গার কাছে এসে থেমে গেল। আমরা দু-একজন লোককে জিজ্ঞেস করে মণিশঙ্করদের বাড়িতে এসে হাজির হলাম।

সেখানে তখন দারুণ ব্যাপার। বাপের একমাত্র ছেলে। তার বিয়ে বলে কথা। কাজেই রীতিমতো ধুমধাম। রেকর্ডে লতা কিশোরের গান বাজছে। আমাদের দেখে তো মণিশঙ্কর দারুণ খুশি। পরেশকে বুকে জড়িয়ে 'এসো ভাই এসো' বলে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল। ওর মা-বাবা এলেন। জ্যাঠতুতো খুড়তুতো দিদিরা এল। সবার সঙ্গেই পরিচয় হলে মণিশঙ্কর ওদের পাশের বাড়িতে একজনদের একটি ঘরে নিয়ে গেল। মাটির ঘর এখানে। বলল, "ভাই, কাজের বাড়ি। তোমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে খুব। তাই এই ঘরটা তোমাদের জন্য আলাদা রেখেছি। এখানে তোমরা ছাড়া কেউ ঢুকবে না। কেউ তোমাদের বিব্রত করবে না। এখন মুখ হাত ধোয়ার জল এনে দিচ্ছি। জামাকাপড় ছাড়ো দিকিনি।"

আমরা আলাদা একটি ঘর পেয়ে সত্যিই আনন্দ পেলাম খুব। মণির জন্য নিয়ে আসা সামান্য উপহারটুকু ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, "আমাদের জন্য তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি এবার তোমার আত্মীয় কুটুমদের দেখো। তোমার বিয়ে যেখানে হচ্ছে সেখানটা এখান থেকে কতদূর?"

"সে অনেকদূর ভাই। এখন একটু চা-জলখাবার খেয়ে তোমরা পাশের পুকুরে অথবা টিউবওয়েলে স্নানটা সেরে নাও। বিকেল চারটায় বাস আসবে। তারপরই আমরা রওনা দেব।"

যে বাড়িতে আমরা উঠেছিলাম তারাই মুখ-হাত ধোওয়ার জলটল দিল। তারপর মণির জ্যাঠতুতো বোন দুটো ডিশে করে বোঁদে আর পানতুয়া এনে খেতে দিল আমাদের। একজন চা-বিস্কুট নিয়ে এল।

খেতে-খেতেই মণি একটু অন্যত্র গেলে পরেশ বলল, "আমাদের ওই ব্যাপারটা আজকের দিনে আর মণির কানে তুলে কাজ নেই। রাস্তায় আসতে আসতে যা আমরা দেখেছি তা আমাদের দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক।"

আমি বললাম, "সে তো বটেই, এখন চল, সময় কাটাবার জন্য আমরা গ্রামের আনাচে কানাচে একটু কোথাও ঘুরে আসি।"

পরেশ আর আমি দু'জনেই চললাম। কী চমৎকার গ্রাম। সত্যিকারের গ্রাম তা হলে আজও মরে যায়নি। গ্রাম ঘুরে মন ভরে গেল। গ্রামের বাঁধ ধরে ঘুরতে ঘুরতে একসময় আমরা শ্মশানে এসে পড়লাম। আর পোড়া কাঠ, মেটে কলসি ইত্যাদি দেখামাত্রই গা-টা ছমছমিয়ে উঠল। মনে পড়ল পর পর দু'বার দ্যাখা সেই দৃশ্যটা। যদি আবার দেখি, সেই ভয়ে ফিরে এলাম মণিদের বাড়িতে।

দুপুরে স্নান-খাওয়ার পর সামান্য একটু বিশ্রাম নিতে না নিতেই বাস এসে গেল। কিন্তু এলে কী হবে। মেয়েদের সাজার পালা শেষ হতে-হতেই বেলা বয়ে গেল। মণির বাবা অত্যন্ত বদরাগী লোক। প্রচণ্ড ধমক ধামক দিয়ে একসময় যাহোক করে বাসে তুললেন সকলকে। মণিও আমাদের সঙ্গে ওই বাসেই চলল।

গ্রাম ছেড়ে বনজঙ্গলের পথ ধরে আমরা এগোতে লাগলাম। বরযাত্রীতে ঠাসা বাস হাসি হুল্লোড়ে মুখর। অনেকেই বসবার জায়গা পায়নি। তাতে কী। এই আনন্দে সব কষ্টই সহ্য করে নেওয়া যায়। পরেশ আর আমি দু'জনেই বসবার জায়গা পেয়েছি। তাই মাঝেমধ্যে মণির সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম অজানা অচেনা দেশের দিকে।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল। সন্ধে পেরিয়ে রাত। বাস হু হু শব্দে ছুটে চলেছে তো চলেইছে। অনেকক্ষণ চলার পর বাস যেখানে এসে থামল সেখানে আর কোনও পথ নেই। যা রয়েছে তা হল কচুরিপানায় ভরা একটা পচা খাল।

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে বলল, "কী আশ্চর্য! এরকম খাল তো এর আগে এখানে কখনও দেখিনি।"

মণির বাবা বললেন, "তুমি পথ ভুল করোনি তো হে ছোকরা!"

ড্রাইভার বলল, "কী যে বলেন কাকাবাবু! শুধু তাই নয়, আমার মনে হচ্ছে আমরা যেন একই পথে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরপাক খাচ্ছি।"

"বলো কী!"

"হ্যাঁ। পাছে আপনারা সবাই ভয় পান তাই এতক্ষণ কিছু বলিনি। কিন্তু...।"

"ওসব বাজে কথা রাখো। এখন চলো দেখি। গাড়ির মুখ অন্যদিকে ঘোরাও।"

"তা ঘোরাচ্ছি। তবে কোনও লাভ হবে না। আমরা নির্ঘাত ইদিলপুরের ভূতের মাঠে এসে পড়েছি।"

"তোমার মুণ্ডু। ঘোরাও অন্যদিকে গাড়ি।"

অগত্যা গাড়ির মুখ অন্যদিকে ঘোরানো হল। কিন্তু ঘোরালে কী হবে? আবার সেই যাকে তাই। ঘুরেফিরে গাড়ি আবার সেই পচা খালে।

পরেশ আর আমি তখন রীতিমতো ভগবানকে ডাকতে শুরু করেছি। হায় রে ভগবান! আজ কী কুক্ষণেই না ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম!

মণির বাবা, ওর জ্যাঠামশাই সকলেরই দেখলাম মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তার কারণ, এইসব এলাকার গুণাগুণ তো এঁদের অজানা নয়। জনবসতিও এর কাছেপিঠেও কোথাও কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না। এখন উপায়?

ড্রাইভার বলল, "যদি এটা সত্যিই ইদিলপুরের মাঠ হয় তা হলে কিন্তু আর আমাদের রক্ষে নেই। এই ফাঁকা মাঠে সকাল না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকতে হবে।"

মণির বাবা বললেন, "সর্বনাশ! বিয়ে বলে কথা! শুধু গিয়ে পৌঁছতে না পারার জন্য লগ্নটাই বয়ে যাবে?"

"এ ছাড়া উপায় কী বলুন? সারারাত ধরে গাড়ি চালালেও সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে সর্বত্রই এই খাল আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করবে।"

সব শুনে আমরাও খুব ভয় পেয়ে গেলাম।

মণির মনের অবস্থার কথা না বলাই ভাল।

মেয়েরা তো রীতিমতো কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

মণির বাবা দারুণ রেগে সমানে দোষারোপ করতে লাগলেন মেয়েদের। বললেন, "কখন বিকেল চারটের সময় গাড়ি এসেছে। শুধু তোমাদের সাজের ঘটার জন্যই তো বাস ছাড়তে সন্ধে হয়ে গেল। আবার কাঁদছ যে বড়? আমি যদি সঙ্গে সঙ্গে শুধু বরকে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিতাম তা হলে আজ আমার এই সর্বনাশটা হত না।"

যাই হোক, সকলের অনুরোধে ড্রাইভার যখন গাড়ি ছাড়বার ব্যবস্থা করতে লাগল তেমন সময় দেখা গেল সেই অন্ধকারে হ্যাজাক জ্বেলে একদল লোক লাঠি-সোঁটা হাতে নিয়ে হইহই করে বাসের দিকে এগিয়ে আসছে।

দেখেই তো বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। ডাকাত নয় তো! কেলেঙ্কারির চরম হয়ে যাবে তা হলে । কিন্তু না। যারা এল তারা আমাদেরই খোঁজে এল। এসেই উল্লাসে লাফিয়ে উঠল সকলে, "এই তো! এই তো! বর এসে গেছে।"

একজন বলল, "আমি জানতুম ওরা ঠিক আসবে। আর পথ ভুল করে ঢুকে পড়বে এই মাঠে।"

আর একজন বলল, "আপনাদের এত দেরি হল কেন?"

মণির বাবা বললেন, "আপনারা?"

"আমরা তো আপনাদের দেরি দেখে নিতে এসেছি।"

"এইটাই তা হলে বসন্তপুর?"

"আজ্ঞে না! এটা বসন্তপুর কী করে হবে? এ হল ইদিলপুরের ভুলো লাগার মাঠ। এই মাঠে সন্ধের পর একবার কেউ ভুল করে ঢুকে পড়লে আর তাকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে হবে না। সারারাত মাঠময় ঘুরতে হবে আর ভোরবেলা এই মাঠের ভয়ঙ্কর সব ভূতেরা এসে গলা টিপে মারবে। সেই ভেবেই তো আমরা আপনাদের দেরি হচ্ছে দেখে এই মাঠে এসেছি। এখন চলুন। গাড়ি চালাও হে ড্রাইভার। আর কোনও ভয় নেই। সামনের দিকে মাইলখানেক গেলেই বসন্তপুর পেয়ে যাবে।"

সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা। এবং কিছু সময়ের মধ্যেই বিয়েবাড়িতে এসে পৌঁছলাম। বেশ বড়লোকের বাড়ি। লোকজনে আলোকসজ্জায় জমজম করছে। আমরা যাওয়ামাত্রই সে কী হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে গেল, তা বর্ণনার অতীত। এমন আদর আপ্যায়নের ঠ্যালা যে, অস্থির হয়ে উঠলাম একেবারে। একটানা শাঁখ বাজছে তো বাজছেই। লুচি ভাজার গন্ধে, তরকারি মিষ্টির গন্ধে চারদিক যেন ম ম করছে।

যাই হোক, মণির সঙ্গে আমরা আলাদা ঘরে বসলাম। মণির বাবা আর জ্যাঠামশাইকে পরম সমাদরে ওরা অন্যত্র নিয়ে গেল। মেয়েরা মিশে গেল মেয়েদের ভিড়ে। আমরা তিনজনে আলাদা একটি ঘরে বসে খোশগল্পে মেতে গেছি। দরজা-জানলায় উৎসাহী গ্রামবাসীদের মুখ। গল্প করতে করতেই মণি হঠাৎ আমার কানে কানে ফিসফিস করে একটা কথা বলল। কথাটা শুনেই আমি পরেশকে বললাম।

মণি বলল, "তাড়াতাড়ি। আমি আর চেপে রাখতে পারছি না কিন্তু!"

আমরা তিনজনেই চটপট বেরিয়ে এলাম বাইরে।

একজন ছুটে এসে বললে, "কোথায় যান?"

আমি তার কানে কানে ফিসফিস করে বলতেই সে বলল, "এই বাঁ দিকে একটা বাঁশবন আছে। তার গায়েই বসিয়ে দেবেন। পাশেই পুকুর। কোনও অসুবিধে হবে না।"

আমি আর পরেশ বাঁশবনে না ঢুকে পুকুরপাড়েই বসিয়ে দিলাম মণিকে। দিয়ে যখন আমরা এদিকে-সেদিকে পায়চারি করছি তখনই দেখতে পেলাম সেই দৃশ্যটা। দেখলাম বাড়ির পেছনদিকের বাগানে যেখানে শামিয়ানা খাটিয়ে রান্না হচ্ছে সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মানুষের বদলে দুটো কঙ্কাল রান্নাবান্নার কাজ করছে। তা ছাড়া বিয়েবাড়ির যত লোকজন সব যেই আলোর আড়ালে চলে যাচ্ছে অমনই তাদের কঙ্কালমূর্তি ফুটে উঠছে। দেখেই তো চক্ষুস্থির আমাদের।

পরেশ আর আমি দু'জনে দু'জনকে নিঃশব্দে চেপে ধরলাম। আমাদের মনে প্রচণ্ড কৌতূহল। আমরা কি সত্যিই ভূত দেখছি? না কি সকাল থেকে যা দেখছি সবই আমাদের চোখের ভুল।

ততক্ষণে মণিও এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ওরও চোখ কপালে উঠে গেছে তখন। মণি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "কিছু বুঝতে পারছিস?"

"পারছি বইকী!"

"এ কোথায় এলাম রে আমরা?"

"যেখানেই আসি না কেন আর এই বাড়িতে ঢোকা নয়! অন্ধকারেই মাঠে মাঠে পালাই চল। যদি আশপাশে কোনও গ্রাম দেখতে পাই তা হলে সেখান থেকেই কোনও লোকজন নিয়ে আবার আসা যাবে।"

"কিন্তু আমার বাবা! জ্যাঠামশাই! আর সব বরযাত্রীরা?"

"আপনি বাঁচলে বাপের নাম জানিস তো? এখন ঘরে গিয়ে ওদের ডাকাডাকি করতে গেলেই কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।"

অতএব আমরা সকলের নজর এড়িয়ে সেই অন্ধকারে যখন অনেকদূর চলে গেছি তখন দেখি আবার একটি দল আলো জ্বেলে লাঠি হাতে এই বাড়ির দিকে আসছে।

ওদের দেখেই ভয় আরও বেশি হল আমাদের। আবার কি নতুন করে কোনও ভূতের পাল্লায় পড়লাম আমরা? তাই আর দেখা না দিয়ে কৌশলে ওদের পিছু নিলাম এবং ওদের কথোপকথন শুনতে লাগলাম।

ওরা বলছে, "নির্ঘাত ওই ভূতের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে ওরা। এত রাত্রে ওই বাড়িতে যখন আলো জ্বলছে তখন সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।"

আর একজন বলল, "তাই যদি হয় তা হলে ওদের উদ্ধার করবি কী করে?"

"আমি তো জামাই বাবাজিকে চিনি। যেভাবেই হোক তার সঙ্গে দেখা করে কানে কানে বলে দেব ব্যাপারটা। তারপর সবাইকে সতর্ক করে চুপিচুপি পালিয়ে আসতে বলব।"

"এত সোজা নাকি। ওই বাড়িতে ঢুকলে তোকেই তো গলা টিপে মারবে।"

মণি আর থাকতে না পেরে বলল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

ওরা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "আমরা বসন্তপুর থেকে আসছি। আমাদের বর সহ বরযাত্রীর বাস আসবার কথা ছিল রাত্রি আটটার মধ্যে। কিন্তু রাত এখন একটা। তাদের কোনও খবর নেই।"

"বর কোথা থেকে আসবার কথা ছিল বলুন তো?"

"জ্যোৎঘনশ্যাম থেকে। বরের নাম মণিশঙ্কর সামন্ত।"

"আমিই আপনাদের বর। আমরা সবাই ভূতের পাল্লায় পড়েছি। আমার বাবা, জ্যাঠামশাই, এমনকী একশো বরযাত্রী সবাই ওই ভূতের বাড়ির মধ্যে রয়ে গেছে। শুধু

বিশেষ প্রয়োজনে আমরা একবার বাড়ির বাইরে বেরিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পারি। আর তারপরই গা-ঢাকা দিই।"

ওরা সঙ্গে-সঙ্গে জড়িয়ে ধরল আমাদের। দু'জন তো কোলেই তুলে নিল মণিকে। তারপর বলল, "ঠিক আছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনারা চলুন আমাদের সঙ্গে। আপাতত শুভ কাজটা সম্পন্ন হোক। আর আমরা দলকে দল গ্রামসুদ্ধু লোক রোজা বদ্যি সঙ্গে নিয়ে ওই ভূতের বাড়িতে যাচ্ছি। গিয়ে দেখি কীভাবে ওদের উদ্ধার করতে পারি।"

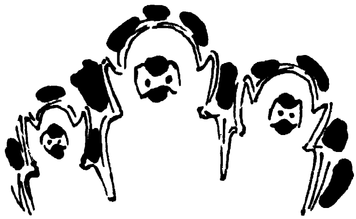
এবারে আর ভূতের বাড়ি নয়। সত্যিকারের বিয়েবাড়িতেই ঢুকলাম আমরা। মণি ওর পরিচিত সবাইকেই দেখতে পেল।

আর ওরা করল কি, আমাদের সেই বিয়েবাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রায় শ' দুই লোকের জনতা নিয়ে হইহই রবে সেই ভুতুড়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলল। কথায় আছে দশ লাগে তো ভূত ভাগে। তাই হল। এত লোকের হইচইতে সব ভূতই ভেগে পালাল। আর বরযাত্রীদেরও নিরাপদে এ বাড়িতে আসতে অসুবিধে হল না কিছু।

খাওয়াদাওয়ার পর আমরা যখন বাসরঘরে ঢুকেছি তখন হঠাৎই একটা হইচই শুনে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কী ব্যাপার! ব্যাপারটা কী!

একজন বলল, "আর বলবেন না মশাই! দরজার সামনে কোত্থেকে একটা ভিখিরি এসে মরে পড়ে আছে। কোথাকার কে তা কে জানে? এই রাতদুপুরে কী কাণ্ড বলুন দেখি?"

বোঝো কারবার! পরেশ আর আমি পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। মনে মনে ভাবলাম আর একটু পরেই ভোরের আলোটা একবার ফুটলে হয়। বরের গাড়ি জ্যোৎঘনশ্যামে পৌঁছে দিয়েই কেটে পড়ব আমরা। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।



বছর কুড়ি আগে

এই গল্প যারা পড়বে তারা সকলেই হয়তো একবাক্যে বলবে স্রেফ চমক সৃষ্টিকারী মস্তিষ্কপ্রসূত একটা ঘটনা মাত্র। কিন্তু এই গল্প যিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁকে অবিশ্বাস করার মতো মানসিকতা আমার অন্তত নেই। ঘটনাকালও খুব বেশি পুরনো দিনের নয়। মাত্র বছর কুড়ি আগেকার কথা।

মৌলালির কাছে রতিকান্ত পোদ্দার নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। খুবই অভাবী লোক। স্ত্রী এবং দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দারিদ্র্যের সংসার। ভদ্রলোক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা গুটিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় চাকরি খুইয়ে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ভদ্রলোক। একেই চাকরিহীন হয়ে মনমেজাজের ঠিক ছিল না, তার ওপর স্ত্রীর গঞ্জনা শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে রতিকান্তবাবু ঠিক করলেন, আত্মহত্যা করে এই কলহ ও দুর্ভাবনার হাত থেকে রেহাই নেবেন তিনি।

এই ভেবে এক রাতে রতিকান্তবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবার অলক্ষ্যে কাছাকাছি এক বিখ্যাত কবরখানায় ঢুকে পড়লেন। পকেটে কাগজে মোড়া বিষও ছিল । এটা খেলেই সব জ্বালার অবসান হয়ে যাবে। নিরাপদে দেহরক্ষার জন্য নির্জন কবরখানাই হচ্ছে উপযুক্ত স্থান। এখানে কেউ চেঁচামেচি করবে না, বাধা দেবে না, অথচ শান্তিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া যাবে।

তখন গরমের দিন। তায় ফুটফুটে জ্যোৎস্নার রাত। রতিকান্তবাবু কবরখানায় ঢুকে চাঁদের আলোয় আলোকিত জায়গাটার ভেতরের রূপ দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চিরকাল এর বাইরে দিয়েই যাতায়াত করেছেন তিনি। ভেতরে কখনও ঢোকার প্রয়োজন মনে করেননি। আজ ভেতরে ঢুকে এক গভীর প্রশান্তিতে ভরে উঠল তাঁর মনপ্রাণ। অন্য সময় হলে কবরখানায় ঢোকার কথা সজ্ঞানে চিন্তাই করতে পারতেন না তিনি। কিন্তু মৃত্যুর জন্য যে মানুষ তৈরি, তার আর ভয় কীসের?

কবরখানায় ঢুকে এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি। কত বিচিত্র রকমের স্মৃতিসৌধ যে আছে তা তাঁর ধারণারও বাইরে ছিল । অবশেষে অনেক ক্লান্ত হয়ে একটি খুব সুন্দর সোপানযুক্ত বড়সড় স্মৃতিসৌধের ওপর বসে পড়লেন। ফুরফুর করে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ায় ঘুম নেমে আসছে চোখে। কত মানুষ তো এর ভেতরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। কাজেই এর ওপর শুয়ে যদি কেউ একটু ঘুমোয় তো কার কী বলার আছে? এই ভেবে তিনি কবরসৌধের মসৃণ পাথরের চাতালে শুয়ে পড়লেন। কেউ কোথাও নেই। নিস্তব্ধ নিঝুম চারদিক। শুধু আগাছায় ভরা। মাঝেমধ্যে দু-একটা কেঁদো কুকুরের ছুটোছুটি ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব নেই। শুয়ে থাকতে-থাকতেই ঘুমে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন খেয়ালও নেই তাঁর। হঠাৎ একজনের ধমকে ঘুম ছুটে গেল।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই দেখলেন তাঁর সামনে একজন দীর্ঘ দেহ খাঁটি ইংরেজ সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যোৎস্নার আলোয় সাহেবের গায়ের রঙে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরোচ্ছে। আর নীল চোখ দুটো যেন কাচের গুলির মতো চিকচিক করছে।

রতিকান্তবাবুকে উঠে বসতে দেখে কড়া গলায় সাহেব বললেন, "হোয়াট ননসেন্স ইজ দিস! গেট ডাউন।"

রতিকান্তবাবু সাহেবের ধমক খেয়ে কবরের চাতাল থেকে মারলেন এক লাফ।

সাহেব ভাঙা ভাঙা বাংলায় গলার স্বর কঠিন করেই বললেন, "কী নাম আছে টোমার?"

"আজ্ঞে, আমার নাম রতিকান্ত পোদ্দার।"

"এটো রাটে টুমি কবরখানার মড্যে আসিয়াছো কেন?"

"আমি ভুল করে এসে পড়েছি সাহেব। আর কখনও আসব না।"

"আর কখনও আসিবার সময় টুমি পাইলে টো আসিবে। হামি টো এখুনি টোমাকে গোলি করিয়া মারিয়া ডিবে।"

রতিকান্তবাবু আত্মহত্যা করবেন বলেই এসেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "আমাকে এবারের মতন ক্ষমা করুন সাহেব। আমি এর আগে কখনও এখানে আসিনি। মা কালীর দিব্যি, আর কখনও আসবও না। বহু দুঃখে এসেছিলাম।" বলে পকেট থেকে কাগজে মোড়া বিষটা বের করে বললেন, "এই দেখুন, আমি এটা খেয়ে সুইসাইড করব বলে এসেছিলাম।"

"কী ওটা?"

"এটা বিষ।"

"কই ডেখি?"

রতিকান্তবাবু সাহেবের হাতে বিষটা দিতেই সাহেব সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "এটা খাইলে ইঁডুর ছুচা মরিবে। টুমি মরিবে কেন? ডু-একবার বমি করিলেই টো বাঁচিয়া উঠিবে টুমি। একদম ভেজাল চিজ আছে।"

রতিকান্তবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ! ভেজাল?"

"টবে না টো কি? টোমরা স্বডেশিরা আসল মাল খাওয়াইবে লোককে? টা যাক। কিন্টু টুমি সুইসাইড করিটে আসিয়াছিলে কেন? হামি মরিয়া যেখানে বাঁচিয়া উঠিতে চাহিটেছি টুমি বাঁচিয়া সেখানে মরিয়া যাইটে চাহিটেছ কী কারণে?"

রতিকান্তবাবু তো লাফিয়ে উঠলেন, "আ-আপনি বাঁচতে চাইছেন? মা-মা-মানে আপনি বেঁচে নেই? তার মানে আপনি মি-মি-মৃত?"

"হ্যাঁ, হামি মৃটো। বাঁচিয়া ঠাকিলে আমি এই রাট ডুপুরে টোমার সঙ্গে এইখানে কি নকশা মারিটে আসিটাম? টুমি যে কবরের উপর শুইয়া আছ এইটাই হামার কবর।"

রতিকান্ত বললেন, "অ। বুঝেছি। তা আপনি কতদিন আগে মরেছেন সাহেব?"

"তাহা শুনিয়া টোমার লাভটা কী? টোমরা স্বডেশিরা একডিন হামাকে গোলি করিয়া মারিয়াছিলে।"

"তা হতে পারে। তবে আমি কিন্তু স্বদেশি ফদেশি নই সাহেব। দেশ এখন স্বাধীন হয়ে গেছে। আমি আপনাকে মারিনি। মা কালীর দিব্যি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন সাহেব।"

"ড্যাম ফুল ব্লাডি ইডিয়ট। টুমি মরিটে আসিয়াছ যডি টো বাঁচিবার জন্য এমন ছটফট করিটেছ কেন? কান ঢরিয়া ওঠবোস করো।"

রতিকান্তবাবু তাই করলেন।

"স্টপ। এইবার হামাকে সোটটো করিয়া বলো টো টুমি এইখানে মরিটে আসিয়াছিলে কেন?"

রতিকান্তবাবু বললেন, "আমার দুঃখের কথা কী আর বলব সাহেব, বড় কষ্টে দিন কাটছে আমার। খুব গরিব লোক আমি। তার ওপর চাকরিটা খোয়ালাম।"

"চাকরি খোয়াইলে? কেন? চুরি করিয়াছিলে না ঘুষ খাইয়াছিলে?"

"ওসব কিছু নয় সাহেব। কোম্পানিটা উঠে গেল।"

"ফের মিঠ্টা কঠা বলিতেছ? উঠিয়া গেল না উঠাইয়া ডিলে? কোনও কোম্পানি কি শুঢু শুঢু উঠিয়া যায়? যাক, টুমি টা হলে বলিটে চাও চাকরি খোয়াইয়া টুমি অসুবিধায় পড়িয়াছ। পেট ভরিয়া খাইটে পাও না।"

"হ্যাঁ, আমার বউ ছেলে মেয়ে সব আছে। আমি এখন এমনই অভাবে পড়েছি যে নিজেও খেতে পাই না, তাদেরও খেতে দিতে পারি না।"

"অ। এইজন্য টুমি মরিটে আসিয়াছিলে?"

"ঠিক তাই।"

"মরিয়া টুমি ভুট হইটে আর আকাশ হইটে খাবার পাড়িয়া উহাডের খাইটে ডিটে, এই টো?"

"হ্যাঁ।"

"ইডিয়ট। টোমার কি ধারণা সব লোক মরিলেই ভুট হয়?"

"জানি না সাহেব।"

"ঠিক আছে। হামি টোমার সব কঠা শুনিলাম। টোমার সুইসাইড করিবার প্রয়োজন নাই। হামি টোমাকে একটা গিনি ডিটেছি। টুমি এইটি লইয়া চলিয়া যাও। এইটি বিক্রয় করিলে অনেক টাকা পাইবে টুমি। ওই টাকায় টোমরা পেট ভরিয়া খাইয়া বাঁচিবে। টাকা ফুরাইলে টুমি আবার আসিবে হামার কাছে। হামি টোমাকে আবার গিনি ডিব। কিন্টু এই কঠা টুমি কাউকে বলিবে না। যডি বলো, হামি টোমাকে মারিয়া ফেলিব।"

রতিকান্তবাবু গিনিটা পকেটে পুরেই কবরখানার বাইরে এসে একবার গিনিটা বের করে দেখলেন সত্যিই সেটা পকেটে আছে কি না। কেননা এতক্ষণ যা ঘটে গেল তা তো রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হাত দিতেই ধাতব গিনিটা হাতে ঠেকল। এই তো, এই তো রয়েছে। তবে তো মিথ্যে নয়। কেননা তাঁর বারবারই মনে হচ্ছিল এতক্ষণ তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু চকচকে গিনিটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল এতক্ষণ যা তিনি দেখেছেন তা সত্যিই।

রতিকান্তবাবু গিনিটা পরদিনই একটি জুয়েলারির দোকানে বিক্রি করে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকগুলি অর্থ লাভ করেন। কারণ গিনিটার ধাতব মূল্যের থেকে এর প্রাচীনত্বের দাম ছিল অনেক।

দোকানদার রতিকান্তবাবুর পূর্ব পরিচিত। গিনি দেখেই বললেন, "কী ব্যাপার রতিকান্তবাবু, এ মাল কোথায় পেলেন?"

"কোথায় আর পাব মশাই? আমারই ছিল। বাবা জাহাজে কাজ করতেন। সাহেবদের

নেকনজরে পড়ে গিয়েছিলেন। দু-একদিন ছাড়াই সাহেবরা বাবাকে একটা করে গিনি উপহার দিতেন। তারই কিছু কিছু জমানো ছিল। এতদিন বেচিনি। এখন অভাবের জ্বালায় বেচতে এসেছি।"

"তা বেশ করেছেন। তবে একটা কথা, আপনার যখনই ওগুলো বেচবার দরকার হবে তখন আমার দোকানেই আসবেন, কেমন? কেননা এ জিনিস আমরা দাম দিয়ে কিনলেও এগুলো আমরা নষ্ট করব না। এতদিন আপনার সঞ্চয়ে ছিল, এবার আমার সংগ্রহে থাকবে, এই আর কি।"

রতিকান্তবাবু গিনি বিক্রির টাকা গৃহিণীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। গৃহিণী অবাক হয়ে বললেন, "ও বাবা! এত টাকা! কোথায় পেলে তুমি? এই যে শুনলাম তোমার চাকরি নেই।"

"চাকরি সত্যিই নেই। আপাতত ছোটখাটো কাজ একটা জুটিয়ে নিয়েছি। তবে দিনমানে নয়, রাতে।"

"রাতে! কোনও খারাপ কাজ নয় তো?"

"না। আর হলেও তোমার তাতে কী? খারাপ কাজ করলে তার ফল আমিই ভোগ করব। তুমি তো করবে না। আমি টাকা আনব, তুমি সংসার চালাবে। আমি কী করছি না করছি সে ব্যাপারে তুমি একদম মাথা গলিও না।"

গৃহিণী চুপ করে গেলেন।

রতিকান্তবাবু সাহেবের কথামতো গিনি প্রসঙ্গও তুললেন না, সাহেবের কথাও বললেন না। তবে পরদিন থেকে রোজই সন্ধের পর চাকরি করতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা কবরখানায় চলে যেতেন এবং সাহেবের স্মৃতিসৌধ নিজে হাতে পরিষ্কার করে দিতেন। সাহেবও রোজই একবার করে দেখা দিতেন রতিকান্তবাবুকে এবং প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে একটি করে গিনি উপহার দিতেন।

এইভাবেই দিন যায়।

একদিন হঠাৎ গিনি বিক্রি করতে গিয়ে রতিকান্তবাবু হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন সাদা পোশাকের পুলিশের হাতে। দোকানদারের কারসাজিতেই হোক বা অন্য কোনওভাবেই হোক রতিকান্তবাবু পুলিশের শিকার হলেন।

পুলিশ নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে জানতে চাইল রতিকান্তবাবুর কাছে, এগুলো চোরাই মাল, না সত্যিই তাঁদের পিতৃপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি। যদি তাই-ই হয় তবে তার পরিমাণ এখন কত?

রতিকান্তবাবু কী আর বলেন? তিনি একই কথা বারবার বলতে লাগলেন, "এসব চোরাই মাল নয়, সবই তাঁর পিতৃদত্ত ধন। এমনকী এও বললেন, আজকেব এই গিনিটি ছাড়া তাঁর সঞ্চয়ে আর একটি গিনিও অবশিষ্ট নেই।"

পুলিশ তবুও তাঁর কথা বিশ্বাস করল না। কেননা এই গিনিগুলোর একটির সঙ্গে আর একটির মিল নেই। যথেষ্ট সময়ের ব্যবধানে এগুলি তৈরি হয়েছিল। কাজেই একই লোকের কাছে বিভিন্ন সময়ের এতগুলি গিনি কী করে থাকতে পারে? এটা একটা রীতিমতো সন্দেহের ব্যাপার। তাই পুলিশ রতিকান্তবাবুকে অ্যারেস্ট করে তাঁর বাড়িতে এসে ঘরদোর তছনছ করে চারদিক তন্নতন্ন করে নেড়ে ঘেঁটে কিছুই না পেয়ে ফিরে গেল। ফিরে গিয়েও লকআপে রাখা রতিকান্তবাবুকে ভীতি প্রদর্শন করে কথা আদায়ের

চেষ্টা করতে লাগল।

রতিকান্তবাবু অনেক কাঁদাকাটা করলেন। দারোগাবাবুর হাতেপায়ে ধরলেন। কিন্তু কোনও ফল হল না তাতে । রতিকান্তবাবুর গৃহিণী এসেও হাতেপায়ে ধরলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।"

দারোগাবাবু বললেন, "যতক্ষণ না সত্যি কথা বলবেন উনি, ততক্ষণ ওঁকে ছাড়া হবে না।"

রতিকান্তবাবুর গৃহিণী স্বামীর কাছে গিয়ে কেঁদে বললেন, "আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, নিশ্চয়ই তুমি কোনও খারাপ কাজ করছ। কেন ও কাজ করতে গেলে তুমি? রোজ সন্ধেবেলা তুমি চাকরি করতে যাওয়ার নাম করে বেরোতে আর ফিরতে রাত বারোটার পর। এখন আমি কী করি?"

রতিকান্তবাবু তখন সাহেবের নিষেধ সত্ত্বেও সব কথা খুলে বললেন গৃহিণীকে। এবং বললেন, যেভাবেই হোক সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে এই বিপদের কথাটা জানিয়ে আসতে।

গৃহিণী তো ভয়েই সারা। শোনামাত্রই আঁতকে উঠে বললেন, "ওরে বাবা! কবরখানায় ঢুকে সাহেব ভূতের সঙ্গে আমি কী করে কথা বলব গো! একেই আমার ভূতের ভয়।"

রতিকান্তবাবু বললেন, "তা অবশ্য ঠিক। তবু তুমি এক কাজ করো, আমি বরং একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি সেটা সাহেবের কবরের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রেখে এসো। তবে খুব সাবধান। ভুলেও যেন কারও কাছে বোলো না এ-কথা।"

"না, না, তা বলব না। কিন্তু আমি সাহেবের কবর চিনব কী করে?"

"সেসব বলে দিচ্ছি আমি। বলেই রতিকান্তবাবু একটা সাদা কাগজে দু-এক ছত্রে নিজের বিপদের কথা জানিয়ে লিখে দিলেন, "প্লিজ হেল্প মি", তারপর গৃহিণীকে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে কোনখানে যেতে হবে। এবং এও বলে দিলেন, ওই কবরখানার সবচেয়ে বড় স্মৃতিসৌধটাই সাহেবের।

রতিকান্তবাবুর গৃহিণী দিনের আলো থাকতে-থাকতেই রক্ষীদের নজর এড়িয়ে ভাঙা পাঁচিলের পাশ দিয়ে কবরখানায় ঢুকে পড়লেন। তারপর রতিকান্তবাবু যেভাবে যেমন করে যেতে বলে দিয়েছিলেন ঠিক সেইভাবেই গিয়ে এখানকার সবচেয়ে বড় স্মৃতিসৌধটির কাছে পৌঁছলেন। তারপর বিশেষ চিহ্ন আঁকা দীর্ঘ এপিটাফেব নীচে একটি পাথর চাপা দিয়ে চিঠিটা রেখে চলে এলেন।

রাত তখন একটা।

থানার লকআপের ভেতরে দারোগাবাবু রতিকান্তবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছেন। আর রতিকান্তবাবুও সেই একই উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন, "বিশ্বাস করুন আপনারা, আমি চুরি করিনি। এ সবই আমার পিতৃদত্ত ধন। যা ছিল সবই বেচে দিয়েছি। তা ছাড়া আপনারা তো আমার বাড়ি তল্লাশ করে দেখেই এসেছেন, তবুও কেন অবিশ্বাস করছেন আমাকে?"

"অবিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই করছি। এইসব দুষ্প্রাপ্য গিনিগুলি আপনার পিতৃদত্ত ধন হলে আপনার এইরকম দশা হত? আপনি তা হলে ভাড়াবাড়িতে টিনের ঘরে থাকতেন? চালাকির জায়গা পাননি?"

রতিকান্তবাবু নীরব। সত্যিই তো! কী উত্তর দেবেন তিনি?

এমন সময় হঠাৎ এক কাণ্ড।

রুদ্রমূর্তিতে ঝড়ের বেগে যিনি এসে সেখানে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে দেখেই চমকে উঠলেন সকলেই। দরোয়ান থেকে ও. সি. পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে স্যালুট করলেন তাঁকে। সেই অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন সবাই। কে ইনি? পুলিশ কমিশনার? না। তিনি তো বাঙালি। তবে কি সেন্ট্রাল থেকে এসেছেন কোনও ব্রিগেডিয়ার? তাই বা কী করে হবে? ইউনিফর্ম তো পরে আছেন উচ্চপদস্থ সার্জেন্টের। তা হলে? কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব! কী ভয়ানক তাঁর নীল চোখের চাহনি! কী হিংস্র তাঁর লাল টকটকে মুখ! খাঁটি ইংরেজ সাহেব। কে পাঠাল এঁকে? কোথা থেকে এলেন?

সাহেব এসেই গটগট করে ও. সি.-র ঘরে ঢুকলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ক্রুদ্ধ চোখে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। টেবিলের কাগজপত্তরগুলো একটু নাড়াচাড়া করলেন। চেয়ারটা টেনে নিয়ে একবার বসতে গিয়েও বসলেন না। জুতোসুদ্ধু একটা পা চেয়ারের ওপর রাখলেন। তারপর টেবিলে রাখা ময়লা ছোপধরা কাচের গেলাসটা ঘরের কোণে আছাড় মেরে বোমার মতো ফেটে পড়লেন, "আমার ঘরের এই রকম অবোশটা কে করিয়াছে?" তারপর ও.সি.-র দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, "হু আর য়্যু?"

ও. সি. সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, "স্যার, আমি বর্তমানে এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার।"

"ইউ ব্লাডি ফুল। টেল মিস্টার টেগার্ট। ইউ আর রিয়ালি আনফিট ফর দিস পোস্ট।"

তারপর গোটা থানার চারদিক ব্যাঘ্রবিক্রমে ঘুরেফিরে দেখে লকআপের কাছে এসে রতিকান্তবাবুর দিকে তাকিয়ে ও.সি.-কে বললেন, "এই লোকটাকে টোমরা ঢরিয়া রাখিয়াছ কেন?"

"একে আমরা স্মাগলার সন্দেহ করে ধরে রেখেছি স্যার।"

"ব্লাডি ফুল। হি ইজ এ ভেরি গুড ম্যান। আই নো হিম। যডি ভাল চাও টো টোমরা উহাকে এখুনি ছাড়িয়া ডাও।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ছেড়ে দেওয়া হল রতিকান্তবাবুকে।

লকআপ থেকে বেরিয়ে রতিকান্তবাবু দেঁতো হেসে সাহেবকে একটা স্যালুট দিলেন।

সাহেব রতিকান্তবাবুকে ধমকালেন, "গেট আউট অফ হিয়ার।"

রতিকান্তবাবু সাহেবের এরকম মূর্তি কখনও দেখেননি। এমন ইউনিফর্ম পরা বদমেজাজি পুলিশি চেহারা কখনও না। তাই ধমক খেয়ে কোনওরকমে কোঁচা গুটোতে গুটোতে দৌড়ে পালালেন।

রতিকান্তবাবু চলে যাওয়ার পর সাহেবও চলে গেলেন ঝড়ের বেগে।

আর থানাসুদ্ধু লোক ভয়ে বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

সাহেব যাওয়ার আগে পুলিশের খাতায় খসখস করে কী যেন সব লিখে গেছেন।

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে সবাই একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে খাতার পাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখলেন সাহেব যা লিখে গেছেন: 'দি ম্যান ইজ নোন টু মি অ্যান্ড অ্যাজ সাচ আই অ্যাম রিলিজিং হিম।' লেখার শেষে নিজের নামও সই করে গেছেন সাহেব।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে এমনই সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে, সবাই যেন কী রকম হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করার মতো মনোবলও ছিল না কারও। যাই

হোক, সে রাতের সেই অবাস্তব অভিজ্ঞতার সত্যাসত্য যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেল টেগার্ট যখন পুলিশ কমিশনার ছিলেন তখন এই নামাঙ্কিত ব্যক্তি ওই থানারই একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। পুরনো নথিপত্রের সইয়ের সঙ্গে সে রাতের সেই রহস্যময় মানুষটির সইয়ের হুবহু মিল পাওয়া গেল। শুধু তারিখেরই যা হেরফের হল। এবং অনুসন্ধানে এও জানা গেল, এই সাহেবটি তৎকালীন সময়ে স্বদেশিদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।



বাঁকিপুরের মস্তান

হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে মির্জাপুর-বাঁকিপুর নামে একটি স্টেশন আছে। স্টেশনের একদিকের প্ল্যাটফর্ম মির্জাপুরে এবং অপরদিকেরটি বাঁকিপুরে। অনেকদিন আগের কথা, বাঁকিপুরের এক মেছুনি মির্জাপুরের হাটে যেত মাছ বিক্রি করতে। তখন এসব জায়গা ছিল ঘন বনজঙ্গলে ভরা। মেছুনির নাম নিস্তারিণী। খুব দুর্দান্ত মহিলা এবং অসমসাহসী বলে ব্যাপক পরিচিতি ছিল তার। একা একা রাতভিত দূর-দুরান্তরে যাওয়াটা তার কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। তা হাট থেকে ফিরতে নিস্তারিণীর একটু রাত হয়ে যেত। তখনকার দিনে গ্রামেঘরে সন্ধেরাতই তো অনেক রাত। সেই রাতে মাথায় মাছের শূন্য ঝুড়ি আর হাতে আঁশবঁটি নিয়ে গ্রামে ফিরত নিস্তারিণী।

মির্জাপুর বাঁকিপুর পাশাপাশি গ্রাম হলেও দূরত্ব ছিল অনেকখানি। আর ওখানে তখন হাট বসত বিকেলের দিকে। তা ফেরার সময় রাতের অন্ধকারে নিস্তারিণী প্রায়ই শুনতে পেত ছায়া ছায়া কালো কালো কারা যেন বলছে, "এই মাছ দেঁ না।"

ওরা যে কারা তা নিস্তারিণী বেশ ভালভাবেই জানত। কিন্তু ভয়ডর বলে তো কিছু ছিল না ওর, তাই বলত, "মাছ খাওয়ার শখ হয়েছে, মাছ খাবি? তা আমার নাম নিস্তারিণী। বাঁকিপুরের ডাকসাইটে মেয়ে আমি। দেখছিস হাতে কী? এই আঁশবটি দিয়ে নাক কান কেটে ছেড়ে দেব। দূর হ!"

"দেঁ না রে। রাঁগ করিস কেন! খুঁব খেতে ইচ্ছে করছে।"

"খেতে ইচ্ছে করছে তো পুকুরে যা। অনেক মাছ পাবি। আমার টুকরিতে কি মাছ আছে যে দেব?"

"পুঁকুরে তো জাঁল ফেলা হয়েছে। যদি জঁড়িয়ে যাই।"

"তবে চুলোর দোয়ারে যা। ভাগ!"

অবশেষে পালাত সব।

আর নিস্তারিণী গজগজ করতে করতে বাড়ি ফিরত। "মর মর হতচ্ছাড়ারা। জ্বালিয়ে খেলে। সারা রাস্তাটা মাছ দে, মাছ দে, যমের বাড়ি যা।"

নিস্তারিণীর মুখে সব কথা শুনে সকলে বলত, "আর কেন পিসি? তিন কুলে কেউ তো নেই তোমার। কী দরকার ওইরকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আসতে যাওয়ার? একটু বেলাবেলি ফিরলে তো পারো। গ্রামেঘরে থাকি আমরা। ভূতের উপদ্রবে তো জ্বলেপুড়ে মরছি। জেনেশুনে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোজ ওইভাবে আসবার দরকারটা কী? একটু বেলাবেলি এসো এবার থেকে।"

নিস্তারিণী বলল, "তাই কি হয় রে বাবা! বেলাবেলি ফিরব বললেই কি ফেরা যায়? সব মাল বেচতে বুচতেই তো সন্ধে কাবার। তারপর দুটি মুড়ি মিষ্টি কিনে একটু জলটলও তো খেতে হবে। কাজেই রাত হয়।"

কথাটা সত্যি। যার যা কাজ তাকে তা করতেই হয়। আর ফেরবার সময় এ-পথে আসার সঙ্গীও কেউ থাকে না। কাজেই একা-একাই ফিরতে হয়।

সেদিনও হাটবার ছিল। নিস্তারিণী রাতের অন্ধকারে একা-একা ফিরছিল হাট থেকে। আজ একটা ছোট রুইমাছ বেঁচে গেছে তার। কাজেই মনটাও বিশেষ ভাল ছিল না। আসার পথে বনের ভেতর শুরু হল উপদ্রব "ওঁরে কে আছিস, দেঁখবি আয় পিঁসি আজ আমাদের জন্য মাছ এনেছে।"

নিস্তারিণী রেগে বলল, "আয়, নিবি আয়। এই আঁশবঁটি দিয়ে যদি না তোদের নাক-কান কেটে দিই তো কী বলেছি।"

কিন্তু বললে কী হবে? কে কার কথা শোনে?

চারদিক থেকে সবাই এসে ছেঁকে ধরল নিস্তারিণীকে। সবাই একজোট হয়ে বলল, "আঁজ আর তোঁকে ছাঁড়ছি না পিসি। রোঁজ ফাঁকি দিয়ে চলে যাস। আঁজ তোকে মাছ দিতেই হবে।"

নিস্তারিণী বলল, "দিতে তো কোনও আপত্তি নেই। তবে তোরা যে ভারী বদ। তোদের হাতে মাছ দিলেই তো তোরা আমাকে মেরে ফেলবি।"

"না না মাঁরব না। ভঁয় নেই।"

"ঠিক বলছিস?"

"হ্যাঁ, ঠিক বলছি। মাছ দে।"

"তা হলে একটু এগিয়ে গিয়ে ওই ওইখানটায় দাঁড়া।" বলামাত্র অশরীরী ছায়াগুলো এগিয়ে গিয়ে সেইখানে দাঁড়াল। নিস্তারিণীও এক-পা দু' পা করে এগিয়ে চলল।

"কঁই দে?"

"আর একটু এগিয়ে যা।"

ছায়ারা আরও এগিয়ে গেল।

"এঁবার দেঁ।"

"আঃ। এত তাড়া কেন? বলছি তো দেব। রেললাইনটা পেরিয়ে ওপারে যা, ঠিক দেব।"

"ঠিঁক দিবি তো? তুঁই কিন্তু অনেকক্ষণ থেকেই দেঁব দেঁব কঁরছিস কিন্তু দিঁচ্ছিস না।"

"এবার ঠিক দেব!"

ছায়াগুলো এবার লাইন পেরিয়ে বাঁকিপুরের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। নিস্তারিণীও লাইন পার হয়ে এপারে এল। এইভাবে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শুঁড়িপথ বেয়ে খানিকটা যেতে পারলেই গ্রামে গিয়ে পৌঁছবে। অতএব আর একটু যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ওদের তা হলে চেঁচামেচি করে লোকজন ডেকে তাড়ানো যাবে এবারের মতো। কিন্তু না। নিস্তারিণী যা ভাবল তা হল না। আর যাওয়া গেল না। ততক্ষণে গাছের কাঁচা ডাল ভেঙে বাঁশগাছ নুইয়ে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

নিস্তারিণী বলল, "এ কী! এইভাবে পথ আটকালি কেন? বনের ভেতরে সাপখোপ কোথায় কী আছে, তোদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? তার চেয়ে আমার বাড়িতে চল। ভাল করে মাছ রেঁধে খাওয়াব তোদের।"

অমনই উত্তর এল, "আঁমরা রান্না করা মাছ খাঁই না পিসি। ওঁই মাছ তুই এখানেই দেঁ। যঁদি না দিস তাঁ হলে জেনে রাখিস আজই তোর শেষ রাত।"

নিস্তারিণী বুঝল আজ সত্যিই তার নিস্তার নেই। কেননা যেভাবে মরণফাঁদে আটকেছে

ওরা তাতে এই ঘেরাটোপ থেকে কোনওমতেই প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না সে। আজ ভূতের হাতেই মরতে হবে তাকে। নিস্তারিণী তখন হঠাৎ একটু চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "চারদিকে এত ভূত কিন্তু আমাদের এই বাঁকিপুরের কি কেউ কোথাও মরে ভূত হয়ে নেই গো। আমি একজন অসহায় স্ত্রীলোক। মির্জাপুরের ছ্যাঁচোড় ভূতগুলো এসে আমাকে একা পেয়ে বাঁকিপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাচ্ছে। আর তোমরা বাবারা এটাকে মেনে নেবে? তোমরা কি কেউ আমাকে সাহায্য করবে না? এটা তো তোমাদেরও মান ইজ্জতের ব্যাপার। তোমরা থাকতে আমি বেঘোরে মরব?"

সঙ্গে সঙ্গেই হইহই করে উঠল কারা, "কেঁ! কেঁ ডাকে আমাদের? কেঁ গাঁ।"

"আমি বাঁকিপুরের নিস্তারিণী। এই দেখ না বাবারা মির্জাপুরের ছ্যাঁচড়া ভূতগুলো এসে আমাকে কীরকম জ্বালাতন করছে।"

"ওঁ। আঁমাদের নিস্তারপিসি? তোঁমাকে ভয় দেখাচ্ছে মির্জাপুরের ভূঁতেরা। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।" বলেই বাঁকিপুরের ভূতেরা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে মির্জাপুরের ভূতেদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সে এক রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ। বাঁকিপুরের ভূতেরা বলল, "চাঁলাকি পেয়েছিস তোঁরা? বেঁপাড়ার ভূত এ পাঁড়ায় এসেছিল রঙবাজি করতে? আঁমরা কোনওদিন ভুলেও পিসিকে ভয় দেখাইনি। আঁর তোদের এত সাহস যে আমাদের পিসিকে তোরা ভয় দেখাস! ভূত ভূতের মতন থাকবি, মানুষের পেছনে লাগা ·কী রে? আর কোনওদিন যদি এই তল্লাটে তোদের দেখেছি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। তোদের চেয়েও সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি। আমরা যদি সবাই গিয়ে এবার দলে দলে তোদের মির্জাপুরে ঢুকি তো এই অঞ্চল ছেড়ে পালাতে পথ পাবি নে তোরা। বুঝলি?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই তো মির্জাপুরের ভূতেরা দৌড় দৌড় দৌড়।

বাঁকিপুরের ভূতেরা বলল, "তা নিস্তার পিসি, এবার তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে যেতে পারো। যা শিক্ষা দিয়েছি ওদের ওরা আর কখনও তোমাকে জ্বালাতন করবে না।" এই বলে সবাই মিলে হাতাহাতি করে গাছের ডালপালা সরিয়ে নোয়ানো বাঁশ খাড়া করে পথ পরিষ্কার করে দিল পিসির। নিস্তারিণীও এবার নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে এল।



বিদেহী

আজ থেকে বিশ-পঁচিশ বছর আগে মিহিজামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। চারদিকে ছিল ঘন সবুজের সমারোহ। ছোট ছোট টিলা পাহাড়ে ভর্তি ছিল জায়গাটা। এখন সুন্দর পাহাড়ি এলাকা ছাড়া আর কোনও টিলা নেই বললেই চলে। দূরের পাহাড়গুলো অবশ্য যেমন ছিল তেমনই আছে।

মিহিজামে খুকুদিরা থাকতেন গোলাপবাগের কাছে ছোট্ট একটি বাড়িতে। চারদিকে লাল মাটির প্রান্তর। বন উপবন। কী চমৎকার সবুজের সমারোহ সেখানে! সময়টা তখন ভাদ্র-আশ্বিন মাস। হঠাৎ কিছুদিন জ্বর ভোগ করে শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন খুকুদির একটা চিঠি এসে হাজির। খুকুদি সেই চিঠিতে আমাদের সবার কুশল নিয়ে বারবার অনুরোধ করেছেন ওঁদের মিহিজামে একবার বেড়াতে যাওয়ার জন্য। বিশেষ করে আমাকে। লিখেছেন, 'এই শরতে অন্তত কয়েকটা দিন আমাদের এখান থেকে ঘুরে যা। দেখবি খুব ভাল লাগবে। আমার তো এখন এমন হয়েছে যে মিহিজাম ছেড়ে আর কোথাও যেতেই ইচ্ছে করে না। আসবি তো?'

চিঠি পেয়ে আমি তো লাফিয়ে উঠলাম। বাবা মা'ও উৎসাহিত হলেন খুব।

বাবা বললেন, "তা কয়েকটা দিন ছেলেটা যদি একটু হাওয়া বদল করে আসে তো মন্দ কী? খুকু যখন অত করে লিখেছে তখন যাক না, শরীরটা ভাল হবে। দুর্বলতাও কাটবে।"

মায়েরও অমত হল না। অতএব যাওয়ার দিন ঠিক হল।

বাবার এক বন্ধু ছিলেন রেলের চেকার। উনি প্রায়ই চিত্তরঞ্জন মধুপুর হয়ে ঝাঁঝার দিকে চলে যেতেন। আমাকে একদিন তাঁরই সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল চিত্তরঞ্জনে। মিহিজাম গেলে চিত্তরঞ্জনেই নামতে হয়। লাইনের এপার আর ওপার। খুকুদিরা তো দারুণ খুশি হলেন আমাকে দেখে। খুকুদির বাবা মা খুকুদি, সকলেরই আনন্দ আর ধরে না!

খুকুদি বললেন, "তুই এসেছিস এতে যে আমার কী আনন্দ তা কী বলব। প্রায়ই তোর কথা ভাবি। একসঙ্গে ছিলাম কতদিন। এখন আমি একা।"

আমি বললাম, "অনেকদিন পর তোমাকে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে খুব। বাড়ি তো চিনে গেলাম। এখন সময় সুযোগ হলে আমি একাই চলে আসতে পারব।"

খুকুদিদের বাড়িটা দোতলা। ওপরে দুটো ঘর, নীচে দুটো। খুকুদির বাবা-মা নীচের ঘরে শোন, খুকুদি ওপরে। খুকুদির পাশের ঘরটাই আমার জন্য বরাদ্দ হল। আমাকে যে ঘরটায় থাকতে দেওয়া হল সেই ঘর থেকে দূরের হিলটপের দৃশ্য দেখা যেত ভালভাবে। বন সবুজে ঘেরা হিলটপের দৃশ্য ছিল কী চমৎকার! জানলা খুললে সুগন্ধ ফুলের সৌরভে মন প্রাণ আমোদ করে দিত।

ঘর দেখে দারুণ খুশি হলাম আমি। খুকুদিকে বললাম, "আপনার বাবা এই একটা ভাল কাজ করেছেন। এমন সুন্দর পরিবেশে বাড়িটা কিনেছেন যে, তা বলবার নয়।"

খুকুদি বললেন, "এই তো দু' মাস হল কেনা হয়েছে বাড়িটা। আগে আমরা লাইনের ওপারে আমলাদহিতে থাকতাম। বাবার চাকরির মেয়াদও শেষ হল, আমরাও বাড়ি কিনে চলে এলাম। মাত্র দশ হাজার টাকায় পেয়ে গেলাম বাড়িটা। ওইজন্যই তো চিঠি লিখলাম তোকে, আয় এসে ঘুরে যা।"

"ভাগ্যিস এলাম। এরপরে মা বাবাকেও নিয়ে আসব একবার। এমন সুন্দর পরিবেশ।"

"আমার কাছে তো এই বাড়িটা এখন স্বর্গ। দারুণ পছন্দ বাড়িটা।"

"আমারও।"

যাই হোক, খুকুদিদের আদর-যত্নে বেশ ভালভাবেই কেটে গেল কয়েকটা দিন। মিহিজামকে আমি এমনই ভালবেসে ফেললাম যে, এই জায়গা ছেড়ে আর বাড়ি ফিরে যেতেও ইচ্ছে করল না। জ্বরের ক্লান্তি দূর হলে দেহমনেও বল পেলাম। রোজ ভোরে উঠে খুকুদির সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, তারপর আদিবাসী গ্রাম ঘুরে শাল-মহুয়ার গন্ধে মেতে ঘরে ফেরা, বেলায় হাট বেড়ানো আর বিকেল হলেই হিলটপে উঠে বসে থাকা, এ কী ভোলবার? হাওড়া শহরের ঘিঞ্জি পরিবেশে থেকে যা কল্পনাও করিনি কখনও।

একদিন হল কি, খুব ভোরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। অন্যদিন খুকুদি আমাকে ডাকেন। আজ আমিই খুকুদিকে ডাকব বলে দরজা খুলে বারান্দায় এসেই দেখি খুকুদির বয়সী একটি অচেনা মেয়ে খুকুদির ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এই ক'দিনে মেয়েটিকে আমি একবারও দেখিনি। কে উনি? এত ভোরে কী করতে এসেছিলেন এখানে? মেয়েটি দারুণ সুন্দরী। এই আধো অন্ধকারেও তার রূপের ছটায় চারদিক যেন আলো হয়ে উঠেছে। উনি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিস্ময়ভরা চোখে একবার দেখে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন।

বিস্ময় আমারও বড় কম হল না! আমি খুকুদির ঘরের দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে সাড়া দিলেন খুকুদি। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললেন, "ভাগ্যে ডাকলি তুই। খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এত ঘুম আমি কখনও ঘুমোইনি।"

আমি বললাম, "উনি কে খুকুদি?"

"কার কথা বলছিস?"

"এই যে একটু আগে যিনি আপনার ঘর থেকে বেরোলেন?"

"আমার ঘর থেকে! কী যা-তা বলছিস তুই? এই তো আমি ঘুম থেকে উঠলাম। দরজার খিল খুললাম।"

আমি তখন সব কথা বললাম খুকুদিকে।

খুকুদি বললেন, "ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিসনি তো?"

"না। যা দ্যাখবার তা আমি সজ্ঞান অবস্থাতেই দেখেছি।"

খুকুদি বললেন, "কী জানি বাবা, কী দেখতে কী দেখেছিস তুই! নে, রেডি হয়ে নে। এইবেলা ঘুরে আসি একটু। খুব মেঘ করেছে আকাশে। যে কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি হতে পারে।"

আমার কি বলার অপেক্ষা রাখে? সঙ্গে সঙ্গে রেডি হয়ে নিলাম আমি। তারপর খুকুদির সঙ্গে চললাম প্রাতর্ভ্রমণে। ওই মেয়েটিব ব্যাপারে আর কোনও কথাবার্তা না হলেও মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল আমার।

আজ আমরা রেল ব্রিজ পার হয়ে অন্যদিকে চললাম। আকাশ তখনও ভালভাবে ফরসা হয়নি। এক জায়গায় পাঁচিল-ঘেরা একটি বাগানের ভেতর গাছে গাছে অসংখ্য চাঁপাফুল ফুটে থাকতে দেখে আমাদের লোভ হল খুব।

খুকুদি বললেন, "চাঁপাফুল আমার দারুণ প্রিয়। আমাদের বাগানেও গাছ আছে। কিন্তু এর গন্ধটা যেন অসাধারণ। কিন্তু এই ফুল কী করে পাই বল তো?"

আমি বললাম, "ভেতরে যেন কাদের সব কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ঢোকার কোনও রাস্তাও আছে।" আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখলাম একদল মেয়ে কলকল করতে করতে পাঁচিলের একটা ভাঙা অংশ থেকে বেরিয়ে আসছে।

ওরা বেরিয়ে এলে আমরাও ঢুকলাম। খুকুদি আঁচলভরে ফুল নিতে লাগলেন। আমি একপাশে একটি গোলঞ্চগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ দেখি একটু আগেই বাড়িতে দেখা সেই মেয়েটি খুকুদির পাশে পাশে থেকে ফুল কুড়িয়ে চলেছেন। খুকুদি তাকে লক্ষ না করলেও উনি কিন্তু মাঝে মাঝেই আড়চোখে তাকিয়ে দেখছেন আমার দিকে।

এমন সময় টপ টপ করে দু-একটা বৃষ্টির ফোঁটা আমার গায়ে পড়ল। আমি বললাম, "আর না খুকুদি, চলে এসো। না হলে ভিজে যাব আমি।"

কিন্তু খুকুদি আমার কথা শুনলেনই না। ভিজে-ভিজেও ফুল কুড়িয়ে চললেন। বৃষ্টির জল গায়ে পড়তেই সেই মেয়েটি ম্যাজিকের মতো উধাও। আমি কাছে গিয়ে খুকুদির হাত ধরে টান দিতেই খুকুদি যেন স্বাভাবিক হলেন। বললেন, "এঃ হে! তুই একেবারে ভিজে গেছিস রে! সবে জ্বর থেকে উঠেছিস তুই। হায় ভগবান!"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "খুকুদি, সেই মেয়েটা।"

"কার কথা বলছিস তুই?"

"সেই যাকে তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম।"

"কোথায় সে?"

"এখন কোথায় জানি না, তবে উনি তো তোমার পাশে পাশে থেকেই তোমার সঙ্গে ফুল তুলছিলেন।"

খুকুদি আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে বাগান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, "তোর কী হয়েছে বল তো আজ? বারবার কাকে দেখছিস তুই?"

আমি আস্তে করে বললাম, "একজনকেই।"

এমন সময় প্রবল বর্ষণ শুরু হল। আমরা একজনদের গাড়িবারান্দার নীচে আশ্রয় নিয়ে দাঁড়ালাম। ততক্ষণে আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বৃষ্টি থামলে বাড়ি ফিরে এলাম।

এর পর সারাটা দিন বেশ ভালই কাটল। মাঝে মাঝে মেঘ জমে বৃষ্টি হয়, কখনও রোদ ওঠে। বাগানের শিউলিগাছ থেকে টুপটাপ ফুল ঝরে পড়ে। আমি জানলার ধারে বসে প্রকৃতির লীলারূপ দেখি।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে তেড়ে জ্বর এল খুকুদির। সে কী জ্বর! তার সঙ্গে ভুল বকা। মাথায় আইস ব্যাগ চাপানো হল। ডাক্তার এলেন, ওষুধ দিয়ে গেলেন। তাই দেখে খুব মন খারাপ হয়ে গেল আমার। এই প্রথম ঘরের জন্য মন কেমন করতে লাগল। মা-বাবার কথা মনে পড়ল। আর একটুও এখানে থাকতে ইচ্ছে করল না আমার।

আজ আর বিকেলে কোথাও আমি বেড়াতে গেলাম না। বাড়ির ছাদে উঠে পায়চারি করে সময় কাটাতে লাগলাম। মাঝে একবার গেলাম খুকুদির ঘরে। খুকুদির তখন জ্ঞান নেই। জ্বরটা একভাবে রয়েছে। চোখ দুটো লাল। কাউকেই চিনতে পারছেন না। এমনকী নিজের

মা-বাবাকেও না।

খুকুদির মা সমানে কেঁদে চলেছেন। ওঁর কান্না দেখে আমারও চোখে জল এল।

খুকুদি বিহনে আমি একা পড়ে গেলাম।

রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর ওপরের ঘরে শুতে গিয়েই বিপত্তি। দেখলাম আমার আগেই বিছানা দখল করে কে যেন শুয়ে আছে। ঘরের ভেতরটা ম ম করছে চাঁপাফুলের গন্ধে। আমার সারা শরীর জুড়ে একটা হিম স্রোত নেমে এল। আমি দারুণ ভয়ে চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

সে রাতটা নীচের ঘরেই শুয়ে কাটল আমার। এর পর সারারাত আমি ভয়ে ঘুমোতে পারলাম না। আমার বিছানা দখল করে যিনি শুয়ে ছিলেন তাঁর কথা আমি কাউকে বলিনি। সেই তিনি, একই দিনে পর পর তিনবার যাঁকে দেখলাম।

যাই হোক, সকাল হতেই একজন লোককে দিয়ে আমাকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা হল। তখন বেনারস এক্সপ্রেস চালু ছিল। সেই গাড়িতেই হাওড়ায় এলাম।

এর ঠিক দু'দিন পরেই খুকুদি মারা গেলেন। ওঁর নাকি খুব খারাপ ধরনের ম্যানেঞ্জাইটিস হয়েছিল। পরে অবশ্য বাবার মুখে শুনেছিলাম খুকুদির বাবা যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে ওই বাড়িটা কিনেছিলেন তাঁরও একমাত্র মেয়ে ওই রোগেই মারা যান। তবে কি খুকুদির মৃত্যুর দূত হয়ে সেই মেয়েরই কায়াহীন ছায়া এসেছিল খুকুদিকে সতর্ক করতে অথবা কাছে টানতে? কে জানে?



গাড়লমুড়ির চর

হ্যাঁ, জায়গাটার নাম গাড়লমুড়ির চর। গাড়ল শব্দটা যদিও মার্জিত নয়, তবু জায়গাটার নাম ওই। হুগলি জেলার একান্তে এই স্থানে একসময় নাকি গালব মুনির আশ্রম ছিল। সেই গালব মুনির নাম থেকেই গালব মুড়ি এবং তারই অপভ্রংশ গাড়লমুড়ি। তা এই গাড়লমুড়ির চর বা শ্মশানের কুখ্যাতি নতুন নয়। রাতভিত ভুলেও কেউ যায় না ও-পথে। তবু একবার কী একটা কাজে বোধ হয় কিছু সওদা করতেই চোপার আবদুল হামিদকে জৌগ্রামে যেতে হয়েছিল। কাজ সেরে ফিরতে রাত হয়ে গেল অনেক। সবাই বারণ করেছিল আবদুলকে, "এত রাতে গাড়লমুড়ির চর দিয়ে যেও না গো আবদুল মিয়া। তার চেয়ে রাতটা এখানে কাটিয়ে দাও। কাল বরং ভোর ভোর রওনা হবে। পথে লোকও পাবে অনেক।" তা আবদুলের ছিল কাজের তাড়া। বলল, "সে হয় না গো। যা আছে কপালে, এই রাতেই আমাকে যেতে হবে।" এই বলে আল্লার নাম স্মরণ করে রওনা হল আবদুল।

সওদার মাল গোরুর গাড়িতে বোঝাই করে ধীরগতিতে গাড়ি নিয়ে মেঠো পথে চোপার দিকে চলল আবদুল। বিশ্বস্ত গোরু। এ-পথে অনেকবার গেছে, এসেছে। আর পথও একটাই। কাজেই ভুল হওয়ার কিছু নেই।

আবদুল দিব্যি গোরুর গাড়িতে আধশোয়া হয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে চলল। আসমানের চাঁদ পূর্ণিমাপক্ষে জ্যোৎস্নায় হাসছে। চারদিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ফিনফিন করছে যেন! মৃদুমন্দ বাতাস বইছে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে গাড়ি আর নড়ে না।

আবদুল ওই অবস্থাতেই মুখে বিচিত্র শব্দ করল, "হুবর্ হ্যাট হ্যাট। হিৎতা মারি কিটি হেঁই...।"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

আবদুল এবার সজাগ হয়ে উঠে বসল। তারপর যা দেখল তাতেই তো চক্ষুস্থির! দেখল, কখন যেন গাড়িটা গড়িয়ে গড়িয়ে গাড়লমুড়ির চরে এসে পৌঁছে গেছে। ডান দিকে শ্মশান, শ্মশানের বিশাল বটগাছের একটা ডাল রাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আর সেই ডাল ধরে কলরব করে দোল খাচ্ছে অসংখ্য শিশুর মেলা। তারা কেউ আবদুলের দিকে তাকিয়েও দেখছে না। হুটোপাটি ছুটোছুটি করে এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে যে, কোনওমতেই তাদের অতিক্রম করে গোরুর গাড়িকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না।

শ্মশানের যে প্রান্তে মৃত শিশুদের মাটিচাপা দেওয়া হয়, সেখান থেকে পিঁপড়ের সারির মতো শিশুর দল পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে। কেউ-বা খেলাধুলো করছে, আবার কেউ-বা ছুটে গিয়ে আবার সেই মাটির বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে তো ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল আবদুলের। সে তখন গাড়িতে বসেই করজোড়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে সেখানকার শ্মশানকালীকে ডাকতে লাগল, "মা!

মা গো! আমি জেতে মোছলমাল। তুই হিঁদুর দেবী। তোর কাছে কি জেতের বিচার আছে? আমিও তোর এক অধম সন্তান। তোর শিশুদের তুই সামাল দে। আমাকে রক্ষা কর মা।"

আবদুল কতক্ষণ এইভাবে ডেকেছিল কে জানে? হঠাৎ এক সময় শুনতে পেল শ্মশানের ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে কে যেন ডাকল 'আয়।' ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই শিশুর দল খেলা ফেলে ছুটে ঢুকল শ্মশানে। তারপর আধো-আলো আধো-অন্ধকারে মাটির বুকে মিলিয়ে গেল।

আবদুল দু' হাত জোড় করে শ্মশানকালীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আবার ফিরে চলল নিজের গ্রামে। এই অলৌকিক ঘটনার কথা সে কখনও ভুলবে না। আর ভুলবে না এখানকার শ্মশানকালীকে। তাই জাতে মুসলমান হয়েও এক ভর্তি অমাবস্যায় গাড়লমুড়ির শ্মশানকালীকে সে ডালা সাজিয়ে পুজো এনে দিয়েছিল। আর বৎসরান্তে ধান বেচার টাকায় বাঁধিয়ে দিয়েছিল মায়ের মন্দিরের চাতাল।



নিরাকারের কাহিনী

বেশ কয়েক বছর আগে বর্ষাকালে বর্ধমান জেলার বলগনার কাছে এক গ্রামে গিয়েছিলাম। উপলক্ষ ছিল বিয়েবাড়ি। বন্ধুর বোনের বিয়ে। এত দূর বলে কেউই যেতে রাজি হয়নি। রাজি না হওয়ার কারণও ছিল। একে বর্ষাকাল, তায় যাতায়াতের অসুবিধে। যে সময়কার কথা বলছি, তখন এত উন্নতমানের রাস্তাঘাট বা যানবাহনের সুবিধে হয়নি। তার ওপরে গ্রামে বিয়েবাড়িতে লোকজনের আধিক্যের জন্য থাকারও অসুবিধে হতে পারে। তাই অনেকেই যাবে স্থির করেও যেতে রাজি হল না শেষপর্যন্ত। কিন্তু একেবারেই কেউ না গেলে তো খারাপ দেখায়, তাই আমি আর বলাই নামে আমাদের এক বন্ধু চললাম নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই এলাম হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে লোকাল ট্রেনে বর্ধমান। বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা দর্শন করে একটা হোটেলে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে দুপুরের বাসে বলগনা। বলগনায় বাস থেকে নেমে যে গ্রামে আমরা যাব, সেই গ্রামের দূরত্ব হচ্ছে সাত মাইল। এ-পথে যাতায়াতের জন্য একমাত্র গোরুর গাড়িই ভরসা। নয়তো আচমকা গিয়ে পাওয়া যায় না। এ তো রিকশা নয় যে, ভাড়া খাটার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

যাই হোক, আমরা যখন বলগনার মোড়ে বাস থেকে নামলাম, তখন বেলা গড়িয়ে সন্ধে হয় হয়। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। মেঘের মূর্তি এমনই যে, এই নামে বুঝি! তাই কী যে করব কিছু ভেবে পেলাম না।

বলাই বলল, "এখনও ভেবে দ্যাখ যাবি কিনা, আকাশের যা অবস্থা তাতে আমার মনে হয় আর না এগিয়ে এখান থেকেই কেটে পড়ি চল। এই অচেনা জায়গায় পথে কোনও লোকজন নেই, সন্ধে হয়ে আসছে। কাদার পথ। আর এগোলে দুর্ভোগের শেষ থাকবে না।"

কথাটা ঠিক। তবে কিনা সত্যি-সত্যিই কি এতদূর এসে দুর্যোগের ভয়ে ফিরে যাওয়া যায়? তাই বললাম, "তাতে কী? বর্ষাকালে বৃষ্টি হবেই। সব জেনেই তো ঘর থেকে বেরিয়েছি। এখন ভয়ে পিছোলে কী করে হবে? অতএব আর দেরি না করে রওনা দিই চল।"

চল তো চল। একটা দোকানে শেষবারের মতো দু'জনে দু' কাপ চা খেয়ে চলা শুরু করলাম। আগের বৃষ্টির কাদা এখনও শুকোয়নি। তার ওপর আকাশে এই মেঘের ঘনঘটা। কী যে কপালে আছে কে জানে?

আমরা নিজেদের মধ্যেই কথা বলতে-বলতে পথচলা শুরু করলাম। লোকালয় ছেড়ে যখন আমরা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে এসেছি, তখনই শুরু হল বৃষ্টিপাত। প্রথমে বড়-বড় ফোঁটা। তারপরই মুষলধারায়। ছাতা মানল না। সেই দারুণ বৃষ্টিতে স্নান করে গেলাম দু'জনে।

বলাই বলল, "আমরা বোধ হয় দু' মাইল পথও আসিনি। এখনই কত পথ বাকি। কী করে

যাব রে ভাই?"

আমিও তখন চুপসে গেছি। বললাম, "তাই তো রে! বলগনাতে বলে-কয়ে কারও বাড়িতে থেকে গেলেই হত। এখন তো দেখছি আর এগোনোই যাচ্ছে না।"

শুধু যে বৃষ্টি, তা নয়। সেইসঙ্গে কড়কড় করে বাজ পড়ার শব্দ। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার এবং মেঘের কালিমায় এক হাত দূরের পথও দেখা যাচ্ছে না। কালো কুটিল যাকে বলে, তাই। পথে এমন কোনও জন-মানুষ নেই, যার কাছে একটু আশ্রয় প্রার্থনা করি, বা পথনির্দেশ পাই। সে যে কী বিপজ্জনক পরিস্থিতি, তা বলে বোঝানো যাবে না।

এইভাবে জলে-কাদায় টালমাটাল হতে-হতে কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ একসময় মনে হল আমাদের পিছু-পিছু কেউ যেন আসছে। কে আসে? এই অন্ধকার নির্জন রাতে কে ও? কেমন এক অশরীরী আতঙ্কে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। আমরা দু'জনেই ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

অমনই শুনতে পেলাম, "এ-পথে নতুন মনে হচ্ছে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, একেবারেই নতুন।"

"আসা হচ্ছে কোথা থেকে?"

"আমরা কলকাতা থেকে আসছি।"

"যাওয়া হবে কোথায়?"

আমরা গ্রামের নাম বললাম।

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই একটি বজ্রপাত। আর সেইসঙ্গে বিদ্যুতের চমক। তারই ক্ষণপ্রভায় মুহূর্তের জন্য দেখলাম লোকটিকে। কালো বর্ষাতিতে ঢাকা দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ের রং এত কালো যে, ছাতার কাপড়কে হার মানায়। ভদ্রলোক বললেন, "ওরে বাবা। ও তো অনেকদূর। এই দুর্যোগে যাবেন কী করে?"

"তাই তো ভাবছি।"

"লগনসার বাজার। বিয়েবাড়ি বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের বন্ধুর বোনের বিয়ে।"

"তা ওঁরা একটা গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখেননি কেন?"

"সে দোষ ওঁদের নয়। আসলে আমাদেরই আসবার কোনও ঠিক ছিল না।"

"এইভাবে রাতদুপুরে গ্রামে-ঘরে কেউ আসে? বিয়েটা কবে?"

"আগামীকাল।"

"হুঁ। তা হলে কাল ভোরে গেলেও চলবে।"

"কিন্তু আজকের রাত্রিটা কাটাই কোথায় বলুন তো?"

"ব্যবস্থা একটা করছি। এখন আসুন তো আমার সঙ্গে।"

আমি বলাইয়ের দিকে তাকালাম। বলাই আমার দিকে। যা আছে কপালে! আর যখন এগনো সম্ভব নয়, তখন এঁর আশ্রয় কিছুতেই ছাড়া নয়।

আমরা সেই ভদ্রলোকের পিছু-পিছু এক বিশাল বটগাছের নীচে এসে দাঁড়ালাম। তারপর বাঁধা রাস্তার ঢাল বেয়ে ছোট্ট একটি গ্রামে। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, ঘন বসতির গ্রাম। গোয়ালে গোরুর চোখ জ্বলছে। বৃষ্টিও সমানে চলছে। ভদ্রলোক একটি মেটে ঘরের দরজা খুলে আমাদের ঢুকতে বললেন। তারপর বললেন, "একটু বসুন। এখনই আলোর ব্যবস্থা হচ্ছে।"

আমরা ভিজে পোশাকেই কাদামাখা পা নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। তারপর অন্ধকারে হাতড়ে একটি তক্তাপোশ পেয়ে তাতে পা ঝুলিয়ে বসলাম। কিন্তু ভদ্রলোক সেই যে গেলেন আর আসার নাম নেই।

অনেক পরে ক্ষীণ একটু আলো দেখা গেল। মনে হল লণ্ঠন দুলিয়ে কেউ আসছে। সত্যিই তাই। টোকা মাথায় বেঁটেখাটো একজন গ্রামের লোক এক বালতি জল, একটা গামছা আর হারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকল। লোকটি বলল, "নিন, পা ধুয়ে ভাল করে বসুন। বাবু এখনই আসবেন।" বলেই চলে গেল লোকটি।

ঘরের সামনে দাওয়া ছিল। আমরা সেখানে পা ধুয়ে কিট-ব্যাগ থেকে শুকনো জামাকাপড় বের করে নিলাম। তারপর আলোটা একটা টেবিলের ওপর রেখে তক্তাপোশের বিছানায় বসলাম গুছিয়ে। এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাতে এমন একটি আশ্রয় প্রত্যাশারও বাইরে।

অনেক পরে ভদ্রলোক এলেন। সঙ্গে সেই লোকটি। হাতে বাটিভর্তি মুড়ি আর গরম তেলেভাজা। লোকটির হাতে চা।

ভদ্রলোক বললেন, "আপনাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম ভাই, কিছু মনে করবেন না। আসলে ঘরে কেরোসিন একফোঁটাও ছিল না। জোগাড় করতে দেরি হয়ে গেল।"

বলাই বলল, "কিন্তু এই দুর্যোগে গরম তেলেভাজা আপনি পেলেন কোথায়?"

"কেন? ঘরেই ভাজা হল। কুমড়ো, পোস্ত আর বেসন বর্ষাকালে গ্রামের মানুষদের ঘরে সবসময়ই মজুত থাকে। যাক, জুড়িয়ে যাওয়ার আগে খেয়ে নিন।"

আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে খেতে লাগলাম।

ভদ্রলোক বললেন, "আশা করি আমার এই ঘরে রাত কাটাতে আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না। কাল খুব ভোরে বৃষ্টি থামুক আর না থামুক, আপনাদের রওনা করিয়ে দেব। এই জনাই গোরুর গাড়িতে করে এগিয়ে দেবে আপনাদের।"

আমি বললাম, "তা হলে তো খুব ভাল হয়।"

কথা বলতে-বলতেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম আমরা। এমন মিষ্টি কথার লোক অথচ চেহারা দেখলে মনে হয় কী রাশভারী। বুকের ভেতরটা যেন ছাঁত করে ওঠে।

ভদ্রলোক বললেন, "বৃষ্টি কমলে আজ রাত্রেই পাঠাতাম আপনাদের, তবে কিনা এসব জায়গা তো ভাল নয়। তাই কাল ভোরেই যাবেন।"

আমি বললাম, "ভোরে যাওয়াই ভাল। কেননা আমার আবার ভূতের ভয় খুব। এই গ্রামে অন্ধকার রাতে পথের মাঝখানে যদি কেউ দেখা দেন, তা হলেই তো গেছি!"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "আপনি ভূত বিশ্বাস করেন? আমিও করি। আগে করতাম না, এখন করি। আর সেইজন্যই তো পথেঘাটে যাতে কারও পাল্লায় না পড়েন তাই টেনে আনলাম এখানে।"

বলাই বলল, "ঠিকই করেছেন। ওই যে আপনি বললেন আগে ভূতে বিশ্বাস করতেন না, এখন করেন, এর মানেটা কী? সেরকম কোনও অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছিল?"

ভদ্রলোক একটু সময় চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "হয়েছিল বইকী! আমার জীবনে ভূত দেখার অভিজ্ঞতা যা ঘটেছে তা শুনলে ভয় পেয়ে যাবেন।"

আমি বললাম, "তবু শুনিই না? এই বর্ষার রাতে তেলেভাজা-মুড়ির সঙ্গে ভূতের গল্প ভালই জমবে।"

ভদ্রলোক আমাদের দু'জনের দিকেই একবার ভাল করে তাকিয়ে বললেন, "ওই যে দেওয়ালে ছবিটা ঝুলছে, ওই ছবিটা কার বলুন দেখি?"

এতক্ষণ লক্ষ করিনি। এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে বললাম, "একজন দারোগার।"

"ওই দারোগার সঙ্গে আমার চেহারা মেলে?"

দু'জনেই বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, "আরে! তাই তো! এ তো আপনারই ছবি দেখছি।"

"হ্যাঁ, আমারই ছবি। তবে যৌবনের।"

আমরা দু'জনে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম চমকপ্রদ কিছু শোনার আশায়।

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন। তিনি যা বললেন তা এইরকম:

আমার নাম জলধর দত্ত। জলভরা মেঘের মতনই চেহারা আমার। আমায় দেখলে অনেক খুনের আসামিরও বুকের রক্ত জল হয়ে যেত। কাল ভোরে যে গ্রামের দিকে রওনা হবেন আপনারা, অনেকদিন আগে সেই গ্রামের একটি ঘটনার কথা আপনাদের বলব।

আমি তখন এই অঞ্চলে নতুন এসেছি। একদিন সন্ধেবেলা থানায় বসে এক প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময় দু'জন লোক এসে খবর দিল ওদের গ্রামে বিষয়সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে দু' ভাই নাকি নিজেদের মধ্যে মারামারি করে অবশেষে দু'জনেই আত্মঘাতী হয়েছে।

শুনেই মেজাজটা গেল খারাপ হয়ে। এই ধরনের কেস এলে কোনও পুলিশ অফিসারই শান্তিরক্ষার দায় এড়াতে পারেন না। আদৌ এটা আত্মহত্যা, না কেউ খুন করে ঘটনা সাজাচ্ছে, তাই বা কে বলতে পারে? অতএব যেতেই হল।

এইভাবে রাতদুপুরে যাওয়ার ব্যাপারে প্রবীণ ভদ্রলোক আমাকে অনেক বাধা দিলেন। বললেন, "গেলে কাল সকালে যাবেন, এই রাতদুপুরে কখনও না। একে এই সমস্ত অঞ্চল ভাল নয়, তার ওপর আপনি পুলিশের লোক। কার মনে কী আছে কে জানে।"

আমি তাঁর কথা না শুনেই রওনা দিলাম। বললাম, "পুলিশের লোকের প্রাণের ভয় থাকলে কি চাকরি করা চলে? তা ছাড়া আমার নাম জলধর। জলভরা মেঘ আমি। কেউ কিছু করতে এলে ভাসিয়ে দেব তাকে।" এই বলে আমার কনস্টেবল জনাকে নিয়ে ওদেরই গোরুর গাড়িতে চেপে রওনা হলাম ওদের সঙ্গে।

তখন গ্রীষ্মকাল। তাই পথযাত্রায় কোনও অসুবিধে হল না।

যাই হোক, গ্রামে পৌঁছতে রাত অনেক হয়ে গেল। গিয়ে দেখলাম ছেলেমেয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একটি দল একটি ঘরের সামনে ভিড় করে আছে।

আমি গিয়ে ঘরের শিকল খুলে ভেতরে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। রক্তমাখা দুটো দেহ ঘরের ভেতর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। লোক দুটোকে আমার খুবই চেনা বলে মনে হল। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় এদের দেখেছি। যাই হোক, এই ধরনের লাশকে তো পোস্টমর্টেম করতেই হবে, তাই গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে লাশ দুটোকে নামিয়ে আর-একটি গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে আবার ফিরে আসার প্রস্তুতি নিলাম। ওদের পরিবারের দু'জন লোককেও সঙ্গে নিলাম লাশের পাহারায়।

ফিরে আসছি আর বারবার মনে করবার চেষ্টা করছি কোথায় যেন দেখেছি লোক দুটোকে।

এমন সময় জনা বলল, "আমি কিন্তু চিনেছি বাবু। আমার খুব ভয় করছে। এই রাতদুপুরে না এলেই পারতেন!"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "তুই চিনেছিস? এরা কারা?"

"ভুলে যাচ্ছেন কেন? সন্ধেবেলা এরাই তো আমাদের থানা থেকে ডেকে আনল।"

এইবার মনে পড়েছে। সত্যিই তো! কিন্তু এমন বিস্মরণ আমার কেন হল? আমার মতন লোকেরও শিরদাঁড়ায় তখন ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল একটা। লোক দুটোকে গোরুর গাড়ি থেকে নামার পর আর তো দেখিনি!

আমাদের এই চাপা কথাবার্তা গাড়োয়ানের কানে গেল কিনা কে জানে? হঠাৎ গাড়ির গতি থেমে গেল।

বললাম, "কী হল! থামলে কেন, চালাও?"

"একটু চা-তেষ্টা পেয়েছে বাবু। গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই।"

"এখানে চা কোথায় পাবে? এই ফাঁকা মাঠে এত রাতে?"

"এখানেই তো চা পাব বাবু। ওই দেখুন।"

চেয়ে দেখলাম, দূরের একটা চালাঘরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। গাড়োয়ান পেছনের গাড়ির লোক দু'জনকে ডেকে নিয়ে চা খেতে গেল। যাওয়ার আগে বলল, "আপনারা খাবেন নাকি বাবু?"

বললাম, "না। তোমরাই খাও। আর একটু তাড়াতাড়ি করো।"

ওরা চলে গেল। পরক্ষণেই যা দেখলাম তা সত্যিই ভয় পাওয়ার মতন। দেখলাম পেছনের গোরুর গাড়ি থেকে সেই লাশ দুটো দড়ির বাঁধন খুলে দিব্যি উঠে ওদের সঙ্গে চা খেতে চলে গেল। সে-গাড়িতে কোনও গাড়োয়ান ছিল না। এই গাড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল সেটা। সে যাই হোক, ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হল! তখন আমরা সবিস্ময়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, সেই দু'জনই। দিব্যি হেসে-হেসে গল্প করতে-করতে চা খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখার পর আর গোরুর গাড়িতে থাকা নয়! আমি ইশারায় জনাকে নামতে বলে নিজেও নামলাম। তারপর ওদের নজর এড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম মাঠের ওপর দিয়ে। একটু পরেই দেখি গোরুর গাড়ি দুটোও লরির গতিতে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। গোরু দুটোর চোখ জ্বলছে। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

জলধরবাবু তাঁর গল্প এই পর্যন্ত বলেছেন, এমন সময় জনা এল। ভাতের থালা হাতে। বলল, "ওসব গল্প আর নয়। এখন খেয়ে নিন দেখি। নিয়ে শুয়ে পড়ুন তাড়াতাড়ি। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে।"

বৃষ্টি তখন থেমে গেছে।

আমরা জলধরবাবুকে বললাম, "তারপর!"

জলধরবাবু বললেন, "তারপর আর কী? নিন, খেয়ে নিন। ওই গল্প কাউকে বললে জনাটা খুব ভয় পায়।"

গল্প শুনে ভয় আমাদেরও যে পায়নি, তা নয়। তবু কৌতূহল হচ্ছিল। যাই হোক, আমরা চটপট খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

জলধরবাবু বললেন, "আপনাদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। জনা আপনাদের পাহারায় থাকবে। কোনও প্রয়োজন হলে ডাকবেন। বাইরেটায় থাকবে ও।"

আমরা শুয়ে পড়লাম এবং সারাদিনের ক্লান্তির জেরে ঘুমিয়েও পড়লাম।

পরদিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই জনা এসে ডেকে তুলল আমাদের। জলধরবাবুও এলেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জনার গোরুর গাড়িতে চেপে রওনা হলাম গন্তব্যস্থলের দিকে।

ভোরের আলো যখন আরও স্পষ্ট হয়ে আসছে তখনই একটা গাছতলায় গাড়ি থামিয়ে জনা বলল, "এটুকু পথ এবার আপনাদের হেঁটেই যেতে হবে বাবু। ওই দেখা যাচ্ছে গ্রাম। ওই গ্রামে আমি আর যাব না।"

কেন যাবে না তা জানি। আসলে ওই গ্রামের সেই অভিশপ্ত রাতকে আজও ভুলতে পারছে না ও।

আমরা দু'জনেই গাড়ি থেকে নেমে বললাম, "বেশ তো, অসুবিধে থাকে যেয়ো না। এটুকু পথ হেঁটেই চলে যাব আমরা। কিন্তু সে-রাতে শেষপর্যন্ত কী যে হল, সেটুকু জানার দরকার ছিল যে!"

জনা বলল, "শুনলে ভয় পাবেন না তো?"

"না। কাল রাতে জলধরবাবুর মুখে অত কিছু শুনেও কি ভয় পেলাম?"

"সে-রাতে আমরা ওদের হাতেই প্রাণ হারিয়েছিলাম।"

আমাদের দু'জনের গায়েই কাঁটা দিয়ে উঠল এবার। সর্বনাশ! এ কী শুনছি? জলধরবাবু, জনা, এরা তা হলে কারা? আমরা নড়াচড়া ভুলেও দাঁড়িয়ে রইলাম তাই। আমাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটল যখন, তখন জনাও নেই, গোরুর গাড়িরও চিহ্ন নেই। কী ভাগ্যিস, একটু-একটু করে দিনের আলো ফুটে উঠছিল তখন! না হলে এই অন্ধকার গাছতলায় কী যে হত, কে জানে?

এর পর আমরা নিরাপদেই গ্রামে পৌঁছলাম এবং বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে যোগ দিলাম ওদের অনুষ্ঠানে। বন্ধু তো বেজায় খুশি আমাদের পেয়ে। তবে গত রাতের ওই চরম অভিজ্ঞতার কথা আমরা ভুলেও বলিনি ওদের।



ঘনাপুরার কুঠিবাড়ি

বিন্ধ্যাচলের কাছে শিউপুরা নামে একটি জায়গা আছে। শীতকালে অনেক বাঙালি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সেখানে যান। একবার হল কি, আমিও আমার এক বন্ধুর সঙ্গে শিউপুরাতে এলাম। আমার বন্ধুর নাম অজয়। ও প্রতিবছরই ওর মা-বাবা ভাইবোনদের নিয়ে এখানে আসে। এবং মাসখানেক থেকে শরীর ভাল করে তারপরে যায়। এ-বছর একটু অসুবিধের কারণে ওর বাড়ির লোকরা কেউ এল না। তাই দু' বন্ধুতেই আমরা এলাম।

শিউপুরাতে আসার আগে লগনদেওকে চিঠি লিখে ঘর বুক করে তবেই আসা হয়। কিন্তু এবারে সেসব কিছুই করা হয়নি। তাই লগনদেও অন্য চেঞ্জারদের ঘর দিয়ে ফেলেছে মাত্র দু'দিন আগে। এমন সময় আমরা গিয়ে হাজির।

অজয়কে দেখেই তো জিভ কাটল লগনদেও। বলল, "এ কী বাবু, আপনি!"

অজয় বলল, "হ্যাঁ, আমি। আমার ঘর কই?"

"আমি তো এবারে আপনার কোনও চিঠি পাইনি। অন্যবারে আপনি মানি অর্ডারে টাকা পাঠিয়ে দেন. চিঠি দেন কিন্তু এবারে সেসব কিছুই করেননি। তাই ভাবলাম আপনাদের হয়তো কোনও অসুবিধে হয়ে গেছে, এ-বছর এলেন না। এই ভেবে আমি অন্য লোককে ঘর দিয়ে দিলাম।"

অজয় হেসে বলল, "তোমার অনুমানই ঠিক। আমাদের খুবই অসুবিধে এ বছর। তাই বাড়ির কেউ আসেনি। তবে কিনা আমার তো অসুবিধে কিছু নেই, সেইজন্য আমার এই বন্ধুটিকে নিয়ে চলে এলাম। এখন আমাদের থাকার একটু ব্যবস্থা করে দাও।"

লগনদেও বলল, "অসম্ভব। এ বছর এত বেশি চেঞ্জারের ভিড় যে, কোথাও কোনও জায়গা খালি নেই।"

"তা হলে কী হবে? ফিরে যাব আমরা?"

"না না। ফিরে যাবেন কেন? ব্যবস্থা একটা হবেই। এখান থেকে তিন কিমি দূরে পাহাড়ের কোলে ঘনাপুরা নামে একটি গ্রাম আছে। তার জল হাওয়া আরও ভাল। আপনারা সেইখানেই চলে যান। তবে কিনা ওখানে গেলে একটু অসুবিধে হবে আপনাদের। দোকান বাজার করতে শিউপুরাতেই আসতে হবে। আর—।"

"বলে ফ্যালো।"

"আর একটা অসুবিধে হবে, সন্ধে পর্যন্ত বাইরে থাকতে পারবেন না।"

আমি বললাম, "কেন?"

"ওখানে একটু বাঘের ভয় আছে।"

অজয় বলল, "কুছ পরোয়া নেই। ঘনাপুরাতেই যাব আমরা।"

"যান। তার আগে আমাকে দশটা টাকা দিয়ে যান, আপনাদের জন্য দোকান বাজারটা তো করে নিয়ে যেতে হবে।"

আমি দশটা টাকা লগনদেও-এর হাতে দিতেই ও খুব খুশি হয়ে ছোট্টু নামে একটি কিশোরী মেয়েকে আমাদের সঙ্গে দিল।

ছোট্টু আমাদের সামান্য মালপত্তর যা ছিল তা মাথায় নিয়ে বলল, "চলিয়ে বাবুজি।"

আমরা ছোট্টুকে অনুসরণ করে গ্রাম্য পথ ধরে পার্বত্য ঘনাপুরার দিকে চললাম। এই ঘনাপুরার উলটোদিকেই হল কালীকুঁয়ার বন। দুর্ধর্ষ সব ডাকাতের আস্তানা যেখানে।

আমি যে সময়কার কথা বলছি তখন এইখানকার বনভূমি যে কী নিবিড় ছিল তা এখনকার মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। যেমন গভীর অরণ্য, তেমনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। গাছের ডালে ডালে যেমন ময়ূরের বাহার ছিল, তেমনই ছিল বানরের উপদ্রব।

যাই হোক, একসময় আমরা ছোট্টুর সঙ্গে ঘনাপুরায় এসে পৌঁছলাম। এইখানে ইংরেজ আমলের পরিত্যক্ত একটি কুঠিবাড়ি ছিল। তারই একটি ঘরে আশ্রয় হল আমাদের। ঘরটা ধুলোয় ময়লায় ভরা। কিন্তু হলে কী হয়, মিষ্টি মেয়ে ছোট্টু নিমেষের মধ্যে ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দু'জনের জন্য দুটো নোয়ারের খাটিয়া এনে পেতে দিল। আমরা তার ওপর বেডশিট বিছিয়ে সেটাকে আমাদের শোওয়া-বসার উপযোগী করে নিলাম।

একটু পরেই লগনদেও এল। চাল ডাল তেল নুন আলু আর আণ্ডা নিয়ে। চালের সের তখন আট আনা। তেল আড়াই টাকা, আর এক টাকায় এক ডজন আণ্ডা। পাঁচ সিকে দেড় টাকায় একটা গোটা মুরগিও পাওয়া যেত। ভাবা যায়?

রান্নার জন্য কেরোসিন স্টোভের চল অতটা ছিল না তখন। ঘুঁটে কয়লার উনুনে অথবা উনুনের মতো করে ইট পাথর সাজিয়ে তাইতে কাঠ জ্বেলে রান্না করা হত।

আমরা লগনদেওকে বললাম, "সবেরই তো ব্যবস্থা হল, এখন রান্না করার জন্য একজন কাউকে ব্যবস্থা করে দাও।"

লগনদেও বলল, "কেন, ছোট্টুকে তো দিয়েছি। ও-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে। সারাদিন ও আপনাদের কাছে কাছে থাকবে। শুধু রাত্রে চলে যাবে ওর মায়ের কাছে।"

লগনদেও এর পর ওর পরিচিতদের সঙ্গে একটু বাতচিত করে আমাদের দেখভাল-এর পরামর্শ দিয়ে চলে গেল শিউপুরার দিকে।

ছোট্টু আমাদের রান্নাবান্নার কাজে লেগে গেল। আর আমরা অল্প সময়ের মধ্যে ঘনাপুরাকে চষে ফেলে ওখানকার পরিষ্কার ইঁদারার জলে স্নানটান করে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য তৈরি হলাম।

কিশোরী ছোট্টুকে খুবই ভাল লেগে গেল আমাদের। গায়ের রং মাজা কালো। ভাসা ভাসা চোখ আর কী সুন্দর ওর মুখখানি। খুবই গরিবের মেয়ে। ওর বয়স যখন দু' বছর তখন ওর বাবা কালীকুঁয়ার ডাকাতদের হাতে প্রাণ হারায়। এখন ওর বয়স চোদ্দো বছর। একমাত্র মা ছাড়া আর কেউ নেই ওর। মা জঙ্গলে কাঠ কুড়িয়ে সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে কোনওরকমে দিন চালায়। ছোট্টুর বিয়ের জন্যও কথাবার্তা চলছে শিউপুরার একটি ছেলের সঙ্গে, কিন্তু ছেলেটির বাবা দু' হাজার টাকা নগদ না পেলে এই বিয়েতে রাজি নয়।

যাই হোক, আমরা মধ্যাহ্নভোজন সেরে ট্রেন জার্নির ক্লান্তি দূর করতে তেড়ে একটা ঘুম দিলাম। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ছোট্টুকে ডেকে চা করতে বললাম। ও খুব আনন্দের সঙ্গেই আমাদের কাজ করতে লাগল। তার ওপর আমরা যে ক'দিন এখানে থাকব সেই ক'দিন আমাদের সঙ্গে ওকে খেতে বলায় ও আরও খুশি।

আমরা যখন কুঠিবাড়ির বাইরে বসে চা খাচ্ছি সেই সময় ছোট্টুর মা এল। ওর মাকে আরও সুন্দর দেখতে। মা এসে বলল, "লগনদেও তোমাদের এই বাড়িতে থাকতে দিয়েছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। শিউপুরাতে একটি ঘরও খালি নেই।"

"কিন্তু এই বাড়িতে তোমরা কেমন করে থাকবে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

আমার একটু ভূতের ভয় আছে। তাই বললাম, "কেন, রাত্রিবেলা খারাপ কিছু হয় নাকি এখানে?"

"কী যে হয় আর কী হয় না, তা আমরাও জানি না। তবে এই কুঠিবাড়িতে এর আগেও যারা এসেছিল তারা কেউ এক রাতের বেশি থাকতে পারেনি। সাহেব আমলের পুরনো বাড়ি। কত নাচ-গান, হইহল্লা, আমোদ-ফুর্তি, কত খুনখারাপি হয়েছে এখানে, তার ঠিক নেই।"

অজয় বলল, "তাতে কী? এই বন পাহাড়ের দেশে এমন একটা আশ্রয় যখন পেয়েছি তখন কোনও কিছুরই ভয়ে এখান থেকে আমরা যাচ্ছি না।"

অজয় বলল বটে, আমার কিন্তু ভয় কাটল না।

ছোট্টুর মা আমাদের রাতের খাবারের জন্য কয়েকটা রুটি ও ডাল তৈরি করে দিয়ে বিদায় নিল। আমরা ছোট্টুর জন্য ডাল রুটি দিয়ে দিলাম ওর মাকে। তারপর পাহাড় জঙ্গলের দেশে বনভূমির ফাঁক-ফোকরে যতটুকু যাওয়া যায় গিয়ে ফিরে এলাম।

সন্ধে হতেই ছোট্টুর মা একটা লণ্ঠন নিয়ে এসে রেখে গেল আমাদের জন্য। তারই আলোয় দু'জনে দুটো গল্পের বই নিয়ে পড়তে লাগলাম। কিন্তু রাতের কুঠিবাড়ি যে কখন কী চেহারা নেবে তাই কল্পনা করেই শিউরে উঠতে লাগলাম আমি। বেশিক্ষণ বইয়ে মনোনিবেশ করতে পারলাম না। বই মুড়ে রেখে অকারণেই পায়চারি করতে লাগলাম ঘরময়। কিন্তু আশ্চর্য! অজয়ের কোনও ভাবান্তর নেই।

একসময় ও-ই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হল তোর? ভয় করছে?"

"তা একটু করছে বইকী! এইরকম একটা বাড়িতে রাত্রিবাস করা রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার।"

"ভয়ের তো একটা কারণ থাকবে?"

"সেই কারণটা যখন ঘটবে তখনই টের পাবি। প্রথমে আলো নিভবে। তারপর খাটিয়া দুটো এদিক-ওদিক করবে। পরে বন্ধ দরজার খিল আপনা থেকেই খুলে যাবে। নয়তো হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও দরজা-জানলার কিছুই আমরা খুলতে পারব না। অর্থাৎ ছকে বাঁধা নিয়মগুলো এক-এক করেই হতে থাকবে সব।"

অজয় বলল, "কোনও কিছুই হবে না। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়, তেড়ে একটা ঘুম দে, দেখবি সকাল হয়ে গেছে।"

ওব কথামতো তাই করলাম। কিন্তু করলে কী হবে, দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ার ফলে আর মনের মধ্যে একটা অজানা আতঙ্ক দানা বেঁধে থাকায় ঘুম কিছুতেই এল না।

হঠাৎই দরজায় টক টক শব্দ।

ভয়ে বুক আমার শুকিয়ে যেতে লাগল। এই বুঝি আরম্ভ হল ভূতের উপদ্রব।

আমার ভয় দেখে অজয়ই উঠে গিয়ে দরজা খুলল।

ছোট্টুর মা সামনে দাঁড়িয়ে। বলল, "তোমাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

অজয় বলল, "না, না।"

"তোমরা দু'জনে ইচ্ছে করলে আমার ঘরে গিয়ে থাকতে পারো। আমরা মা-মেয়েয় আলাদা ঘরে শোবো, তোমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকবে।"

অজয় বলল, "কোনও দরকার নেই। বেশ আছি আমরা। এই রাতদুপুরে এই ঘর ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।"

আমি ততক্ষণে বেডশিট গুটিয়ে উঠে পড়েছি। বললাম, "ও না যায় না যাবে। আমি যাব। আমার ভয় করছে খুব।"

অজয় বলল, "কাপুরুষ কোথাকার! যা তবে বেরিয়ে যা। আমি একাই থাকব এই ঘরে। আমার কোনও ভয়ডর নেই।"

আমি আমার টর্চটি হাতে করে ব্যাগ, বেডশিট যা ছিল সব নিয়ে ছোট্টুর মায়ের সঙ্গে ওদের ঘরে চলে এলাম। গরিব মানুষের মাটির ঘর। দুটো ঘর পাশাপাশি। একটিতে আবর্জনা ভর্তি। অপরটি বসবাসের। তাইতেই একটি খাটিয়ায় পুরু করে কাঁথা পেতে বিছানা করা আছে। আর একটি শয্যা প্রস্তুত আছে ঘরের মেঝেয়। আমাদের দু'জনের জন্যই এই ব্যবস্থা। ওরা মা-মেয়েতে পাশের ঘরে সেই আবর্জনার পাশেই একটু জায়গা করে নিয়ে শুতে গেল। আমি রইলাম এই ঘরে।

ছোট্টুর মা বারবার বলল, "কী জেদি বাঙালি বাচ্ছা রে বাবা। একদম ভয়ডর নেই। এত করে বললাম তবু শুনল না। মা জগদম্বা সবার ভাল করুন। ওর যেন কোনও বিপদ না হয়।"

একা ঘরে ছোট্ট একটি চিমনি জ্বেলে শুয়ে রইলাম চুপচাপ। সে আলোয় অন্ধকারের কোনও ক্ষতিই হল না। না হোক, এখানে শুয়ে থাকলে আর যাই হোক ভূতের হাতে প্রাণ তো দিতে হবে না।

শুয়ে রইলাম। কিন্তু ঘুম এল না। হঠাৎই আমার কানে এল বিশ্রী ধরনের একরকম গানবাজনার শব্দ। মনে হল কারা যেন হইহল্লা করছে, নাচছে আর দারুণ সব বেলেল্লাপনার গান গাইছে। এসব যে কোথা থেকে ভেসে আসছে তা বুঝতে আর বাকি রইল না। আমি টর্চের আলোয় ঘরের দরজা খুলে উঁকি মেরেই দেখি দূরের সেই কুঠিবাড়ি যেন রাতের অন্ধকারে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে। বেলজিয়াম কাচের ভেতর দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে সেই আলো।

এই মুহূর্তে কেমন যেন এক অলৌকিক প্রভাবে আমার মনের ভেতর থেকে সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল। নিজেকে এবার সত্যিই কাপুরুষ বলে মনে হল আমার। অজয়কে ওইভাবে কুঠিবাড়িতে একা ফেলে রেখে এইভাবে চলে আসাটা কোনওমতেই উচিত হয়নি আমার। তাই এখনই ওকে ওইসব উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করে জুতোটা পায়ে গলিয়ে নামতে যাচ্ছি অমনই ছোট্টু এসে হাত ধরল আমার, "কাঁহা যা রহে তুম?"

বললাম, "কুঠিবাড়িতে।"

"মাত যাও। ওখানে গেলেই তোমার বিপদ হবে।"

ততক্ষণে ছোট্টুর মা-ও উঠে এসেছে, "কী হল রে ছোট্টু?" তারপর আমাকে দেখেই বলল, "এত রাতে কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

আমি কুঠিবাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, "আমার বন্ধুর কাছে। তোমরাও এসো আমার সঙ্গে। চেঁচিয়ে গ্রামের আর সব লোকেদের ডাকো।"

ছোট্টুর মা বলল, "কেন মিছিমিছি পরিশান হতে যাচ্ছ? ওই সাহেব ভূতেরা ওইরকমই।

হঠাৎ করে ওই কুঠিবাড়িতে কোনও মেহমান এলে ওদের খুব আনন্দ হয় এবং তখনই ওইসব আরম্ভ করে। সারারাত এই গানবাজনা চলবে ওদের। এই সময় কেউ বাধা দিলে ভীষণ রেগে যায় ওরা। আর গ্রামের লোকেদের কথা বলছ? হাজার ডাকাডাকি করলেও কেউ আসবে না। জেনেশুনে কেউ যাবে না ওখানে।”

আমি বললাম, “এইরকমই যখন ব্যাপার, তখন আগেভাগে আমাদের সতর্ক না করে ওই কুঠিবাড়িতে ঢুকিয়ে দেওয়াটা কোনওমতেই উচিত হয়নি লগনদেওয়ের। কাল সকালে ও আসুক, তারপর যা বলবার বলব ওকে।”

“বলাই উচিত। গত দু' বছরের মধ্যে কেউ রাত কাটায়নি ওই বাড়িতে। সেইজন্যই ও মওকা বুঝে তোমাদের ওই বাড়িতে ঢুকিয়ে পরখ করে দেখতে চেয়েছিল উপদ্রবটা আগের মতোই হয় কিনা। অথচ মজার ব্যাপার, দিনের বেলায় আমরা ওই বাড়িতে ঢুকি বেরোই কিন্তু কারও কিছু হয় না। শুধু রাত্রিবাস করতে গেলেই যা বিপত্তি।”

কুঠিবাড়ির বেলেল্লাপনা তখন চরমে উঠেছে। নাচগানের সঙ্গে চলেছে 'হ্যাঃ হ্যাঃ' করে সে কী বিকট হাসি!

আমি সব ভয়কে জয় করে সাহসে বুক বেঁধে হনহন করে এগিয়ে চললাম কুঠিবাড়ির দিকে। ওরা মা-মেয়েতে অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল আমার চলে যাওয়া।

কুঠিবাড়ির সামনে এসে একবার থমকে দাঁড়ালাম আমি। তারপর এগিয়ে গিয়ে দুম দুম করে দুটো লাথি মারলাম দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে গানবাজনা থেমে গেল। আলোও নিভে গেল ঘরের।

আর কী হল?

দরজাটা দু' হাট হয়ে খুলে গেল। আমার সামনে এসে দাঁড়াল কুকুরমুখো এক ফিরিঙ্গি সাহেব। যেমন বিচ্ছিরি তার চেহারা, তেমনই সাজপোশাক। ক্রুদ্ধ সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, “হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?”

আমি তখন ভীষণ রেগেছি। বললাম, “আই ওয়ান্ট টু ষষ্ঠীপুজো তোদের বাপের।”

“স্পিক ইংলিশ, ব্লাডি নেটিভ।”

“শাট-আপ। অসভ্য ট্যাঁশ ফিরিঙ্গির দল। তোদের বাপ-ঠাকুর্দা যে যেখানে আছে সবার নাম-ঠিকানা একটা কাগজে লিখে এখনই আমাকে দে। ফেরার পথে তোদের সবাইকে গয়ায় নেমে একটা করে পিণ্ডি দিয়ে তবেই আমি বাড়ি যাব।”

সাহেব আমার কথার মানে কী বুঝল কে জানে? অন্ধকারে আরও অনেকগুলো ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের কাছ থেকে একটা কাগজ চেয়ে খসখস করে কতকগুলো নাম লিখে আমার হাতে দিয়ে বলল, “গেট আউট।”

আমি বললাম, “যাব তো বটেই। নাহলে এই রাতদুপুরে এখানে বসে কি তোদের কেত্তন শুনব? তবে যাওয়ার আগে তোদের হাল কী করি দ্যাখ।” বলেই সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা অজয়ের হাত ধরে টেনে ঘর থেকে বের করে আনলাম ওকে। তারপর ঘরের মধ্যে যে লণ্ঠনটা ছিল সেটা খাটিয়ার ওপর কাত করে খানিকটা তেল ঢেলেই শিখা দিয়ে ধরিয়ে দিলাম আগুনটা। শুধু খাটিয়ায় নয়, সেই আগুন ছড়িয়ে দিলাম আশপাশেও।

সঙ্গে সঙ্গে ভেলকির খেলা। ইংরেজিতে অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে ছায়ামূর্তিগুলো জানলা-দরজা গলে যে যেদিক দিয়ে পারল পালাল।

লেলিহান অগ্নিশিখায় কুঠিবাড়ি পুড়ে ছাই। আমিও অজয়কে নিয়ে ছোটুদের বাড়িতে

এসে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ঘোর কাটালাম ওর।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ও বলল, আমি চলে আসার পর কখন যে কী হয়েছিল তা ওর মনে নেই। তবে ওদের দলে ভিড়ে এবং উৎসাহ পেয়ে ও শুধু নেচেই চলেছিল, নেচেই চলেছিল।

পরদিনই আমরা কুঠিবাড়ির সর্বনাশ দেখে ঘনাপুরা ত্যাগ করেছিলাম। লগনদেও কারও মুখে খবর পেয়েই সম্ভবত ভয়ে দেখা করেনি আমাদের সঙ্গে। তবে কিনা ফেরার পথে গয়ায় পিণ্ডি দিতে গিয়ে এক অন্য অভিজ্ঞতা হল। পাণ্ডারা বলল, "আমরা গুণ্ডাগর্দি করি, মানুষ খুন করি, জ্যান্ত মানুষেরও পিণ্ডি চটকাই। কিন্তু সাহেব ভূতের পিণ্ডির মন্ত্র আমাদের কারও জানা নেই। তবে কিনা আমাদের যেমন গয়া তেমনই ওদের হয়তো গোয়া। তা আপনারা একবার গোয়ায় গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারেন।"

আমাদের বয়েই গেছে গোয়ায় যেতে! তাই গয়া থেকে বুদ্ধগয়া দেখে দু'-একদিনের মধ্যেই আমরা বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।



বেলগাছের মহাপ্রভু

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি। হাওড়া জেলার শিবানীপুরে বৈকুণ্ঠ বাঁড়ুজ্যে নামে এক সদাশয় ব্যক্তি থাকতেন। তিনি ছিলেন অগাধ সম্পত্তির মালিক। যে বাড়িতে তিনি থাকতেন সেই বাড়িটাকে লোকে রাজবাড়ি বলত। বলবে না-ই বা কেন? অতবড় বাড়ি তখন ওই অঞ্চলে আর একটিও ছিল না। সেই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে পুকুর বাগান সবকিছুই ছিল। বৈকুণ্ঠবাবুকে গ্রামের লোকেরা সমীহ করত খুব। ভক্তি-শ্রদ্ধাও করত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাত্ত্বিক লোক। সামান্য অংশের জমিদারি দেখাশোনা করতেন। আর বাকি সময়টা আফিং খেয়ে বসে বসে ঝিমুতেন। বৈকুণ্ঠবাবুর রাজবাড়ির বাগানে একটা বেলগাছ ছিল। সেই বেলগাছে এক মহাপ্রভু থাকতেন। মহাপ্রভু বলতে কাকে বলছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? বেহ্মদত্যি। ঠিক দুপুরবেলায় অথবা ভর সন্ধেয় কিংবা ফিনফিনে জ্যোৎস্নার রাতে ভাগ্যবান লোকেরা কখনও সখনও তাঁর দেখা পেত। যারা তাঁকে দেখত, তারা বলত তাঁর নাকি টকটকে ফর্সা গায়ের রং। পরনে ধুতি, গলায় পৈতে। অনিন্দ্যসুন্দর চেহারা। যাই হোক, বেলগাছের এই মহাপ্রভুর সুনাম ছিল খুব। তিনি কখনও কারও অনিষ্ট করতেন না। কাউকে ভয় দেখাতেন না। শুধু কেউ কোনও অনাচার করলে তিনি বিনয়ের সঙ্গে বৈকুণ্ঠবাবুর কাছে নালিশ জানাতেন।

বৈকুণ্ঠবাবুর তিন ছেলে। হেমন্ত, জয়ন্ত ও শ্রীমন্ত। তা ছোট ছেলে শ্রীমন্ত অকালে মারা গেলে তিনি খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। তার ওপর একদিন যখন তাঁর স্ত্রীও দেহরক্ষা করলেন তখন দারুণ ভেঙে পড়লেন তিনি। বছরখানেক বাদে শোকটা একটু সামলে নেওয়ার পর তিনি হেমন্ত ও জয়ন্তর বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। হেমন্ত ও জয়ন্তর মধ্যে জয়ন্ত ছিল যেমন সৎ সজ্জন ও বিনয়ী, হেমন্ত ছিল তেমনই উগ্র বদমেজাজি ও উচ্ছৃঙ্খল। কাজেই হেমন্তকে নিয়ে বৈকুণ্ঠবাবুর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এই হেমন্ত কিন্তু বেলগাছের ওই মহাপ্রভুকে সমীহ করত না একটুও। তাঁকে স্বীকারই করত না সে। বলত, ওসব ব্রহ্মদত্যি-টত্যি আবার কী? সব বাজে। যতসব উদ্ভট কল্পনা। ওইসব আবার আছে নাকি? হেমন্তর মনোভাব মহাপ্রভু বুঝতে পারতেন। কিন্তু তার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তাকে কখনও তিনি দেখাও দিতেন না বা কিছু বলতেনও না। তার অনেক অন্যায় তিনি ক্ষমা করে নিতেন। খুব অসহ্য হলে মাঝে মাঝে অভিযোগ করতেন।

একদিন সন্ধেবেলা বৈকুণ্ঠবাবু ঝিম মেরে বসে আছেন। এমন সময় খড়মের শব্দ খট্ খট্ খট্। বৈকুণ্ঠবাবু বুঝতে পারলেন, মহাপ্রভু আসছেন। কী আদেশ করেন তাই শোনবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। একটু পরেই মহাপ্রভুর কণ্ঠস্বর কানে এল তাঁর, "বৈকুণ্ঠ!"

বৈকুণ্ঠবাবু করজোড়ে বললেন, "আদেশ করুন প্রভু।"

"তোর বড় ব্যাটাকে একটু সাবধান করে দিস। একেবারে উচ্ছন্নে যাচ্ছে ওটা।"

"আপনি ওকে ক্ষমা করুন প্রভু। আমি শাসন করছি ওকে।" বলেই হেমন্তকে ডেকে

পাঠালেন তিনি।

হেমন্ত কাঁচুমাচু হয়ে এসে দাঁড়াতেই বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, "হতভাগা, কী করেছিস তুই?"

হেমন্ত অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "কী আবার করব!"

"নিশ্চয়ই কোনও কুকীর্তি করেছিস। না হলে মহাপ্রভু হঠাৎ এসে তোকে সাবধান করে দেওয়ার কথা বললেন কেন? কিছু না করলে উনি কখনও শুধু শুধু অভিযোগ করেন?".

হেমন্ত রেগে বলল, "কী করেছি না করেছি সে তোমার প্রভুই জানেন। আমার তো কিছু মনে পড়ছে না। তা ছাড়া ওসব প্রভু-টভু আমি বিশ্বাস করি না।"

যেই না বলা, বৈকুণ্ঠবাবু অমনই ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলেন হেমন্তর গালে। বললেন, "তার মানে তুই আমাকে অবিশ্বাস করিস?"

হেমন্ত গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "আমি কি তাই বললুম?"

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, "দূর হয়ে যা তুই আমার চোখের সামনে থেকে। যা—।"

হেমন্ত চলে গেল।

বৈকুণ্ঠবাবু ডাকলেন, "ফাগু!"

বাড়ির পুরাতন ভৃত্য ফাগু এসে বলল, "আমাকে ডাকলেন কত্তা?"

"হ্যাঁ বাবা। একবার যা তো, একটু খোঁজ নিয়ে দেখ তো, তোর বড়দাদাবাবু কোথায় কী করেছে? নিশ্চয়ই কোনও অপকর্ম করেছে ও।"

ফাগু একটু ঘুরে এসে বলল, "কেলেঙ্কারি হয়েছে কর্তাবাবু। বড়দাদাবাবু আজ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাগানে মুরগি রেঁধে খেয়েছেন। সেইসব মুরগির পালক উড়ে মহাপ্রভুর বেলতলা একেবারে নোংরা করে দিয়েছে।"

শুনেই লাফিয়ে উঠলেন বৈকুণ্ঠবাবু, "সে কী রে! যা যা, শিগগির যা। গিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে আয়।" বলে নিজেও চললেন ফাগুর সঙ্গে।

বেলতলায় গিয়ে ঝাঁটপাট দিয়ে সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ধুনো গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করলেন জায়গাটকে। তারপর জোড়হাত করে মহাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করলেন। হাজার হলেও ওঁরা হলেন অলৌকিক শক্তির ধারক। একবার যদি অসন্তুষ্ট হন তা হলে কি রক্ষে থাকবে?

একদিন দুপুরবেলা হেমন্তর বউ অর্থাৎ এ-বাড়ির বড় বউমা পুকুরে গেছে স্নান করতে। হঠাৎ চারদিক থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে এল। বুকভরে শ্বাস নিয়ে বড় বউমা জল সপসপ কাপড়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে, এমন সময় কে যেন বললেন, "কাপড়টা একটু নিংড়ে নে মা। না হলে গায়ে জলের ছিটে লাগবে।"

বড় বউমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে দেখল এক দিব্য পুরুষ খড়ম পায়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে প্রশান্ত বদনে নেমে আসছেন। তবে দৃষ্টি তাঁর বউমার দিকে নয়, পুকুরের জলের দিকে। বড় বউমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। তাই সে মহাপ্রভুকে চিনতে ভুল করল না। তাড়াতাড়ি কাপড় নিংড়ে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মহাপ্রভুও থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, "ভয় পেলি মা! ভয় কী? তুই না মনে মনে আমাকে দেখতে চেয়েছিলি? সন্ধেবেলা দেখলে যদি ভয় পাস, তাই দুপুরে দেখা দিলাম। যা, চলে যা।"

বড় বউমা অবাক হয়ে চেয়ে রইল মহাপ্রভুব দিকে। মহাপ্রভুর জ্যোতির্ময় রূপ দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। এই নাকি ব্রহ্মদৈত্য! ওরে বাবা! না মানুষ না দেবতা। অথচ মানুষের মতো

চেহারা। কিন্তু ছায়া ছায়া। যেন আয়নার ছবির মতো। যাকে ধরা বা ছোঁয়া যাবে না। বড় বউমাকে ওইভাবে অপলকে চেয়ে থাকতে দেখে মহাপ্রভু বললেন. "বেশি দেখিস না মা। পেছন ফিরেও তাকাস না। না হলে আমি যখন মিলিয়ে যাব তখন দারুণ ভয় পেয়ে যাবি।"

বড় বউমা আর কোনওদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে চলে এল। এসে হেমন্তকে বলল, "তুমি যে বলো মহাপ্রভু নেই, সব মিথ্যে। আমি আজ নিজে চোখে তাঁকে দেখেছি। শুধু দেখেছি নয়, তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছি।"

"তাই নাকি!"

"সত্যি বলছি।"

হেমন্ত বিদ্রূপ করে বলল, "ওইসব আবোল-তাবোল বকলে দেব একদিন গাছটা কেটে। যত্তসব—।"

বড় বউমা সভয়ে বলল, "না না। ও কাজ কোরো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

সেইদিন থেকে বড় বউমা মনে মনে মহাপ্রভুকে দারুণ ভক্তি করতে লাগল। সবসময় চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখত সে। মাঝে মাঝে মহাপ্রভুর দেখাও পেত। কখনও দেখত মহাপ্রভু বেলগাছে মিলিয়ে যাচ্ছেন। কখনও বা খড়ম পায়ে ঘাটে নামছেন। রাত্রিবেলা ছাদের ওপর গড়গড় করে মহাপ্রভুর ভাঁটা খেলার শব্দও শোনা যেত। মনে হত কে যেন ছাদের ওপর একটা লোহার বলকে বারবার গড়িয়ে দিচ্ছে।

আর একদিনের কথা। বৈকুণ্ঠবাবু সন্ধের সময় আফিংয়ের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন, এমন সময় মহাপ্রভু এলেন, "বৈকুণ্ঠ!"

"বলুন প্রভু।"

"তোদের মেজ বউমাটার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই? দেখ দেখি ঘাটটাকে কেমন নোংরা করে এল। জানে তো এ সময় আমি ঘাটে বসে আহ্নিক করি। যা। কাউকে বল একটু পরিষ্কার করে দিতে। আর কাজের মেয়েটাকেও বলে দিবি এঁটো বাসনগুলো যেন ও ঘাটে না মাজে।"

মহাপ্রভু চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল মেজ বউমার। মেজ বউমা অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাবুর মেজ ছেলে জয়ন্তর বউ। ডাকামাত্রই মেজ বউমা এল। এসে শ্বশুরকে প্রণাম করে বলল, "আমাকে ডেকেছেন বাবা?"

"হ্যাঁ মা। তোমার কি এ-বাড়িতে থাকতে খুব অসুবিধে হচ্ছে?"

মেজ বউমা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝতে পারল নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ হয়েছে তার। শ্বশুরমশাই রেগেছেন। না হলে এ-কথা তিনি বলতেন না।

বৈকুণ্ঠবাবু আবার বললেন, "কী হল, উত্তর দিলে না যে?"

উত্তর দেবে কি, মেজ বউমার তখন গলা শুকিয়ে উঠেছে। বৈকুণ্ঠবাবু এমনিতে ভাল মানুষ হলেও রাগলে তিনি কারও নন। মেজ বউমা বলল, "আমি কি কোনও অন্যায় করেছি বাবা?"

বৈকুণ্ঠবাবু কঠিন গলায় বললেন, "তুমি ঘাটে গিয়েছিলে?"

মেজ বউমা চমকে উঠে জিভ কেটে বলল, "হ্যাঁ বাবা।"

"আমি বারবার বলেছি ঘাট সবসময় পরিষ্কার রাখবে। বড় বউমাকে দেখেও কি শিখতে পারো না। যাও এখুনি গিয়ে ঘাট পরিষ্কার করে দিয়ে এসো।"

মেজ বউমা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "আমার ভয় করছে বাবা। আপনি একটু ফাগুকে বলুন।"

"ভয় কী? যাও। কিচ্ছু বলবেন না উনি।"

ততক্ষণে বড় বউমাই চলে গেছে। গিয়ে নিজে হাতে ঘাট পরিষ্কার করে দিতেই খড়ম খটখটিয়ে নেমে এলেন মহাপ্রভু।

কথাটা উঠল হেমন্তর কানে। বদমেজাজি হেমন্ত রেগে বলল, "তোমরা কী ভেবেছ বলো তো? যত্তসব আজগুবি ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করছ বাড়িসুদ্ধু লোক! আসলে বাবা নোংরা একদম দেখতে পারেন না। তাই নিজের আদেশটা মহাপ্রভুর নাম দিয়ে ওইভাবে চালান আর তোমরাও তাই বিশ্বাস করছ?"

বড় বউমা বলল, "না, আমরা বাড়িসুদ্ধু লোক মোটেই আজগুবি ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করছি না। তুমি বিশ্বাস না করো নাই করলে। আমরা করি। আমি নিজের চোখে তাঁকে দেখেছি। একবার নয়, একাধিকবার দেখেছি। তিনি কথাও বলেছেন আমার সঙ্গে। অতএব তুমি চুপ করে থাকো।"

হেমন্ত হেসে বলল, "তিনি যদি আছেনই, তবে আমি যে এত অবিশ্বাস করি তা আমাকে একবার দেখা দিচ্ছেন না কেন? আমাকে দেখা দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। কাজেই আমি যতদিন না দেখতে পাব ততদিন বিশ্বাস করব না।"

বড় বউমা আর কী করে! বাধ্য হয়েই নীরব হয়ে গেল।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে হেমন্ত ঠিক করল, কাউকে কিছু না জানিয়ে বাগানে গিয়ে চুপিচুপি বেলগাছটাকে কেটে ফেলবে। তা হলেই অবসান হবে সমস্ত বুজরুকির। আপদের শান্তি হবে। এই ভেবে একটা কুড়ুল নিয়ে সবার অলক্ষ্যে বাগানে গেল সে। আবছা আলো-আঁধারে বেলতলায় হাজিরও হল। তারপর যেই না দু-চার কোপ দেওয়া, অমনই দেখতে পেল বেলগাছের ভেতর থেকে এক বীভৎস চেহারার উৎকট মূর্তি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হল। সেই অতি ভয়ঙ্করের কোনও তুলনাই হয় না। মূর্তিটা কখনও বড় হচ্ছে, কখনও ছোট হচ্ছে, কখনও আগুনে পোড়া ঝলসানো রূপ নিচ্ছে, কখনও গলিত শবের মতো হচ্ছে, কখনও বড় বড় দাঁত বার করে কামড়াতে আসছে। কখনও বা আগুনের গোলার মতো চোখ বার করছে, চোখ দুটো বলের মতো বড় হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন! হেমন্তর রক্তের ভেতর দিয়ে একটা হিম স্রোত বয়ে গেল। হাতের কুড়ুল খসে পড়ল হাত থেকে। ঘাড় গুঁজে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠতে লাগল।

মহাপ্রভু কিন্তু তার কোনও ক্ষতি করলেন না। বৈকুণ্ঠবাবুকে ঠিক সময়ে দেখা দিয়ে বললেন, "আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি বৈকুণ্ঠ। তোর বড় ছেলে বেলতলায় শুয়ে আছে। ওকে তুলে নিয়ে আয়। আমি ওকে ভয় দেখিয়েছি। যা, শিগগির যা।"

বৈকুণ্ঠ বাঁড়ুজ্যে ডুকরে কেঁদে বললেন, "ওর অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন প্রভু। কেন আপনি চলে যাবেন? আমি তো আপনার কোনও অমর্যাদা করিনি।"

"তা করিসনি। তবে তোর ছেলে গাছটাকে এমনভাবে কুপিয়েছে যে, গাছটা হেলে পড়েছে একেবারে। একটু জোরে হাওয়া দিলেই পড়ে যাবে। ও গাছে কী করে থাকব বল? তা ছাড়া তোরও দিন শেষ হয়ে এসেছে। সামনের মহাষ্টমীর দিন যেতে হবে তোকে।" এই বলে মহাপ্রভু চলে গেলেন!

খবর পেয়ে সংজ্ঞাহীন হেমন্তকে সকলে মিলে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে এল। এর পব থেকে কীরকম যেন হয়ে গেল হেমন্ত। সামান্য একটু মাথার গোলমালও দেখা দিল। বৈকুণ্ঠ বাঁড়ুজ্যেও সে বছর মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজা অন্তে দেহরক্ষা করলেন। মহাপ্রভুর কৃপালাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই হোক বা যে কোনও কারণেই হোক, শিবানীপুরের সেই সম্পত্তি হেমন্তরা রাখতে পারল না। ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা-মোকদ্দমা করে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। সর্বস্বান্ত হওয়ার পর হেমন্ত সপরিবারে কাশী চলে গেল। জয়ন্তও চলে গেল শিয়াখালার কাছে কোনও এক গ্রামে। পড়ে রইল পিতৃপুরুষের ভিটে। সেখানে ধুনো গঙ্গাজল দেওয়ারও আর কেউ রইল না।

শিবানীপুরে বাঁড়ুজ্যেদের ভিটেতে এখন ঘুঘু চরে। বৈকুণ্ঠ বাঁড়ুজ্যের পুরনো বাড়ির ধ্বংসস্তূপে এখন আর কোনও মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছে কিনা তা অবশ্য জানা নেই।